

দি আদার আর্ড অফ মী

সিডনি অলডন



সূচিপত্র

জীবনের পড়ন্ত বেলায়.....	2
গ্রেহাউন্ড বাস স্টেশন.....	55
অসাধারণ একটি উড়ান.....	134
হলিউডে ধর্মঘট.....	204
রবার্ট স্মিথ নামে কেউ একজন.....	275

জীবনের পড়ন্ত বেলায়

০১.

জীবনের পড়ন্ত বেলায় দাঁড়িয়ে অনেক কিছু মনে পড়ে।

তখন আমি সতেরো বছরের কিশোর। চিকাগো শহরের এক ওষুধের দোকানে ডেলিভারি বয় হিসেবে কাজ করছি। এই কাজটা আমার খুবই ভালো লেগেছিল। কারণ আমি অনেকগুলো ঘুমের বড়ি সংগ্রহ করেছিলাম। আত্মহত্যা করব বলে। জানতাম না, কটা ট্যাবলেটের দরকার। হয়তো গোটা কুড়ি। হ্যাঁ, একটু একটু করে সংগ্রহ করছি, যাতে কারও নজরে না পড়ি।

আমি জানতাম, লুইস্কা এবং ঘুমের ট্যাবলেট হল মারাত্মক সংমিশ্রণ। হ্যাঁ, তাদের মেশাতে হবে। কারণ আমি মরতে চাই!

শনিবার, আমি অপেক্ষা করছিলাম। আমি জানি, সপ্তাহের শেষে মা-বাবা বাড়িতে থাকবে না। আমার ভাই রিচার্ড, এক বন্ধুর বাড়িতে রাত কাটাবে। আমাদের অ্যাপার্টমেন্টটা থাকবে একেবারে ফাঁকা।

সন্ধ্যা ছ টা, ফার্মাসিস্ট বললেন- এবার বন্ধ করতে হবে।

উনি জানতেন না, ওনার এই কথাটার মধ্যে একটা আলাদা অর্থ লুকিয়ে ছিল। হ্যাঁ, এবার সবকিছুই বন্ধ করতে হবে।

১৯৩৪- আমেরিকার ভাগ্যাকাশে দেখা দিয়েছে কালো মেঘ। স্টক মার্কেট, একটার পর একটা ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ করছে। ব্যবসায়ে দেখা দিয়েছে মন্দা। এক কোটি তিরিশ লক্ষ মানুষ চাকরি হারিয়েছে। তখন তারা বেপরোয়া। দশ লক্ষ ভবঘুরে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। দু-লক্ষ শিশুর মুখে অন্ন নেই। হ্যাঁ, আমরা সাংঘাতিক অর্থনৈতিক অবনতির মোকাবিলা করছি। আগে যাঁরা ছিলেন কোটিপতি তাঁদের অনেকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন, বিখ্যাত আধিকারিকরা পথেঘাটে আপেল বিক্রি করছেন।

তখনকার সবথেকে জনপ্রিয় গান ছিল বিষণ্ণ রবিবার !

হ্যাঁ, এই জগতটা একেবারে অন্ধকার। আমি হতাশার প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছি। জীবনের কোনো ছন্দ খুঁজে পাচ্ছি না।

আমরা লেক মিশিগানে থাকতাম, সমুদ্র থেকে কয়েক কদম দূরে। একরাতে আমি সেখানে চলে গিয়েছিলাম। সে এক পাগল হাওয়ার ডাক, আকাশে মেঘের ওড়াওড়ি। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম- যদি ঈশ্বর বলে কিছু থেকে থাকে, তাহলে আমাকে আলো দেখাও।

হঠাৎ আমি দেখলাম, মেঘেরা একটা সুন্দর মুখচ্ছবি তৈরি করেছে। বিদ্যুৎ রেখা। আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ভয়ে আমি বাড়িতে পালিয়ে এলাম।

রজারস পার্কের তিনতলার ছোট অ্যাপার্টমেন্টে পরিবারের সঙ্গে বাস করতাম। সেখানে দিনগুলো কোনোরকমে কেটে যেত।

শেষ অব্দি আমি আমার ওই ভয়ংকর অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলাম। একেবারে ফাঁকা। মা-বাবা বেরিয়ে গেছে। ভাইও নেই। আমার পরিকল্পনার অন্তরায় বলতে কেউ নেই।

আমি ছোট বেডরুমে গেলাম। রিচার্ড আর আমি সেখানে থাকি। ড্রয়ারের ভেতর ঘুমের ট্যাবলেট লুকোনো ছিল। আমি কিচেনে গেলাম। সেলফ থেকে জলের বোতল বের করলাম। আবার তাকালাম ট্যাবলেটগুলোর দিকে। হ্যাঁ, এবার কাজটা শুরু করতে হবে। ভুইস্কি খেয়ে ফেললাম, গলা বুজে এল। তারপর? কয়েকটা ঘুমের ট্যাবলেট। কে যেন বলল, তুমি কী করছ?

আমি চারদিকে তাকালাম- হ্যাঁ, বাবা দাঁড়িয়ে আছে। বেশ, তুমি মদ খাচ্ছে?

আমি অবাক- আমি ভেবেছি তুমি চলে গেছে।

-একটা জিনিস ভুলে গিয়েছিলাম। বাবা ছুটে এল। আমার হাত থেকে ভুইস্কির বোতলটা নিয়ে নিল।

আমার মন বলার চেষ্টা করছে, কিছুই না।

বাবা রেগে গেছে- সিডনি, কী হয়েছে?

বাবা ঘুমের ট্যাবলেটগুলো দেখল, কী হচ্ছে? এগুলো কেন?

আমি শান্তভাবে বলেছিলাম আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না।

কিছুক্ষণের নীরবতা।

বাবা বলল- তুমি এত বিষঃ কেন?

তুমি আমাকে বাধা দিতে পারবে না। আজ অথবা কাল আমি আত্মহত্যা করবই।

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বলল- এটা তোমার জীবন, যা খুশি করতে পারো। চল, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।

আমি জানি না, বাবা কী ভাবছে। আমার বাবা একজন সেলসম্যান। সে হয়তো আমার মন পাল্টাবার চেষ্টা করছে।

আমি বললাম ঠিক আছে, চলো।

-কোটটা পরে নাও, ঠান্ডা লাগিয়ে কী লাভ?

পাঁচ মিনিট বাদে বাবা আর আমি রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছি। রাস্তাঘাটে কেউ নেই, তাপমাত্রা শূন্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

অনেকক্ষণের নীরবতা ভেঙে বাবা বলল- তুমি কেন আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলে?

এ প্রশ্নের জবাব কী দেব? আমি কী জানি? আমার সামনে কোনো ভবিষ্যৎ নেই। আমার অতীত গ্লানিময়।

কলেজ যেতে চেয়েছিলাম, পকেটে পয়সা নেই। ভেবেছিলাম, লেখক হব, বারোটা ছোটো গল্প লিখেছিলাম। বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠিয়েছি। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ফেরত চলে এসেছে। শেষ পর্যন্ত আমি ঠিক করেছি, জীবনের বাকি দিনগুলো এই দরিদ্রতার মধ্যে কাটাতে পারব না।

বাবা গল্প করছিল- হ্যাঁ, সিডনি, তুমি পৃথিবীর অনেক জায়গাতে যাওনি।

আমি বাবার দিকে তাকালাম, বাবা কি আজ যাবে না? তা হলে আমার পরিকল্পনাটা সফল হবে না!

-তুমি কী রং ভালোবাসো?

বাবা কি এভাবে আমাকে বদলাতে পারবে?

সিডনি, তুমি একজন লেখক হতে চাইছ, তাই তো?

-এটা গতকালের ঘটনা, আমি বললাম।

-তাহলে আগামীকাল কী বলবে?

আমি বাবার দিকে তাকিয়ে বললাম জানি না।

সিডনি, জীবন এক উপন্যাসের মতো। এখানে উত্তেজনা আছে। তুমি জানো না, শেষ পাতায় কী রহস্য অপেক্ষা করছে তোমার জন্য।

আমি জানি, সেখানে আছে কেবল শূন্যতা।

-না, প্রত্যেকটি পাতা আলাদা গল্প বলে, সিডনি। তুমি পাতাগুলো উল্টে যাও।

আমি বাবার দিকে তাকালাম- প্রত্যেকটা আগামীকাল কি নতুন সফলতা নিয়ে আসে?

আমরা ফাঁকা রাস্তা দিয়ে হাঁটছি।

বাবা বলল- সিডনি, সত্যি তুমি যদি জীবনের শেষ পর্বে পৌঁছোতে চাও, তাহলে তা করতে পারো। কিন্তু আমি বলব, এখনও সময় হয়নি, তোমাকে অনেক কিছু লিখতে হবে, নিজের হাতে। তা না হলে জীবনটা পরিপূর্ণ হবে না। বইটা এখন বন্ধ করো না, কাল কোনো একটা অভাবিত ঘটনা ঘটতে পারে।

জানি না, বাবার কথার মধ্যে কী জাদু ছিল, কয়েক পা হেঁটে আমি ঠিক করলাম, এখনই এই পরিকল্পনাটা মূলতুবি রাখতে হবে।

সম্ভাবনার দুয়ার তো উন্মুক্ত রইলই।

০২.

চিকাগোয় জন্মেছিলাম, একটা কিচেন টেবিলে, যেটা নিজের হাতে তৈরি করেছিলাম। আমার মা নাতালিয়া, তেমন কথাই বলে থাকে। আমার মা আমার জীবনের ধ্রুবতারা। আমার সর্বক্ষণের সঙ্গিনী। আমি ছিলাম মায়ের সবথেকে বড় ডা সন্তান। মা আমার সাথে সর্বক্ষণ কথা বলত। আমি নাকি ছোটবেলায় ছিলাম বুদ্ধিদীপ্ত। দেখতে সুন্দর, বাকবাক্যে ব্যক্তিত্বের অধিকারী তখন আমার ছ-মাস বয়স।

মা-বাবাকে কখনও মা-বাবা বলে ডাকিনি। ডাকতাম নাতালিয়া-অটো বলে। কারণ বয়সে তারা ছিল খুবই ছোটো।

মা জন্মেছিল রাশিয়াতে। ওডেসা শহরের কাছে। জারের শাসনের সময়। দশ বছর বয়সে মা আমেরিকাতে চলে আসে দিদিমা আনার সাথে। মা সত্যি এক চিরবিস্ময়কর সুন্দরী। পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। মসৃণ বাদামি চুল। ধূসর দুটি চোখের তারায় বুদ্ধির বিকাশ। অসাধারণ তনুবাহার। আত্মার ভেতর রোমান্টিক উদ্ভাবনা। অন্তর্মুখী সম্ভাবনা। মায়ের কোনো ব্যবহারিক শিক্ষা ছিল না। কিন্তু নিজে নিজে পড়তে শিখেছিল। শাস্ত্রীয় সংগীত শুনতে ভালোবাসত। বই পড়ত পাগলের মতো। ভেবেছিল, রাজকুমারকে বিয়ে করবে। সারা পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াবে।

শেষ অর্দি ওই রাজকুমার হল অটো। চিকাগো শহরের এক সংগ্রামী। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার পর স্কুল ছেড়ে চলে এসেছে। দেখতে ভারী সুন্দর। তাই নাতালিয়া তাকে ভালোবেসে ফেলল। শেষ অর্দি ভালোবাসাটা বিয়েতে পর্যবসিত হল।

আমার বাবা, স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসত। বেশির ভাগ স্বপ্নই সফল হত না। তাতে কী আসে যায়!

দুভাই- স্যান এবং অ্যাল, তিন বোন- পাউলিন, নাতালি এবং ফ্যান। এই হল আমার মামার বাড়ির বংশ পরিচয়।

এবার বাবাদের কথা বলি। দুভাই হ্যারি এবং অটো, পাঁচ বোন- রোজ, বেথ, এমা, মিলগ্রেড এবং টিলি।

বাবারা ছিল বহির্মুখী। মায়ের বাড়ির সকলে অন্তর্মুখী। সুসংহত ব্যক্তিত্বের অধিকারী। দুটি পরিবারের মধ্যে অনেক তফাৎ। কিন্তু ভাগ্য তাদের এক জায়গায় নিয়ে এল।

আমার জ্যাঠামশাই, হ্যারি, এই পরিবারের এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। পাঁচ ফুট দশ। পৌরুষ ঝরে পড়ছে চেহারাতে। ব্যক্তিত্বের চমক। বিয়ে হয়েছিল পাউলিনের সাথে, অর্থাৎ আমার মাসি। চারটি সন্তানের জন্ম হয়- সিমুর, এডি, হাওয়ার্ড, এবং স্টিভ। সিমুর আমার থেকে বছর ছয়েকের বড়ো। কিন্তু মনে হত সে যেন আরও বেশি ভারিঙ্কি।

মামার বাড়ির সকলের মধ্যে একটা আলাদা আকর্ষণ ছিল। বিশেষ করে অ্যালের কথা বলতে খুবই ইচ্ছে করছে। সে কথা বলে সবাইকে জয় করত। হ্যাঁ, এক অসাধারণ চরিত্র।

কাকারা এক জায়গায় জমা হলে হৈ হৈ বেধে যেত। মাঝে মধ্যে তারা একটা রহস্যজনক বিষয় নিয়ে আলোচনা করত। যাকে আমরা যৌনতা বলতে পারি। আমি তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে ওঠার জন্য প্রার্থনা করতাম।

বাবা দুহাতে খরচ করত, ভবিষ্যতের জন্য ভাবত না। দামী রেস্টুরেন্টে বসে বন্ধুদের খাওয়াত। বিল এলে কারও কাছ থেকে টাকা ধার করত।

নাতালি এই ব্যাপারটা সহ্য করতে পারত না। ভীষণ দায়িত্ব জ্ঞান ছিল তার। আমি বড়ো হলাম। বুঝতে পারলাম, ওরা একে অন্যের পরিপন্থী। আমার মা এমন এক জনকে বিয়ে করেছে যাকে শ্রদ্ধা করতে পারে না। এমন একটা জীবন কাটাচ্ছে, যা ওই পুরুষ কোনোদিন বুঝতে পারবে না।

তারা সবসময় ঝগড়া করত। মাঝে মধ্যে ঝগড়ার মধ্যে তিক্ততা ঝরে পড়ত। আমি ঝগড়া থামাবার আশ্রয় চেষ্টা করতাম। কিন্তু পারতাম না। তখন আমি পালিয়ে যেতাম হার্ডি বয়েজের রহস্যজগতে, সেখানে প্রাণের শান্তি মিলত।

একদিন স্কুল থেকে বাড়ি এলাম। বাবা মা চিৎকার করছে, অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করছে। আমি ঠিক করলাম, এখানে আর থাকব না। কিন্তু যাব কোথায়? মাসি পাউলিনের কাছে গেলাম। মাসি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী।

পাউলিন আমাকে বলল কী হয়েছে?

আমার চোখে জল- মা বাবার ঝগড়া। আমি কী করব?

-তোর সামনে?

আমি ঘাড় নাড়লাম।

-ঠিক আছে, সিডনি, ওরা দুজনেই তোকে ভালোবাসে, ভবিষ্যতে ওরা যখন ঝগড়া করবে, তুই থামবার চেষ্টা করবি, কেমন?

মাসির উপদেশ ফলে গেল। আমি ঝগড়া হলেই সামনে যেতাম। বলতাম, না, আমার সামনে ঝগড়া করতে লজ্জা করছে না।

ওরা দুজনেই দুঃখ পেত। সন্ধি করত, আবার ঝগড়া এবং আবার সন্ধি।

এক শহর থেকে অন্য শহরে আমার বাবা তখন চাকরির সন্ধানে মগ্ন। কিন্তু এভাবে কি দিন কাটে? টেকসাসে সে একটা জুয়েলারি দোকানে কাজ করল। চিকাগোতে একটা কাপড়ের দোকানে। আরিজোনাতে একটা রূপোর খনিতে। লস এঞ্জেলসে হল সেলসম্যান।

বছরে দুবার অটো আমাকে নিয়ে যেত দোকানে। দামী জামাকাপড় কিনে দিত। আহা, আমার মন আনন্দে ভরে উঠত।

১৯২৫- রিচার্ডআমার ভাইয়ের জন্ম হল। তখন আমার বয়স আট বছর। আমরা তখন ইন্ডিয়ানা প্রদেশের গ্যারিতে বাস করছি। ভাইকে পেয়ে আমার মন আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিলাম, ভাইকে নিয়েই আমার দিনগুলো আনন্দে কেটে যাবে।

এল অর্থনৈতিক মন্দা। অ্যালিসের মতো আমি এক অদ্ভুত জগতের বাসিন্দা হয়ে গেলাম। অটো তখন বেশির ভাগ সময় বাইরে কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। নাতালিয়া, রিচার্ড আর আমি একটা সঁতসেঁতে অ্যাপার্টমেন্টে থাকতে বাধ্য হচ্ছি।

হঠাৎ একদিন বাবা এসে বলল সে নাকি প্রতি সপ্তাহে হাজার ডলার করে পাবে। আমরা অন্য একটা শহরে সুন্দর পেন্ট হাউসে থাকব। এবার বোধহয় স্বপ্নটা সত্যি হতে চলেছে।

কিন্তু স্বপ্নটা স্বপ্নই থেকে গেল। কয়েক মাস বাদে বাবার এই পরিকল্পনাটা ভেঙে গেল। আবার আমাদের ছোট অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে আসতে হল। অন্য একটা শহরে।

নিজেকে যাযাবর বলে মনে হত। সব সময় বোধহয় একটা সুস্থিতির সন্ধানে চলেছি। স্কুলে যেতে ভালো লাগত না, যে কোনো স্কুলে আমি তখন অচেনা আগন্তুক।

বাবা এক বিখ্যাত সেলসম্যান। আমি যখন স্কুলে যেতাম, সে সব সময় প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করত। আমাকে এক গ্রেড উচুতে ভর্তি করার জন্য আবেদন করত। তার ফলে কী হত? ক্লাসে আমি সবার ছোটো। কারও সাথে বন্ধুত্ব হত না। লজ্জা এসে আমাকে গ্রাস করত। একাকীত্বের যন্ত্রণায় দগ্ধ হতাম। সেটা হল ছন্নছাড়া জীবন।

কোথা থেকে টাকা আসছে আমি জানি না। মা একটা পুরোনো পিয়ানো কিনল। আমাকে শেখাতে শুরু করল। মা বলেছিল, পিয়ানো বাজালে মনটা শান্ত থাকবে।

বাবা কখনও জীবনে কোনো বই পড়েনি। মা কিন্তু বই পড়ত, মায়ের কাছ থেকেই বই পড়ার নেশাটা আমাকে পেয়ে বসল। আমি পাবলিক লাইব্রেরিতে ভর্তি হলাম। বইয়ের জগতে ঢুকে গেলাম।

বাবা বলত— বই পড়ে পড়ে চোখের বারোটা বাজিও না। তুমি কেন তোমার ভাই সিমুরের মতো হও না, ও তো ফুটবল খেলে।

আমার জ্যাঠা আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বলেছিল— সিডনি, এত পড়ো না। জীবনটা উচ্ছন্ন যাবে।

তখন আমার বয়স দশ বছর। লিখতে শুরু করলাম। একটা ছোটোদের পত্রিকাতে কবিতার প্রতিযোগিতা হয়েছিল। আমি একটা কবিতা লিখলাম। বাবাকে বললাম, সেটা ওখানে পাঠিয়ে দিতে।

আমি লিখছি, এ খবরটা বাবাকে শিহরিত করে তোলে। হ্যাঁ, আমি কেন কবি হব? আমি জেনেছিলাম, পাছে কবিতাটা অমনোনীত হলে বাবার খারাপ লাগে, তাই জন্যে সে আমার নামটা কেটে কাকা অ্যালের নামটা বসিয়ে দিয়েছিল।

দু-সপ্তাহ কেটে গেছে। অ্যালের সাথে বাবা লাঞ্ছ খাচ্ছে।

কাকা বলল- অটো, একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। উইসডম কাগজ আমাকে পাঁচ ডলার চেক পাঠিয়েছে।

এটাই হল আমার লেখা প্রথম কবিতা, অ্যাল মার্কাসের নামে ছাপা হয়েছিল।

একদিন আমার মা অ্যাপার্টমেন্টে ছুটে এল। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। সে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল- সিডনি, আমি এই মাত্র বিফ ফ্যাকটরের কাছ থেকে আসছি। সে আমাকে যা বলেছে, তা শুনে আমি অবাক হয়ে গেছি।

বিফ ফ্যাকটর মার একজন বন্ধু। সে কী বলেছে?

গত শতাব্দীর বিশের দশকে চিকাগো ছিল একটা মস্ত বড়ো শহর। তবে সেখানে শুধু মানুষের কোলাহল ছিল না, তারই পাশাপাশি আরও অনেক শব্দ শোনা যেত। মানুষজন আনন্দে উল্লাস ধ্বনি করত।

এই শহরের ছিল অনেক আকর্ষণ, একদিন সকালে আমি স্কুলে গেছি, তখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। কোনো এক ছাত্রের কথায় শিক্ষয়িত্রী খুবই চটে গিয়েছিলেন। তিনি কলমদানিটা নিয়ে ছুঁড়ে মারেন। একটু হলে সেটা আমাকে আঘাত করত। আমি স্কুল থেকে ভয়ে পালিয়ে এলাম।

স্কুলে ইংরেজি পড়তে ভালো লাগত। তখন থেকেই ছোটো গল্পের পোকা হয়ে উঠেছি। ভাবছি, কবে এরকম লিখতে পারব।

রিচার্ড তখন বছর পাঁচকের। তাকে নিয়ে আমি একটা সুইমিং পুলে চলে যেতাম, দুজনে মনের সুখে সাঁতার কাটতাম। একবার রিচার্ড ডুবতে বসেছিল, আমি তাকে টেনে তুলে বাঁচিয়ে ছিলাম।

তখন থেকে আরও সাবধানী হয়ে উঠি।

তখন আমার বয়স বারো বছর। মার্শাল ফিল্ড গ্রামার স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। চিকাগো শহরে ইংরেজি ক্লাসে আমাকে একটা প্রোজেক্ট জমা দিতে বলা হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম, নাটক অভিনয় করলে কেমন হয়?

হঠাৎ নাতালির কথা মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ, বিফ ফ্যাকটরের অনুমান বোধহয় ঠিক হতে চলেছে, দেখিস, তোর ছেলে একদিন জগদ্বিখ্যাত হবে।

এভাবেই শুরু হল, ক্লাসের সর্বত্র সংবাদটা ছড়িয়ে পড়ল। কে কোন ভূমিকাতে অভিনয় করবে তা জানতে চাইছে। এই নাটকটা আমি পরিচালনা করব। এতে অভিনয় করব।

এর আগে কখনও পরিচালনা করিনি, তাই কিছুই জানতাম না।

আমি ভূমিকা বন্টন করতে শুরু করলাম। রিহাসাল শুরু হল, সবকিছু আমাকে দেখতে হল।

এটা আমার জীবনে সব থেকে সুখের সময়। এভাবেই হয়তো একটা সুন্দর পেশার জন্ম হয়েছিল। ওই বয়সে আমি চিত্রনাট্য লিখেছি, কতটা পেরেছি, তা জানি না। কিন্তু ভয়টা ভেঙে গেছে।

ফাইনাল ড্রেস রিহাসাল, ভারী সুন্দরভাবে শেষ হল।

আমি আমার টিচারের কাছে গিয়ে বললাম আমি তৈরি, কখন নাটকটা হবে?

উনি বলেছিলেন- কালই হতে পারে।

সারারাত চোখের তারায় ঘুম আসেনি। আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ওই নাটকটার ওপর। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি একটার পর একটা সংলাপ বলেছিলাম। কোথায় কোন ভুলত্রুটি হচ্ছে, তা ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম। না, সংলাপ অসাধারণ হয়েছে। গল্পটা সুন্দরভাবে এগিয়ে চলেছে। শেষের দিকে একটা অনভিপ্রেত মোচড় আছে। সকলেই এটা ভালোবাসবে।

সকালবেলা স্কুলে গেলাম, শিক্ষয়িত্রী একটা খবর দিয়ে আমাকে অবাক করলেন সিডনি, তোমার জন্য সুখবর আছে। আমি সমস্ত ইংরেজি ক্লাস আজ বন্ধ রেখেছি। সব ছাত্রছাত্রীরা অডিটোরিয়ামে এসে তোমার নাটক দেখবে।

আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। এত বড়ো সফলতা এইটুকু বয়সে?

সকাল দশটা। অডিটোরিয়ামে তিল ধারণের জায়গা নেই। শুধু ইংরেজি ক্লাসের ছেলেরাই আসেনি, প্রিন্সিপাল নিজে এসেছেন। টিচাররা সকলে উপস্থিত হয়েছেন। তারা এক শিশুপ্রতিভার বিকাশ দেখতে চাইছেন।

উত্তেজনার মধ্যেও আমি শান্ত ছিলাম, ভীষণ শান্ত, একটা বিস্ফোরণ ঘটতে চলেছে। অথচ তার আগাম অনুমান নেই।

নাটকটা এবার শুরু হবে। কলকাকলি থেমে গেছে। নীরবতার আবরণে বন্দি অডিটোরিয়াম।

একটা ছোট লিভিংরুম। একটি ছেলে আর মেয়ে স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করছে। তাদের একজন বন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। তারা সোফাতে মুখোমুখি বসে আছে।

আমি এখানে এক গোয়েন্দার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলাম, আমি উইংসের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছি। এবার ঢুকতে যাব।

একটি ছেলে বলল- ইন্সপেক্টর এফ্ফুনি আসরে।

এই কথাটা বলতে গিয়ে সে বলেছিল, যে কোনো মুহূর্তে, হা, কথাটা গুলিয়ে গেল। সে নিজেকে ঠিক করার চেষ্টা করল। সকলে হৈ-হৈ করে উঠেছে। আমি হাসতে চেষ্টা করেছিলাম। তারপর? আমি হেসে উঠলাম। যারা স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকায় বসেছিল, তারা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি তখন হো-হহা করে হাসছি। অসহায় হয়ে গেছি।

দি আদার সাইড থু মাঁ । সিডনি সেনডন

শেষ অদি আমি ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলাম। আমার শিক্ষয়িত্রীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সিডনি, এখানে এসো।

আমি স্টেজে গিয়ে দাঁড়ালাম- কী আশ্চর্য, আমার শিক্ষয়িত্রী দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি অত্যন্ত রেগে গিয়ে বললেন- এখনই এসব তামাশা বন্ধ করো।

দর্শকেরা উঠে যাবার চেষ্টা করছে। আমি তাকিয়ে দেখলাম। হ্যাঁ, আমি কিছু একটা করার ভান করলাম। কেউ বুঝতে পারেনি। নাটকটা আবার শুরু হল।

.

০৩.

১৯৩০ সালে আমেরিকার অবস্থা হয় শোচনীয়। আমি মার্শাল ফিল্ড গ্রামার স্কুল থেকে। গ্র্যাজুয়েট হলাম। ওষুধের দোকানে চাকরি নিলাম। নাতালি তখন একটা দোকানে ক্যাশিয়ারের কাজ করছে। জীবনটা একটু একটু করে পাল্টাচ্ছে।

অটো সেলসম্যানের চাকরিতে উন্নতি করেছে। একদিন হৈ হৈ করে সে বলল এবার নতুন একটা কাজ করব আমরা।

আমরা ডালাসে চলে যাব। অথবা আরিজোনাতে। কিংবা অন্য কোথাও।

ভালো লাগছে না, এই ছন্নছাড়া জীবন।

অবশেষে আমরা ত্রিকল্যাণ্ডে এলাম। বাবা সেখানে একটা রুপোর খনি কিনেছে। ফোনেক্স থেকে ১০৪ মাইল দূরে। গ্যাস স্টেশন আছে। শহরটা মোটেই ভালো নয়। বাবা উন্নতি করার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই হল না।

জ্যাঠা হ্যারির ফোন এল কেমন চলছে তোমার রুপোর কারবার?

-মোটই ভালো না, বাবার কণ্ঠে হতাশা।

-ডেনভারে চলে এসো। এখানে একটা স্টক ডোভারেজ কোম্পানি খোলা হবে। তুমি এখানে যোগ দাও।

-হ্যাঁ, যাচ্ছি।

আমরা ডেনভারে যাব, বাবা আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল।

ডেনভার শহরটা সত্যি চমৎকার। জীবনের উন্মাদনা আছে। সেখানে গিয়ে যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছিলাম।

হ্যারি এবং পাউলিনের অবস্থা খুবই ভালো। তারা দোতলা বাড়িতে বসবাস করে। তাদের বাড়ির পেছন দিকে একটা মস্ত বড়ো পার্ক আছে। আমি আমার ভাই সিমুর, হাওয়ার্ড, এডি, সিড- সবাই মিলে হৈ-হুল্লোড় শুরু করলাম।

সিমুর ইতিমধ্যেই বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে। সে তার থেকে বড়ো মেয়েদের সাথে ঘোরা ঘুরি শুরু করে দিয়েছে। এডিকে একটা ছোট টাটুঘোড়া দিয়েছে। হাওয়ার্ড টেনিসের

নামকরা খেলোয়াড়। এখানকার পরিবেশটা একেবারে আলাদা। কোথায় চিকাগো, আর কোথায় এই ডেনভার। মনে হচ্ছে, স্বর্গ আর নরকের তফাৎ।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমরা কি হ্যারি আর পাউলিনের সঙ্গে থাকব?

তারা বলেছিল- না, আমরা এখানে একটা বাড়ি কিনব।

বাড়িটা দেখতে গেলাম, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। মস্ত বড়ড়া বাড়ি, ম্যারিয়ন স্ট্রিটের শান্ত শহরতলীতে। ঘরগুলো বড়ো সুন্দর ভাবে সাজানো। ভালো ভালো ফার্নিচার কেনা হয়েছে। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি।

আমার বাবা এই বাড়িটা কিনবে, আমার এখানে বিয়ে হবে। আমার ছেলেমেয়েরা বড়ো হবে।

এই প্রথম আমার মনে হল, টাকার কত দরকার। জ্যাঠামশাইয়ের ব্যবসাটা তাহলে ভালোই চলেছে।

১৯৩০ সালের বসন্ত। আমার বয়স তখন তেরো বছর। আমি ইস্ট হাইস্কুলে ভর্তি হলাম। অভিজ্ঞতাটা ভারী সুন্দর। ডেনভারের শিক্ষকরা বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করছেন, তাঁরা কখনও ছাত্রদের দিকে কাঁচের দোয়াত ছুঁড়ে মারেন না। সকলের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

পারিবারিক শান্তি ফিরে এল।

দুই আদার সাইড থুফ ম্যাঁ । সিডনি সিলভার

একদিন জিমনেসিয়াম ক্লাসে আমি পড়ে গিয়েছিলাম। শরীরে ব্যথা লেগেছিল। অসহ্য যন্ত্রণা, চলাচল করতে পারছি না।

ডাক্তার এসে আমাকে দেখলেন। জানতে চাইলাম স্যার, আমাকে কি সারা জীবন খুঁড়িয়ে হাঁটতে হবে?

না, তোমার পায়ের মাংসপেশিতে টান ধরেছে, স্পাইনাল কর্ডে আঘাত লেগেছে। তাই যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু এটা বেশি দিন থাকবে না। তোমাকে দু-দিন শুয়ে থাকতে হবে। তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে।

একটা অ্যাম্বুলেন্স আমাকে বাড়িতে নিয়ে গেল। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তিনদিন কাটিয়ে দিলাম।

আমি জানি না, এই ঘটনাটা ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রভাবিত করবে কিনা।

একদিন আমি ডেনভারে, একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম। এরোপ্লেন চালাতে হবে।

আমি অটোকে বলেছিলাম- আমি যাব।

বাবা বলল- ঠিক আছে।

প্লেনটা ভারি সুন্দর লিঙ্কন কমান্ডার। সেখানে গিয়ে আমার মন আনন্দে ভরপুর।

পাইলট জানতে চাইলেন প্রথমবার।

দি আদার সাইড অফ ম্যাঁ । সিডনি সিলভার

-হ্যাঁ, প্রথমবার।

প্লেনটা উড়ল। দূরে-আরও দূরে। ভালো লাগছে, সত্যি ওই দিনটা আমি মনে রেখেছি।

১৯৩৩- বসন্তের সকাল। বাবা আমার কাছে এল। বলল- সবকিছু গুছিয়ে নাও, আমাদের চলে যেতে হবে।

-কেন? আমার চোখে প্রশ্ন

-আমরা চিকাগোতে ফিরে যাব।

-সত্যি?

-হ্যাঁ।

বাবা চলে গেল। আমি মায়ের কাছে গিয়ে বললাম কী হয়েছে?

-তোর বাবা আর জ্যাঠার মধ্যে গোলযোগ দেখা দিয়েছে।

আমি চারদিকে তাকালাম, বললাম- এই বাড়িটা?

মায়ের কণ্ঠে বিষণ্ণতা। মা বলল- এটা আমরা কিনছি নারে!

চিকাগোয় ফিরে যাওয়া, ক্লাস্তিকর এক অভিযান। কী হয়েছে, মা-বাবা সে বিষয়ে একটা কথাও বলেনি। ডেনভারের তুলনায় চিকাগো নরকের অন্ধকার। আমরা একটা ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে থাকতে বাধ্য হলাম। চরম বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। বাবা আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। মা একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে সেলস ক্লার্ক হিসেবে কাজ করছে। কলেজ যাবার স্বপ্ন মরে গেল। টিউশন নেব, এমন অর্থ কোথায়? সব কিছু তখন ঘন অন্ধকারে মুখ ঢেকেছে।

আমি কখনওই এখানে থাকব না, আমি ভাবলাম! হ্যাঁ, আমাকে টাকা রোজগার করতেই হবে।

তখনই আমি ভেবেছিলাম, আত্মহত্যা করব। বাবার সাথে দেখা না হলে হয়তো সেদিনই মরে যেতাম।

সেপ্টেম্বর এল। আমি সিন হাইস্কুলে ভর্তি হলাম। বাবা তখনও রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বড়ো বড়ো ব্যবসার স্বপ্ন দেখছে। মাকে একটা ড্রেস শপে সারাদিন কাজ করতে হচ্ছে। বেশি টাকা হাতে আসছে না। আমি কীভাবে সাহায্য করব?

আমি আমার মামা স্যানের কথা ভাবলাম। লুপ শহরে কয়েকটা হোটেলে মামার ভালো যোগাযোগ ছিল। সেখানে মামা চেকরুমের দেখাশোনা করত। এই সব চেকরুমে সুন্দর

চেহারার মেয়েরা কাজ করত। খদ্দেরদের মন ভোলানোর চেষ্টা করত। খদ্দেররা দয়াপরবশ হয়ে তাদের হাতে খুচরো পয়সা তুলে দিত।

মামার সঙ্গে দেখা হল। মামা শেরম্যান হোটেলে বসেছিল।

সে আমাকে দেখে আনন্দে অধীর হয়ে বলল- সিডনি, তোর জন্য কী করব?

-আমার একটা চাকরি চাই।

কী কাজ করবি?

-আমি চেকরুমে কাজ করতে চাই। তোমার একটা হোটেলে। সাহায্যকারী হিসেবে।

মামা আমাদের অর্থনৈতিক দূরাবস্থার কথা জানত। সে বলল- ঠিক আছে, তোকে তো সতেরো বছরের থেকেও বেশি মনে হচ্ছে। তুই বিশমার্ক হোটেলে চলে যা।

পরের সপ্তাহ থেকে আমার কাজ শুরু হল। কাজটা খুবই সহজ। খদ্দেররা কোট আর হ্যাট তুলে দেয় সাহায্যকারিণীদের হাতে। তারা প্রত্যেকটার ওপর একটা নম্বর লিখে রাখে। তারপর সেগুলো আমার হাতে তুলে দেয়। আমি র্যাকে তুলে রাখি। যখন খদ্দের ফিরে আসে তখন আবার তার হাতে সবকিছু তুলে দিতে হয়।

দুপুর তিনটে পর্যন্ত স্কুলের পড়া। স্কুল থেকে ছুটি ট্রেন ধরতে। বিশমার্ক হোটেলে পৌঁছে যাই। পাঁচটা থেকে না বন্ধ হওয়া পর্যন্ত আমাকে হোটেলে থাকতে হয়। কখনও কখনও মাঝরাত পর্যন্ত কাজ করতে হয়। আমি প্রত্যেক রাতে তিন ডলার করে মাইনে পাই। মায়ের হাতে পুরো টাকাটা তুলে দিই।

শনি আর রোববার দম ফেলার সময় থাকে না। হোটেলে হোটেলে পার্টির আয়োজন। তখন ভীষণ কাজ করতে হয়। ছুটির দিনগুলো কোথা দিয়ে ফসকে যাচ্ছে। বিশেষ করে বড়োদিন আর নতুন বছরের সময়। হৈ হুল্লোরের সঙ্গে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মা বাবার সাথে আনন্দ করছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকি। নিজের কথা ভাবি। মা কাজে ব্যস্ত, বাবার কোনো পাত্তা নেই। রিচার্ড আর আমি একা। আমাদের উৎসব কবে শুরু হবে?

রাত আটটা, সকলেই ছুটির দিনে ডিনার খেতে ব্যস্ত। আমি তাড়াতাড়ি একটা কফি শপে ঢুকে পড়ি, কিংবা কোনো রেস্টুরেন্টে, যা তোক কিছু খেয়ে আবার কাজে ফিরে আসি।

মাসি ফ্রান্সেসকে আমার খুবই ভালো লাগে। আমার মায়ের সবথেকে ছোটো বোন। সে মাঝে মধ্যে বিশমার্ক হোটেলে কাজ করতে আসে। ছোটোখাটো চেহারা, মাথায় একরাশ বাদামী চুল। হৈ হুল্লোড় করতে ভালোবাসে। খদ্দেররা সকলেই তাকে আলাদা চোখে দেখে।

নতুন একটা মেয়ে এল, জুয়ান, আমার থেকে বছর খানেকের বড়ো। অসাধারণ রূপবতী। আমি তাকে দেখে আত্মহারা হয়ে গেলাম। কীভাবে কথা বলব ভেবে পাচ্ছি

না। হাতে কোনো পয়সা নেই, কিন্তু তাকে ভালোবাসতেই হবে। আমরা একে অন্যকে ভালোবাসব, বিয়ে করব। একগাদা ছেলেপুলে হবে এমন একটা কষ্টকল্পনা।

এক সন্ধ্যায় সে বলল আমার কাকা-কাকিমা রোববার লাঞ্চার ব্যবস্থা করছে। তুমি যাবে? স্বপ্নটা সত্যি হতে চলেছে।

এটা একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা, ইতালিয় পরিবার, অনেক মানুষের ভিড়। মস্ত বড়ো ডাইনিং রুম। কত কী খাবার থরে থরে সাজানো আছে!

জুয়ানের কাকা, মানুষটি বড়ো চমৎকার। তিনি ইউনিয়ানের প্রেসিডেন্ট, আমি চলে আসব, সকলকে ধন্যবাদ জানালাম। জুয়ানের কানে কানে শুনিয়ে দিলাম আমার সুখের কথা। হ্যাঁ, আমাদের সম্পর্ক তৈরি হল।

পরের দিন সকালবেলা, একটা অভাবিত ঘটনা ঘটে গেল। ভদ্রলোককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। বিপক্ষ রাজনৈতিক দল এটা করেছে। জুয়ান হারিয়ে গেল, আমার স্বপ্ন মরে গেল।

শনিবার ডাক স্টোরে আসি। একটুখানি সময় পাওয়া যায়। বাড়িতে টেনশন অনেকটা কমে গেছে, কিন্তু অন্য কিছু শোনা যাচ্ছে।

একদিন বাবা বলল- আমি ফার্মে যাচ্ছি, এখনই আমাকে যেতে হবে।

আমি অবাক, আমিও যাব বলে বায়না ধরলাম।

বাবা বলল না, তোমার যাওয়া যাবে না।

-কেন?

-অসুবিধা আছে।

কবে ফিরবে?

-তিন বছর।

তিন বছর, আমি বিশ্বাস করছি না।

নাতালি ভেতরে এল। বলল- সিডনি, একটা খারাপ খবর শুনতে হবে। তোমার বাবা কিছু খারাপ লোকের সঙ্গে মিশেছিল, তারা দোকানে ভেনডিং মেশিন বিক্রি করত। তোমার বাবা এই ব্যাপারটা জানত না। একটা লোক সব টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে। তারা ধরা পড়ে। তোমার বাবাকে দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাকে জেলখানায় যেতে হবে।

আমার দুচোখে জল- তাহলে এই হল ফার্ম? তিনবছর আমি চিৎকার করেছিলাম।

হ্যাঁ, আমাকে এখন চিন্তা করলে চলবে না।

বারো মাস কেটে গেছে, বাবার বোধহয় আসার সময় হল। বিজয়ীর বেশে।

০৪.

খবরের কাগজের পাতায় আমরা সেই খবর পড়েছিলাম। রেডিওতে বারবার ঘোষিত হচ্ছিল। বাবার মুখ থেকে সবকিছু শুনতে হবে। আমি জানি না, এখানে মানুষ কী করে। আমি ভেবেছিলাম, বাবা হয়তো আরও বিবর্ণ হয়ে গেছে। বোঝার চাপে অবনত।

বাবা সামনের দরজা দিয়ে এগিয়ে এল। আগের মতো উৎফুল্ল- আমি ফিরে এসেছি।

আমরা সকলে এগিয়ে এসে বললাম- কী হয়েছে বলে তো?

বাবার মুখে হাসি- হা, এই গল্পটা আমি বারবার বলব। কিচেন টেবিলে বসে বাবা শুরু করল।

আমি জেলখানায় কাজ করছিলাম, সাফাই করার কাজ। পঞ্চাশ ফুট দূরে একটা মস্ত বড়ো রিজার্ভার। ওখানে জল থাকে। চারপাশে দশ ফুট উঁচু পাঁচিল। আমি দেখলাম, একটা ছেলে বেরিয়ে এসেছে। তিন-চার-বছর হবে। আমি সেখানে একাই ছিলাম।

..ছেলেটা ওই রিজার্ভারের ওপর উঠে গেল। একেবারে ওপরে পৌঁছে গেছে। এক্ষুনি তলিয়ে যাবে। আমি দেখলাম কাছাকাছি কেউ নেই। আর এক মুহূর্তের প্রতীক্ষা। সে রিজার্ভারে পড়ে গেল। টাওয়ার থেকে একটা গার্ড সব দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু আমি জানি সে আসতে পারবে না।

...আমি ছুটেতে শুরু করলাম। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি। আমি ওপরে পৌঁছে গেলাম। দেখলাম সে তলিয়ে যাচ্ছে। আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম জলের মধ্যে, তাকে টেনে তুললাম। শেষ অব্দি মৃত্যুর উপত্যকা থেকে জীবনের উন্মাদনায়।

...আমি সকলকে ডাকলাম, আমাকে কয়েকদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। কারণ অনেকটা জল খেয়ে ফেলেছিলাম। হঠাৎ লাফিয়ে পড়ায় আঘাত লেগেছিল।

আমরা প্রত্যেকটা শব্দ গেলবার চেষ্টা করছি।

ছেলেটা ওয়ার্ডেনের ছেলে। ওয়ার্ডেন এবং তার স্ত্রী আমার সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করতে এলেন। তারপর? তারা যখন শুনলেন, আমি সাঁতার জানি না, তখন অবাক হয়ে গেলেন। আমি এক হিরো হয়ে গেলাম। খবরের কাগজে আমার নাম প্রকাশিত হল। একের পর এক ফোনের কল আসছে। চিঠির পাহাড় জমছে। টেলিগ্রাম- আমি তো ভাবতেই পারছি না, এমনটি ঘটতে পারে।

ওয়ার্ডেন এবং গভর্নর একটা সিদ্ধান্তে এলেন। তারা বললেন, যেহেতু আমার অপরাধ খুব একটা বেশি নয়, তাহলে আমাকে ক্ষমা করা যেতে পারে।

তাই আমি এখানে ফিরে এসেছি।

আবার আমরা এক হলাম।

আমি একটা স্কলারশিপের জন্য আবেদন করেছিলাম। সেটা পেয়ে গেলাম।

ব্যাপারটা অলৌকিক। আমি এবার কলেজে যাব। একটা পাতা সবেমাত্র ওলটানো শেষ হয়েছে। আমি ভাবলাম, একটা ভবিষ্যৎ হয়তো আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

কিন্তু? চেকরুমে আর কাজ করতে পারব কি? এলাম ইলিনয়িসে। নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভারসিটিতে। চিকাগো শহর থেকে বারো মাইল দূরে। ২৪০ একরের ওপর মস্ত বড়ো এক ইউনিভারসিটি, লেক মিশিগানের ধারে অবস্থিত।

সোমবার সকাল নটা, আমি রেজিস্টারের অফিসে পৌঁছে গেলাম।

আমার নাম বললাম, কী কোর্স আমি পড়ব জানতে চাওয়া হল।

আমি সব কিছু পড়তে চেয়েছিলাম। কিন্তু সাহিত্য আমার প্রথম প্রেম।

আমি তাকিয়ে দেখলাম, ভদ্রমহিলার দিকে। শেষ পর্যন্ত আমি অনেক কিছু শিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ল্যাটিন কোথায়? উনি আমার দিকে তাকালেন। বললেন- তুমি সবকিছু সামলাতে পারবে?

আমার মুখে বিশ্বজয়ী হাসি- হ্যাঁ, আমি পারব।

ল্যাটিন?

সেখান থেকে কাফেটেরিয়া কিচেন। এখানে একটা কাজ করতে হবে। যে কোনো কাজ। আমি হয়তো চেকরুমে আর যেতে পারব না।

তারপর? চলে গেলাম ডেইলি নর্থ ওয়েস্টার্ন নামে একটা পত্রিকার অফিসে। আমি সেখানে গিয়ে কাজ করব। সে কাজটাও আমি পেয়ে গেলাম। তখন ব্যস্ততার মধ্যে আমার সময় কেটে যাচ্ছে। আমি ভাবতে পারছি না, কীভাবে দিনগুলো পালে গেল।

চেকরুমে তখনও কাজ করছি। প্রতি শনিবার ডাক স্টোরে যাই। তারই পাশাপাশি অনেকগুলো বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করতে হচ্ছে। এত কাজ মাথার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাও এতটুকু ক্লান্তি লাগছে না।

একদিন সকালবেলা ফুটবল ফিল্ডে গেলাম। দলটা প্র্যাকটিস করছিল। একজন এগিয়ে এল আমার দিকে। বলল- তুমি কি খেলতে চাইছ?

-হ্যাঁ, ফুটবল আমি খেলব।

-তুমি কোথায় পড়ো?

-আমি ইউনিভারসিটিতে পড়ি। কিন্তু জীবনে কখনও ফুটবল খেলিনি।

ভদ্রলোক বললেন- তুমি এ ব্যাপারটা ভুলে যাও। চট করে কেউ ফুটবল খেলতে পারে না।

ওই স্বপ্নটা মরে গেল!

নর্থ ওয়েস্টার্নের অধ্যাপকেরা সাংঘাতিক ভালো। ক্লাসগুলো উত্তেজক। ডিবেটিং টিমে যোগ দিলাম। নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হল। আমার বক্তব্য পরিস্কারভাবে তুলে ধরলাম। হল ভর্তি সকলে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমার কথা শুনে সকলে হাততালির ঝড়, বইয়ে দিল।

আমার নাম ঘোষিত হল। হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম, গণতন্ত্র বনাম সাম্যবাদ বিষয়ে, আমি জানতাম না কী বলতে হবে। যা মনে এল, তাই বলেছিলাম। কী আশ্চর্য, সকালের বুলেটিনে দেখলাম, আমার নাম রয়েছে। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো অন্য কেউ। কিন্তু সত্যি? আমি জিতে গেছি।

আমার নামটা সর্বত্র প্রচারিত হল। আমাকে নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভারসিটির ডিবেটিং টিমে নিয়ে নেওয়া হল।

তার মানে, জীবন উপন্যাসের আর একটি পাতা উল্টাতে পারলাম।

আরও ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। কিন্তু কীসের যেন অভাব। একটা স্বপ্ন তখনও দেখা হয়নি। একটা অদ্ভুত অনুভূতি। কী একটা আকুতি। কবে সফল হবে?

কোনো কোনো দিন হতাশ হয়ে পড়তাম। মনে হত আকাশ ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন। শেষ
অন্দি আমি এক মনস্তত্ত্ববিদের শরণাপন্ন হলাম।

কী বলব বুঝতে পারলাম না। আমি তো সুখী মানুষ হতে পারি। কিন্তু হতে পারছি না
কেন?

টাকাপয়সা ক্রমশ কমে আসছে। বাবা চাকরি পাচ্ছে না। মা সপ্তাহে ছদিন হাড়ভাঙা
পরিশ্রম করছে। আমি মাঝরাত অন্দি কাজ করছি। শনিবারের সন্ধ্যোগুলোতেও কাজ
করতে হচ্ছে। তবু টাকা আসছে কই? ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারি, বাড়ি ভাড়া বাকি পড়ে
গেছে। একরাতে মা বাবার কথা শুনতে পেলাম। মা বলছিল- রাতে কাজ করতে পারলে
ভালো। হয়, না-হলে চলবে না বোধহয়।

না, মা সারাদিন কাজ করে, রাতে এসে আমাদের জন্য রাতের খাবার তৈরি করে।
অ্যাপার্টমেন্টটা পরিষ্কার রাখে। মাকে আমি আর কাজ করতে দেব না।

পরের দিন সকালবেলা আমি নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করলাম।

মাকে সব কথা বলেছিলাম, মা শিউরে উঠে বলেছিল- সিডনি, তুই একাজ করিস না।
মায়ের চোখে জল, আমি চালিয়ে নেবার চেষ্টা করছি।

আমি জানতাম, কোনো কিছুই চলবে না। আমি মায়ের দিকে তাকালাম। একটা চাকরি
পেতে হবে।

১৯৩৫- অর্থনৈতিক মন্দা আকাশ ছুঁয়েছে। কোনো কিছু পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

রেডিও স্টেশনে ইন্টারভিউ দিলাম। ম্যাডেল ব্রাদারস নামে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে গেলাম। সেখানে অনেক মানুষের ভিড়। জনাছয়েক সেলসম্যান চিৎকার করছে। কাস্টমারদের সেবা করছে। আমি এখানে কী কাজ করব, হা, কিছু একটা করতেই হবে।

একজন এগিয়ে এসে বলল তুমি কী চাইছ?

-আমি ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলব।

-আমি মিঃ ইয়ং, এখানকার ম্যানেজার।

-কোনো চাকরি আছে?

-তুমি কি মেয়েদের জুতো বিক্রি করতে পারবে?

-হ্যাঁ, পারব।

-এ ধরনের কাজ করেছ?

-হ্যাঁ, বানিয়ে বললাম। থম ম্যাকক্যান, ডেনভারে।

-অফিসে এসো।

তারপর আমার কাজ শুরু হল। এক নতুন অভিজ্ঞতা। মিথ্যের ওপর ভিত্তি করে মাল বেচতে হবে। একের পর এক খদ্দের আসছে। দাম বলতে হচ্ছে, পায়ে জুতো পরাতে হচ্ছে। এভাবেই আমার নতুন জীবন শুরু হল।

কিন্তু কিছুটা গোলমাল হয়ে গেছে। উল্টোপাল্টা সাইজ বলছি আমি। খদ্দেরটা রেগে কই। ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করল। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ। এভাবেই আমার ওই পেশাটা হারিয়ে গেল।

সেদিন বিকেলবেলা আমাকে অন্য একটা জায়গায় যেতে হল। নতুন জগতে!

.

০৫.

ম্যান্ডেল ব্রাদারসের অফিস, হারবার্ডশেরিতে, অসম্ভব পরিশ্রম। তার পাশাপাশি চেকরুমে কাজ করতে হচ্ছে। শনিবারের সন্ধ্যাবেলাতেও যাই। অটো একটা আংশিক সময়ের কাজ পেয়েছে বয়লার রুমে।

এবার নতুন কাজে যোগ দিয়েছে। মাঝরাতে অটো বাড়ি ফেরে। অভিজ্ঞতার কথা বলে। তাকে সাতদিনই কাজ করতে হয়। রোববার মাথা থেকে হারিয়ে গেছে।

আমি এক রোববার বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। যখন আমি গেলাম, অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। চারদিকে গরম হাওয়া, ভাবাই যাচ্ছে না। এখানে বাবা কী করে কাজ করে।

সত্যি, জীবন কত দুর্বিসহ।

ম্যান্ডেল ব্রাদারসের কাজটা ভালো লাগছে না। একটা চ্যালেঞ্জ দরকার, একটা উদ্ভাদনা। কিন্তু পাব কোথায়? এই দেশের সর্বত্র ম্যান্ডেল ব্রাদারসের দোকান আছে। অন্য কোথাও গেলে কেমন হয়?

একদিন আমার বস মিঃ ইয়ং এসে বললেন- তোমার জন্য একটা খারাপ খবর আছে।

আমার দুচোখে বিস্ময় কী?

-তোমার চাকরিটা আর থাকবে না।

-কেন আমি কিছু ভুল করেছি?

না, লোক কমাতে হবে। খরচ বেড়ে যাচ্ছে। তোমাকেই আমরা শেষবারের মতো চাকরি দিয়েছি। তাই তোমাকেই আগে যেতে হবে।

আমার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে। একটা চাকরি দরকার। কী করব? কোথায় যাব? কিছুই বুঝতে পারছি না।

ঋণের পাহাড় আকাশ ছুঁয়েছে। মুদির বিল বাকি আছে। বাড়িওয়ালা মাঝে মধ্যে চিৎকার করে। অন্যান্য জিনিস কিনতে পারছি না।

পথে পথে শুরু হল আমার পরিভ্রমণ।

আমার বাবার এক বন্ধু চার্লি ফাইন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। তিনি একটা মস্ত বড়ো ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির এগজিকিউটিভ। তাকেই শেষ পর্যন্ত ধরতে হল।

সেখানে পৌঁছে গেলাম। এই কোম্পানি অটোমোবাইল গিয়ার তৈরি করে। পাঁচতলা বাড়িতে ফ্যাক্টরিটা অবস্থিত। ডাইভারসি স্ট্রিট জুড়ে।

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন- মেশিনের বিষয়ে তোমার কোনো অভিজ্ঞতা আছে।

আমার অভিজ্ঞতা ছিল না, তিনি সবকিছু বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। সেখানে একটা নতুন জগত। কাজ শুরু হল।

এই কাজটা আমার খুব একটা ভালো লাগেনি। তবু কাজে মন দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিছু তো একটা করতেই হবে।

বাবা তখন এক ভ্রাম্যমান সেলসম্যান। মা সপ্তাহে ছদিন ড্রেস শপে কাজ করছে। রিচার্ড স্কুলে যাচ্ছে। ওখানকার স্যাঁতসেঁতে পরিবেশের মধ্যে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। কোনো ঘটনা নেই। সন্ধ্যোগুলো আরও সাংঘাতিক। আমি এল ডাউন টাউনে চলে আসি।

হোটেলে কাজ করি। ওভারকোট নিতে হয় এবং ফেরত দিতে হয়। জীবনটা এত কুৎসিত কেন? এই গোলকধাঁধা থেকে কবে বাইরে আসতে পারব?

এক রাতে চিকাগো ট্রিবিউনে একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল। পল অ্যাশ একটা অ্যামেচার কনটেস্টের ব্যবস্থা করছে। -শো বিজনেসে নাম করতে চান কি?

পল অ্যাশ হলেন জনপ্রিয় ব্যাডলিডার। চিকাগোর থিয়েটারে একাধিকবার অভিনয় করেছেন। এই বিজ্ঞাপনটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমি জানি না, অ্যামেচার কনটেস্ট বলতে কী বোঝায়?

শনিবার আমি ড্রাগস্টোরে গেলাম, তার আগে চিকাগো থিয়েটার আমার চোখ কেড়ে নিল। আমি পল অ্যাশের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম।

আমার নাম কী বলব? আমার টাইটেলটা বড়োই খটমটে, কী টাইটেল নেওয়া যায়? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বললাম, আমার নাম সিডনি সেলডন।

ভদ্রলোক লিখে নিলেন। বললেন, আগামী শনিবার এখানে এসো, সেলডন ছটার সময় তখন দেখা হবে।

আমি মা-বাবার কাছে খবরটা দিয়েছিলাম। রিচার্ডও খবর শুনে উত্তেজিত। আমি বললাম।

-আমি একটা অন্য নাম ব্যবহার করেছি। আজ থেকে আমি সিডনি সেলডন।

মা বাবা অবাক হয়ে বলল- কেন?

আসল কারণটা বললাম, সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারিনি। শেষ অব্দি একটা শুভ সূচনা হতে চলেছে। আমাকে এই কনটেস্টটা জিততেই হবে। যখন পল অ্যাশ আমাকে একটা সুযোগ দেবেন, ওনার দলের হয়ে আমি সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করব।

শনিবার, সন্ধ্যোটা এসে গেল। আমি চিকাগো থিয়েটারে গেলাম। একটা ছোট ব্রডকাস্ট রেডিও, আরও কয়েকজন প্রতিযোগী বসে আছে। একজন কমেডিয়ান, একজন গাইয়ে, এক জন মহিলা পিয়ানোবাদিকা, একজন অ্যাকরডিয়ান বাদক।

ডিরেক্টর বললেন- সেলডন।

আমার মনে রোমাঞ্চ। এই প্রথম কেউ আমার নতুন নাম ধরে ডাকছে।

-যখন আমি ইঙ্গিত করব, তুমি মাইক্রোফোনের দিকে এগিয়ে যাবে। তোমার সবকিছু দেখাতে শুরু করবে। তুমি বলবে, শুভ সন্ধ্যা, ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের সকলকে পল অ্যাশ অ্যামেচার কনটেস্টে স্বাগত সম্ভাষণ জানানো হচ্ছে। আমি হলাম আপনাদের ঘোষক সিডনি সেলডন। আমরা একটা উত্তেজক অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করতে চলেছি। বুঝতে পারলে?

পনেরো মিনিট কেটে গেছে। ভদ্রলোক স্টুডিওর ঘড়ির দিকে তাকালেন। হাত তুললেন— সকলে শান্ত হয়ে যান। তিনি গুনতে শুরু করেছেন। আমার দিকে তাকালেন। আমি একেবারে নিশ্চুপ হয়ে বসে আছি। আমি জানি, এভাবেই একটা সাংঘাতিক জগতের দুয়ার উন্মোচিত হবে।

আমি মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিলাম। তারপর গলাটাকে সুন্দর করে বললাম— শুভ সন্ধ্যা।

কিন্তু গোলমাল হয়ে গেল, নামটা আটকে গেল। হায়, নতুন পদবিটা উচ্চারণ করতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলেছি।

অন্য প্রতিযোগীদের সাথে দেখা হল। তারা মোটামুটি ভালোভাবেই তাদের অনুষ্ঠান করেছে। অ্যাকরডিয়ানবাদক একটা অসাধারণ সুর বাজিয়েছে। কমেডিয়ান হাসিয়েছে। গায়ক গান গেয়েছে ভালোভাবে। কোনো কিছু গোলমাল হয়নি। শেষ পর্যন্ত ওই মহিলা পিয়ানোবাদিকার পরিচয় দিলাম তার নাম ঘোষণা করলাম। সে কাঁদতে শুরু করল। ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল। আমি জানি না কী করব। আমায় কী ঘোষণা করতে হবে।

আমি মাইক্রোফোনের পাশে সরে গিয়ে বললাম— ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়রা, আমরা সকলেই অ্যামেচার, পরবর্তীকালে আমরা পেশাদার হয়ে যাব।

আমি কথা দিয়ে মন ভোলাবার চেষ্টা করছি।

তারপর? পরিচালক আমার কাছে এসে বললেন- তোমার নাম কী? তুমি নামটা বলতে গিয়ে এমন কেন করছিলে?

এভাবেই আমার সামনে ওই জগৎটাও বন্ধ হয়ে গেল।

পল অ্যাশ আমাকে তার সাথে ভ্রমণের অনুমতি দেননি, তবে এখান থেকে একটা সুবিধা হয়েছিল। আমাদের পরিবারের সকলেরই পদবি পাণ্টে সেলডন হয়ে গিয়েছিল। শুধু জ্যাঠামশাই, হ্যারি ছাড়া। সে তখনও তার পুরোনো পদবিটাকে আঁকড়ে ধরে ছিল।

মে মাসের শুরু। আমার ভাই সিমুর বিয়ে ঘোষণা করল। খবরটা আমাদের অবাক করে দিয়েছে। তার বয়স মাত্র উনিশ বছর। মনে হয় সে বোধহয় ছোটো থেকেই পাকাপোক্ত হয়ে জন্মেছে।

আমি হব নিতবর। ভারী আনন্দের দিন। তার ভাবি বউয়ের সঙ্গে দেখা হল, সিডনি সিনগার। হ্যারির ব্রোকারেজ অফিসে চাকরি করে। সিমুরের সাথে সেখানেই পরিচয়। মেয়েটার মধ্যে উষ্ণতা আছে, আছে কৌতুকবোধ।

বিয়ের অনুষ্ঠানটা ছিমছাম। পরিবারের সকলে উপস্থিত হয়েছিল। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হলে আমি সিমুরকে অভিনন্দন জানিয়ে বললাম, মেয়েটা সাংঘাতিক। তোকে সারাজীবন ভালোবাসবে।

ছ-মাস কেটে গেছে, তাদের ডিভোর্স হয়ে গেল।

আমি প্রশ্ন করে ছিলাম- সিমুর?

-ও বলছে, আমার নাকি আর একটা পরকীয়া প্রেম আছে।

তার ফলে ডিভোর্স?

-না, ও আমাকে শান্তি দেয়নি।

এবার কী করবি?

-ও অন্য কারোর সাথে আমাকে দেখেছে।

-সত্যি?

-না, ও আমার মুখ দর্শন করতে চাইছে না। হলিউডে চলে গেছে। সেখানে ওর এক ভাই আছে, ডরোথি আরজনার নামে এক মহিলা পরিচারিকার কাছে কাজ করবে।

.

রেডিওর প্রতি আকর্ষণ আমার যায়নি। রেডিওর মাধ্যমে আমি একটা নতুন পেশার সন্ধান করতে পারি। বিভিন্ন রেডিও স্টেশনে হুঁ মারছি, ঘোষক হিসেব চাকরি পাওয়া যায় কি?

এক রবিবার বিকেলবেলা। অ্যাপার্টমেন্টে কেউ নেই। আমি পিয়ানোর সামনে বসে আছি। একটা সুর ভাজছি মনে মনে একটা গান লেখা যায় কি? যদি বলি আত্মত্যাগ সম্ভাষণ?

চেষ্টা করতে হবে। ১৯৩৬- বড়ো বড়ো হোটেলের বলরুমে নাচের আসর বসছে। বিশমার্ক হোটেলের অর্কেস্ট্রা লিডার ফিল লেভান্ট, আমি কখনও তার সঙ্গে কথা বলিনি। মাঝে মধ্যে তাকে দেখতে পাই। আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ি।

আমার লেখা নতুন গানটা তাকে শোনালাম। শুনে সে কি অবাক হল? আমি জানি না।

আমি তার হাতে গানের একটা পাণ্ডুলিপি তুলে দিলাম। আমি ভাবলাম, সে বোধহয় খুশি হবে। সে তাকাল না, এই স্বপ্নটাও হয়তো ব্যর্থ হল।

এক ঘন্টা কেটে গেছে ফিল লেভান্ট চেকরুমে ফিরে এসেছে।

সে বলছে- এই গানটা তুমি লিখেছ?

আমার নিঃশ্বাস বন্ধ কেন?

-এটা অসাধারণ। এটা হিট হবে। আমি কি এটাতে সুর দেব?

-হ্যাঁ, দারুণ কী?

দি আদার সাইড থা মাঁ । সিডনি সেলডন

পরের দিন সক্যেবেলা, আমি কোট আর হ্যাট সাজাতে ব্যস্ত। বলরুম থেকে শব্দ ভেসে এল। কে যেন আমার গানটা পিয়ানোতে বাজাচ্ছে। শরীরের সবকটা রোমকূপে উত্তেজনা। এই অর্কেস্ট্রা সারা দেশ জুড়ে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে। দেশের সবাই আমার নাম শুনতে পারে।

কাজ শেষ হতে হতে মাঝরাত, আমি বাড়িতে গেলাম, বিধবস্ত, গরম জলে স্নান করলাম। বাবা বাথরুমের দিকে তাকিয়ে আছে। একটা টেলিফোন এসেছে।

এই মধ্যরাতে কে?

উনি বলছেন- ফিল লেভান্ট।

আমি চমকে উঠেছি। তোয়ালে জড়িয়ে এগিয়ে এসেছি- মিঃ লেভান্ট?

-সেলডন?

-হ্যামস মিউজিক কোম্পানি নামে এক পাবলিসার তোমার গানটা রেডিওতে শুনেছে। তারা এটা প্রকাশ করতে চাইছে।

আমার হাত থেকে রিসিভারটা খসে পড়ে গেল।

-তুমি কি এখন আসতে পারবে?

-আমি এখনই যাচ্ছি।

আমি গামছা নিয়ে ছুটলাম ।

বাবা জানতে চাইল- কী হয়েছে?

আমি বললাম পুরো ব্যাপারটা ।

বাবা গাড়িটা দিল, চাবি দিল । বলল- সাবধানে যাস ।

আমি ছুটছি, বিসমার্ক হোটেলে পৌঁছোতেই হবে । আমার মনটা ঘোড়ার বেগে ছুটে চলেছে । আমার প্রথম গান প্রকাশিত হবে । সাইরেনের শব্দ । লাল আলো । একজন পুলিশ মোটরসাইকেল থেকে নেমে আমার কাছে এগিয়ে এসেছে ।

-এত তাড়াতাড়ি কেন?

-অফিসার আমাকে ক্ষমা করবেন, বিসমার্ক হোটেলে এক পাবলিশারের সঙ্গে দেখা করতে হবে । আমি সেখানকার চেকরুমে কাজ করি । আমার গান একজন প্রকাশ করতে চাইছে ।

এক নিঃশ্বাসে বলে গেলাম ।

ভদ্রলোকের কঠিন মুখ ড্রাইভারের লাইসেন্স?

-হ্যাঁ, লাইসেন্স দেখালাম ।

উনি বললেন আমাকে অনুসরণ করো।

আমার চোখে বিস্ময়-কোথায়? আমাকে টিকিট দিন। আমি এখনই চলে যাই।

-এটা একটা নতুন পদ্ধতি, তাই না? আমরা এখন থেকে কাউকে আর টিকিট দেব না।
আমরা অপরাধীদের সোজা পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাব।

আমার হৃদয় ডুবে গেছে অফিসার, বিশেষ করে আমার ব্যাপারটা দেখুন। আমাকে
যেতেই হবে। টিকিট দিন।

-আমাকে অনুসরণ করো।

আমার সামনে কোনো উপায় ছিল না। উনি মোটরসাইকেল চালু করলেন। আমাকে
পেছনে রাখলেন। আমি তাকে অনুসরণ করছি। হায়, নতুন প্রকাশকের সঙ্গে কথা হবে।
আর এখন কিনা আমি চলেছি থানার উদ্দেশ্যে।

আলো পরিবর্তিত হচ্ছে। হলুদ থেকে লাল, আমি থেমে গেছি। কখন সবুজ হবে, আমি
যাবার চেষ্টা করছি। মোটর সাইকেলে বসা পুলিশম্যানকে কোথাও দেখতে পেলাম না।
আমি কি এবার পালাব? বড়ো বেশি আশাবাদী হয়ে উঠেছি। উনি বোধহয় আমার কথা
ভুলে গেছেন। অন্য কাউকে ধরবার চেষ্টা করছেন। আমি আরও বেশি জোরে পালিয়ে
যাবার চেষ্টা করলাম।

বিশমার্ক হোটেলে পৌঁছে গেছি। কী আশ্চর্য, বিশ্বাস করতে পারছি না। সেই পুলিশের লোকটি দাঁড়িয়ে আছেন।

জ্বলন্ত চোখে আগুন-কী হে ছোকরা, আমার হাত থেকে পালাবে ভেবেছিলে?

আমি আমতা আমতা করছি স্যার, আমি পালাতে চাইনি। আমি তো আপনাকে আমার ড্রাইভারের লাইসেন্স দিয়েছি। আমি এখানে আসছি, বলেছি।

-ঠিক আছে, চলো, আমরা পুলিশ স্টেশনে যাব।

আমি বেপরোয়া- বাবাকে ডাকব?

-অনেক সময় নষ্ট হয়েছে।

-এক সেকেন্ড সময় লাগবে।

-যাও, এখনই করো।

আমি বাড়ির নাম্বারে ফোন করলাম। বাবা ফোন ধরল।

বাবা?

কী হয়েছে?

দি আদার সাইড থু মাঁ । সিডনি সেলডন

-আমি এখন পুলিশ স্টেশনে যাচ্ছি। পুরো ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে বললাম।

বাবা বলল- আমি একবার অফিসারের সঙ্গে কথা বলব।

আমি পুলিশম্যানকে বললাম আমার বাবা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।

লোকটা বলল- ঠিক আছে, না, আমি শুনব না। আপনার ছেলেকে নিয়ে থানায় যাচ্ছি। কী? ব্যাপারটা ভালোই, তার মানে? আমার একজন শালা আছে, তাকে চাকরি দিতে হবে। ঠিক আছে, আমি ঠিকানাটা নিচ্ছি।

উনি লিখতে বসলেন। তারপর বললেন- মিঃ সেলডন, কাল সকালে পাঠিয়ে দেব, কেমন? আর আপনার ছেলের জন্য চিন্তা করতে হবে না।

আমি ওদের সংলাপ শুনছিলাম। অবাক হয়ে গেছি। অফিসার রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। আমার হাতে ড্রাইভারের লাইসেন্সটা তুলে দিয়ে বললেন- আর কখনও এভাবে যাবার চেষ্টা করো না, কেমন?

আমি কাউন্টারে গিয়ে বললাম- ফিল লেভান্ট কোথায়?

-উনি অর্কেস্ট্রা রুমে আছেন।

ম্যানেজারের অফিসে গিয়ে আমি একজন ভদ্রলোককে দেখতে পেলাম, মধ্য পঞ্চাশ . বয়স।

আমি ভেতরে ঢুকলাম। উনি বললেন-তা হলে এই হল সেই বিস্ময়কর প্রতিভা। আমার নাম ব্রেন্ট, আমি টি. বি হার্মসের সঙ্গে আছি।

টি, বি. হার্মস হল সবথেকে বড় সংগীত বিষয়ক প্রকাশক।

উনি আমাকে বললেন- ওরা নিউইয়র্কে তোমার গান শুনেছে। এটা প্রকাশ করতে চাইছে।

আমার অন্তর আনন্দে গান গাইতে শুরু করেছে।

উনি বললেন একটা সমস্যা।

-কী সমস্যা?

-ফিল লেভান্টকে দিয়ে এই কাজটা হবে না। আরও গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষকে দিয়ে এই কাজটা করতে হবে।

আমার হৃদয় বসে গেল। আমি তো আর কাউকে চিনি না।

-ড্রেক হোটেলে হোরেস হেইডট সংগীত পরিচালনা করেন। ব্রেন্ট বললেন- তুমি ওনার সঙ্গে দেখা করতে পারো। তাকে তোমার গানটা শোনাতে পারো।

হোরেস হলেন এই দেশের সবথেকে জনপ্রিয় ব্যান্ড লিডার।

দি আদার সাইড থু মাঁ । সিডনি সেলডন

উনি আমার হাতে হোরেসের কার্ড দিলেন। বললেন- ওনাকে বলো আমাকে একটা ফোন করতে। উনি আমার ঘড়ির দিকে তাকালেন, প্রায় বারোটা বাজে। হোরেস এখন হয়তো বাজাচ্ছেন।

আমি বাবার গাড়িতে করে ড্রেক হোটেলে পৌঁছে গেলাম। সেখানে নামলাম। বলরুমের দিকে যাব। সেখানে হোরেস বসে আছেন।

ডেস্কে বসে থাকা ভদ্রমহিলা বললেন- আপনার কি রিজার্ভেশন আছে?

-না, আমি হোরেসের সঙ্গে দেখা করার জন্য এসেছি।

উনি একটা ফাঁকা টেবিল দেখিয়ে বললেন- এখানে অপেক্ষা করুন।

পনেরো মিনিট কেটে গেছে। হোরেস এগিয়ে এসেছেন, আমি বললাম- মিঃ হেইডট, আমার নাম সিডনি সেলডন, আমি আপনাকে একটা গান শোনাতে চাইছি।

দুঃখিত, আমার হাতে সময় নেই।

-কিন্তু হার্মস এটা করতে বলেছেন।

উনি চলে যাচ্ছেন, আমি চিৎকার করছি- হার্মস এটা প্রকাশ করতে চাইছেন। কিন্তু আপনি সাহায্য না করলে হবে না।

উনি থেমে দাঁড়িয়ে বললেন- দেখি।

আমি ওনার হাতে গানের লেখাটা তুলে দিলাম। উনি পড়ে বললেন- আহা, ভারী সুন্দর গান।

-আপনি সুর সংযোজনা করবেন তো?

-কিন্তু মোট লাভের অর্ধেকটা আমায় দিতে হবে।

আমি একশো শতাংশ দিতে রাজী ছিলাম ঠিক আছে। আমি ওনার হাতে ব্রেণ্টের দেওয়া কার্ডটা তুলে দিলাম।

কালকে অবশ্যই আমার সঙ্গে দেখা করো।

পরের দিন রাতে আমি ড্রেক হোটেলে এলাম। আমি শুনতে পেলাম হোরেস হেইডট আমার গানটা বাজাচ্ছেন। অর্কেস্ট্রার অসাধারণ বৃন্দবাদন। ফিল লেভান্টের থেকে অনেক শ্রুতিমধুর। আমি বসলাম। হোরেস উঠলেন।

আমি বললাম- মিঃ ব্রেণ্টের সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে কি?

-হ্যাঁ, আমরা একটা শর্ত করেছি।

আমি হাসি। আমার গানটা এবার প্রকাশিত হবে।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা ব্রেণ্ট আমার সঙ্গে বিশমার্ক হোটেলে দেখা করতে এসেছে।

আমি প্রশ্ন করলাম- সব কিছু ঠিক আছে?

-না, একটা সমস্যা হয়েছে।

কী সমস্যা।

-হেইডট পাঁচ হাজার ডলার অ্যাডভান্স চাইছেন, কিন্তু একটা নতুন গানের জন্য আমরা কখনওই এত টাকা খরচ করতে পারব না।

আমার সমস্ত শরীর জমে পাথর। কাজ শেষ হল। আমি ড্রেক হোটেলে ফিরে গিয়ে হোরেসের সঙ্গে দেখা করলাম।

আমি বললাম- মিঃ হেইডট, আমি অ্যাডভান্সের কথা চিন্তা করছি না। আমি চাই, আমার প্রথম গানটা প্রকাশিত হোক।

উনি বললেন- এই গানটা প্রকাশিত হবে। এটা আমি নিজেই প্রকাশ করব। আমি আসছে সপ্তাহে নিউইয়র্কে যাব। সেখানে অনেক বেশি জনপ্রিয়তা পাবে।

রাতে হোরেসের অনুষ্ঠান থাকে। এছাড়া তিনি প্রত্যেক সপ্তাহে একটা করে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

তাহলে? আমার মাই সাইলেন্ট সেলফ গানটা নিউইয়র্ক থেকে বেতারে সম্প্রচারিত হবে। সারা দেশের মানুষ শুনতে পাবে! কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি নিয়মিত হোরেসের অনুষ্ঠান

শুনতে থাকি। হ্যাঁ, উনি ঠিক কথাই বলেছিলেন। বোরবার আমার গানটা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এটা কখনওই প্রকাশিত হয়নি।

এই ঘটনাতে আমি কিন্তু একেবারে ভেঙে পড়িনি। বরং নিজস্ব প্রতিভার ওপর আমার আস্থা আরও বেড়ে গেল। আমি যদি এমন একটা গান লিখতে পারি, তাহলে আরও অনেক লিখতে পারব। আমি তাই করলাম। ফাঁকা সময় পেলেই পিয়ানোর সামনে বসে পড়ি। শব্দ সাজিয়ে গান লিখি। ভাবলাম, বারোটা গান হলে নিউইয়র্কে পাঠাব। বারোটা গান হল, নিজে গেলে কেমন হয়? সেখানে গেলে তো কাজেরও একটা সন্ধান হতে পারে।

মা আমার গান শুনত, সব সময় উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠত।

-ডার্লিং, তুই তো আরভিন হারলিনের থেকে অনেক সুন্দর গান লিখতে পারছিস। কবে নিউইয়র্ক যাবি?

আমি মাথা নেড়ে বললাম না, এখানে তিন তিনটে চাকরি। আমি কী করে নিউইয়র্ক যাব।

মা শান্তভাবে বলেছিল- তোকে যেতেই হবে। নিজে না গেলে কোনো কাজ হবে না।

-অনেক খরচ।

-ডার্লিং, একটা মস্ত বড় সুযোগ, এই সুযোগ হাতছাড়া করিস না।

আমি জানি না, মা কীভাবে আমাকে উদ্দীপ্ত করতে চাইছে।

রাতে অনেক আলোচনা হল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, আমি নিউইয়র্কে যাব। সেখানে একটা চাকরি করব, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার গান ভালোভাবে বিক্রি না হচ্ছে।

পরের শনিবার যাত্রা করব। মা আমাকে নিউইয়র্কে যাবার একটা টিকিট কেটে দিয়েছিল। গ্রেহাউন্ড বাসে।

রিচার্ড আর আমি সমস্ত রাত গল্প করেছিলাম।

রিচার্ড বলেছিল- আরভিন হারলিনের মতো তুই গান লিখবি?

আমি বলেছিলাম হ্যাঁ।

-তা হলে? অনেক টাকা আসবে, আমার মাকে আর কাজ করতে হবে না!

গ্রেহাউন্ড বাস স্টেশন

০৬.

নিউইয়র্ক, ১৯৩৬- এর আগে আমি কখনও বাস ডিপোতে প্রবেশ করিনি। গ্রেহাউন্ড বাস স্টেশন, উত্তেজনায় ভরপুর। বাসটা বিরাট, ওয়াশরুম আছে। আরামদায়ক সিট। সাড়ে চারদিনের লম্বা সফর। সফরটা ক্লান্তিকর। কিন্তু আমি আমার ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছিলাম।

বাস স্টেশনে পৌঁছে গেলাম, নিউইয়র্ক, পকেটে তিরিশ ডলার। এর বেশি মা-বাবা দেবে কেমন করে?

আমি ওয়াই এম. সি. এ-র ম্যানেজারকে ফোন করে একটা ঘর বুক করলাম। ঘরটা ছোটো। সপ্তাহে চার ডলার করে ভাড়া লাগবে। আমি জানি, তিরিশ ডলার নিয়ে বেশিদিন লড়াই করা যাবে না।

আমি ওয়াই এম সি এ-র ম্যানেজারকে বলেছিলাম একটা চাকরি দিতে পারেন?

-আমাদের অতিথিদের জন্য একটা চাকরি পরিষেবা আছে।

বাঃ, সেটা কি এখন পাওয়া যাবে?

উনি একটা কাগজ তুলে আনলেন। বললেন- আর. কে, ও জেফারসন থিয়েটারে একটা কাজ আছে। তুমি কি করবে? ১৪, স্ট্রিটে।

-আমায় যেতেই হবে। আমি বললাম।

ম্যানেজার একটুকরো কাগজের ওপর কী সব লিখে আমার হাতে দিয়ে বললেন এটা নিয়ে কাল সকালে থিয়েটারে চলে যাও।

এই প্রথমবার আমি নিউইয়র্কে এসেছি, বেশিক্ষণ সময় কাটায়নি। অথচ একটা চাকরি। পেতেই হবে।

চাকরিটা পেয়ে গেলাম। বাবা মাকে খবরটা দিলাম।

মা বলল- ভীষণ ভালো লাগছে। তুই সফল হয়ে ফিরিস বাবা।

প্রথম সন্ধ্যাটা আমি নিউইয়র্ক শহর আবিষ্কারে মেতে উঠলাম। হ্যাঁ, এই শহরের একটা আলাদা জাদু আছে।

সব কিছুই মস্ত বড়ো, দু-পাশের বাড়ি, মার্কেট, রাস্তাঘাট, নিয়ন আলো, ট্রাফিক, এমন কী মানুষজন পর্যন্ত।

আর. কে, ও জেফারসন থিয়েটার, ১৪ স্ট্রিট, একটা পুরোনো দোতলা বাড়িতে অবস্থিত। আর কে, ও, থিয়েটারের অংশ।

আমি ৩৮ নম্বর ব্লকে চলে গেলাম। কাগজটা থিয়েটার ম্যানেজারের হাতে দিলাম। উনি তাকিয়ে বললেন- এ ধরনের কাজ কখনও করেছ?

-না, স্যার।

-ঠিক আছে। হাঁটতে পারবে?

-হ্যাঁ, স্যার।

ফ্ল্যাশলাইট জ্বালাতে পারবে?

-হ্যাঁ, স্যার।

-তাহলে তুমি এই কাজটা করতে পারবে। প্রতি সপ্তাহে ১৪ ডলার করে পাবে। ছদিন কাজ করতে হবে। তোমার কাজ শুরু হবে বিকেল ৪-২০ থেকে। শেষ হবে মাঝরাতে।

-ঠিক আছে।

তার মানে আমি সারাদিন কাজ করতে পারব। গান লিখতে পারব। বিভিন্ন সংগীত পরিচালকদের দরজায় ঘুরতে পারব।

-ওই ঘরে চলে যাও। দেখো কোনো ইউনিফর্ম পাও কিনা।

আমি একটা ইউনিফর্ম পাওয়ার চেষ্টা করলাম।

ম্যানেজার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন- ঠিক আছে, ব্যালকনিতে চোখ রাখো।

-কোন ব্যালকনি?

-এখানেই তোমার কাজ কাল থেকে শুরু হবে।

কাল থেকে আমি সংগীত রচয়িতা হিসেবে আমার নতুন জীবন শুরু করব।

ব্রিল বিল্ডিং, ১৬১৯ ব্রডওয়েতে অবস্থিত। ৪৯ নম্বর স্ট্রিটে। সেখান থেকেই অভিযান শুরু করলে কেমন হয়?

একটার পর একটা গান ভেসে আসছে, রাস্তায় দরজায় যে সমস্ত নাম ঝুলছে সেগুলো চমকে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। সংগীত জগতের বিশিষ্ট মানুষদের অফিস এখানেই। এখান থেকেই একের পর এক সংগীত প্রতিভার জন্ম হয়েছে। কত নাম করব? কোলে পোরটার, আরভিন বারলিন, রিচার্ড রজারস, জর্জ এবং ইরা গাউইন, জেরম কার্ন- আরও কত নাম।

আমি টি. বি. হার্মস অফিসে পৌঁছে গিয়ে ডেস্কে বসে থাকা লোকটিকে বললাম সুপ্রভাত, আমি সিডনি সেলডন।

কী করব আপনার জন্য?

আমি মাই সাইলেন্ট সেলফ নামে একটা গান লিখেছি। আপনারা এই গানটা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন।

-হ্যাঁ, ওনার মুখে একটু হাসি, মনে পড়েছে। এখন কি আর রাজী নন?

-না, এই গানটা অনেকবার বেতারে প্রচারিত হয়েছে। হোরেস হেইডট এই গানটা অনেকবার বাজিয়েছেন।

নতুন কিছু আছে?

-হ্যাঁ। কাল সকালে আসব।

তারপর শুরু হল নতুন কাজ। মানুষজনকে আলো ফেলে সিট দেখাতে হচ্ছে। ম্যানেজার ঠিকই বলেছিলেন, এই কাজটা যে কেউ করতে পারে। একটাই ব্যাপার খুব খারাপ লাগে। বারবার একই সিনেমা দেখতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হয়ে যেত, আমি পেছনের সিটে বসে থাকতাম। সবার দিকে নজর রাখতাম।

একের পর এক সিনেমা দেখছি। মাথা ঝিমঝিম করছে। মধ্যরাত। কাজ শেষ হয়ে গেছে। হোটেলে ফিরে যাচ্ছি। ছোট ঘরটাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে। জানি, একদিন এই ঘরটা একটা মস্ত বড়ো রাজপ্রাসাদে রূপান্তরিত হবে। আমি গান লিখব, সেই গান মানুষ পাগলের মতো ভালোবাসবে।

সকালবেলা উঠে টি. বি. হার্মসে যাব। কিন্তু একটাই প্রশ্ন, ওরা আমার কোন গানটা আগে প্রকাশ করবে? আমি ইতিমধ্যে অনেকগুলো গান লিখে ফেলেছি। এ হ্যান্ডফুল অফ স্টারস, হোয়েন লাভ হ্যাঁজ গন , দ্য ঘোস্ট অফ মাই লাভ আরও কত কী?

পরের দিন সকাল আটটা বেজে তিরিশ মিনিট। টি. বি. হার্মস পাবলিশিং কোম্পানির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। দরজা খুলল নটার সময়। মিঃ টাস্কার এলেন।

তিনি আমার হাতের বিরাট খামটা দেখে বললেন- কয়েকটা গান এনেছেন কি?

-হ্যাঁ, স্যার।

তিনি অফিসে বসলেন। আমি খামটা ওনার হাতে তুলে দিলাম।

উনি বললেন- এখানে অপেক্ষা করতে হবে না। সুযোগ পেলে পড়ে দেখব। কালকে আসুন, কেমন?

আমি মাথা নেড়ে বললাম ঠিক আছে।

আমি জানি, আর চব্বিশ ঘণ্টা বাদে আমার নতুন উত্তরণ হবে।

ইউনিফর্ম পরে আর. কে. ও জেফারসনে বসে আছি। ম্যানেজারকে ব্যালকনিতে দেখা গেল। অনেকে হাসাহাসি করছে। শেষ রোতে এক তরুণ তরুণী বসে আছে। দেখলাম, তারা আলো আঁধারে অসভ্য খেলা শুরু করেছে। আমি উদাসীনতার ভান করে সামনে থেকে চলে গেলাম।

সকাল আটটা, মিঃ টাস্কার একটু আগে এসেছেন। দরজা খুললেন সুপ্রভাত সেলডন।

মুখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করছি। অফিসের ভেতরে চলে গেলাম।

—মিঃ টাস্কার, গানগুলো পড়েছেন কি?

উনি বললেন- অসাধারণ লেখা।

আমার মুখে উজ্জ্বল আলো, এবার উনি কী বলবেন?

আমি জানতে চাইলাম কোনটা আপনার ভালো লেগেছে?

দুর্ভাগ্য, এখন এসব গানের কোনো প্রয়োজন নেই।

মনটা খারাপ হয়ে গেল কিন্তু একটাও কি ভালো লাগল না?

—নতুন কিছু আছে কি? তিনি আমার হাতে খামটা তুলে দিলেন।

এইভাবেই আলোচনাটা শেষ হয়ে গেল। আমার মনে আশার সঞ্চার— একবার যখন শুরু হয়েছে, আমি এর শেষ না দেখে ছাড়ব না।

আমি অন্যান্য প্রকাশকের দরজায় ঘুরতে শুরু করলাম। সকলেই জানতে চাইছেন, আগে কোনো গান কি প্রকাশিত হয়েছে?

-না, স্যার ।

-আমরা নতুন কোনো সংগীত রচয়িতাকে সুযোগ দিই না । কয়েকটা প্রকাশিত হলে তবেই আসবেন, কেমন?

কী করে আমি গান প্রকাশ করব? কেউ যদি আমাকে পাত্রা না দেয়? সপ্তাহ কেটে গেল । থিয়েটারে সময় যাচ্ছে । অবসর সময়ে গান লিখছি ।

অসাধারণ কতগুলো ছবি দেখে ফেললাম । সান ফ্রানসিসকো, মাই ম্যান গডফ্রে, শ্যাল উই ড্যান্স? ইত্যাদি ।

টাকা ক্রমশ কমে আসছে । নাতালিয়া কুড়ি ডলারের চেক পাঠিয়ে ছিল । সেটা ফেরত দিয়েছি । আমি জানি, বাড়ির কী পরিস্থিতি । বাবা কাজ করছে না । সাংসারিক অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে । আমি এখন কেন আমার নিজের কথা চিন্তা করছি? নিজেকে অসম্ভব স্বার্থপর বলে মনে হয় । নতুন একগোছ গান তৈরি হয়েছে । আবার প্রকাশকদের দরজায় দরজায় ঘুরলাম । তারা একই রকম কথা বলল- কোনো গান প্রকাশিত হলে তবেই আসবেন । নতুনদের আমরা সুযোগ দিই না ।

আমাকে তখন হতাশা গ্রাস করেছে । সবকিছুই নিরাশ বলে মনে হচ্ছে । আমি কি সারাজীবন এইভাবে হাতড়ে মরব নাকি? কেউ আমার গান শুনতে চাইবে না?

১৯৩৬ সালের ২ নভেম্বর । আমি আমার মা বাবাকে একখানা চিঠি লিখেছিলাম । সেই চিঠির অংশবিশেষ এখানে তুলে দেওয়া হল ।

-তোমাদের সুখী করার জন্য আমি প্রাণপাত পরিশ্রম করছি। কিন্তু মনে হচ্ছে, আমার সুখ বুঝি একটা অলৌকিক ঘটনা। আমি কখনও সুখকে করায়ত্ত করতে পারব না। বাতাসের মধ্যে সুখ ভেসে চলেছে, সমুদ্রের ওপর দিয়ে, সবুজ প্রান্তরের ভেতর দিয়ে, গাছ এবং ছোটো নদীর মধ্যে দিয়ে, কৃষিক্ষেত্র এবং বৃষ্টিস্নাত পর্বতচূড়ার ওপর দিয়ে। প্রথমে আমি তাকে দেখতে পেয়েছি। তারপর সে আমার দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেল। আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আর ভালো লাগছে না কোনোকিছু। হায় ঈশ্বর, কোথায় গেল আমার ভাগ্যের সেই বাতাস, যা আমাকে উদ্দীপ্ত করবে।

পরদিন সকালবেলা, ওয়াই এম সি এ লবিতে আমার মতো একজনকে দেখতে পেলাম। এক মনে কী যেন লিখে চলেছে। সে মনে মনে গুনগুন করে কী যেন গাইছে, হয়তো গান লিখছে।

আমি প্রশ্ন করলাম- তুমি কি গান লেখো?

সে বলল- হ্যাঁ।

-আমিও লিখি। আমি সিডনি সেলডন।

ও হাত বাড়িয়ে বলল- আমার নাম সিডনি রোসেনথাল।

একটা দীর্ঘ বন্ধুত্বের সূত্রপাত হল। সকালটা আমরা গানে গানে ভুবন ভরিয়ে দিলাম।

পরের দিন সকালবেলা, কাজ শুরু হবে, থিয়েটারের ম্যানেজার আমাকে অফিসে ডেকে নিয়ে বললেন- তুমি বাকারের পোশাক পরো। বাকার না আসা পর্যন্ত তার জায়গায় তোমাকে কাজ করতে হবে। সারাদিন কাজ করবে। তোমাকে থিয়েটারের এখানে ওখানে ঘুরতে হবে। বলবে, এখানে আর সিট নেই। তাড়াতাড়ি আসুন। তোমাকে আরও বেশি পয়সা দেব।

আমার মনে আনন্দ। হ্যাঁ, বেশি টাকা আসবে।

কত পাব?

-প্রতি সপ্তাহে ১৫-৪০।

তার মানে এক ডলার করে মাইনে বৃদ্ধি পেল।

ইউনিফর্ম পরলাম। রাশিয়ান আর্মি জেনারেল বলে মনে হল। বাকারের কাজের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি না। মাঝে মধ্যে চিৎকার করছি এন্ফুনি বসার জায়গা পাবেন, কাউকে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে না।

সুন্দর কণ্ঠস্বর আনার চেষ্টা করলাম, বললাম- একই পয়সায় দু-দুটো বই। একজন মানুষ কি দুবার বাঁচতে পারে? আসুন-আসুন-দেখুন। এমন একটা স্মৃতি আপনারা কোনোদিন ভুলতে পারবেন না। না, অপেক্ষা করতে হবে না। টিকিট প্রায় শেষ হয়ে আসছে।

আসল বার্কীর কোনো দিন এইভাবে স্বরোৎক্ষেপণের মধ্যে মাদকতার সৃষ্টি করেনি। আমি নতুন একটা জগতের জন্ম দিলাম। এখনও সময় আছে। সুযোগ পেলেই প্রকাশকদের দরজাতে গিয়ে হাজির হই। লোকে আমার গান শুনবে না? সিডনি রোসেনথাল আর আমি একসঙ্গে কয়েকটা গান গাইলাম। অনেক প্রশংসা পেলাম। কিন্তু স্বপ্ন সফল হল না।

সপ্তাহ শেষ হয়ে গেছে। দশ সেন্ট পকেটে পড়ে আছে। থিয়েটার থেকে ব্রিল বিল্ডিং-এ গেলাম। ভাবলাম, কী খাব? পাঁচ সেন্ট দিয়ে হটডগ, নাকি কোকাকোলা? অনেকটা হাঁটতে হবে। নাঃ, শুধু হটডগ খেলে হয়।

কয়েকদিন কেটে গেছে। বার্কীর কাজ এগিয়ে চলেছে। মনটা নানা কারণে খারাপ হয়ে গেছে।

আমি তখন থিয়েটারের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে লোক জড়ো করছি। বলছি কনকোয়েস্ট ছবিটা দেখতেই হবে। থেটা গার্বো আর চার্লস বয়ারের অসাধারণ অভিনয়। এর পাশাপাশি আর একটা ছবি দেখতে পাবেন। নাথিং সাক্রেড। সেখানেও অনেক ভালো অভিনেতারা আছেন। আসুন-আসুন, আপনি যদি প্রেমিক হয়ে থাকেন, প্রেম কী, তা জানতে হলে দেখতে আসুন। বেশি খরচ হবে না- ৩৫ সেন্ট। এত সহজে দুটো ছবি। তাড়াতাড়ি করুন। তাড়াতাড়ি করুন।

হুড়মুড় করে দর্শকরা এল। পরের ছবির জন্য আমি আরও মজা করার চেষ্টা করলাম।

পরের সপ্তাহে একজন অদ্ভুত লোক আমার দিকে এগিয়ে এল। সে বলল- চিকাগো থেকে যে কুত্তার বাচ্চাটা এসেছে, সে কোথায়?

লোকটার কণ্ঠস্বর শুনে আমি বললাম কেন?

-আর. কে. ও থিয়েটারের ম্যানেজার বলেছে, এখন থেকে তাকে সবাই যেন নকল করে। সে বেজন্মাটা মোহমায়ার সৃষ্টি করেছে।

আমি কোনরকমে বলি- লোকটা কোথায় চলে গেছে, সে এলে আপনার কথা বলব। তারপর পুরোনো ঢঙে চিৎকার করতে শুরু করি, ভেতরে গেলে এখনই বসার জায়গা পাবেন। দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না... দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না...

আবার শুরু হল আমার অভিযান। একের পর এক প্রকাশকের দরজায় ঘুরছি। বিকেলবেলা ফাঁকা থাকতে হচ্ছে। এর পাশাপাশি সপ্তাহে তিনদিন সিনেমা দেখতে পাচ্ছি। ব্যালকনির সবথেকে সস্তার সিটে বসে আমি দেখলাম অনেকগুলো বিখ্যাত ছবি।

আমার নতুন বন্ধু সিডনি রোসেনথাল একটা চাকরি পেয়েছে। একদিন সে বলল আমরা এখন থেকে অন্য কোথাও গেলে কেমন হয়?

এক সপ্তাহ বাদে আমরা ওয়াই এম সি এ ছেড়ে ইউনিয়ান হোটেলে চলে এলাম। এটা থার্ড সেকেন্ড স্ট্রিটে অবস্থিত। দুটো বেডরুম, আর একটা লিভিংরুম পাওয়া গেল। ওয়াই এম সি এ-র তুলনায় এটা বোধহয় একটুকরো স্বর্গ।

মার একটা চিঠি হাতে এল। শোনা গেল, নিউইয়র্কে আমার এক দূর সম্পর্কের দাদা থাকে। সে নাকি একটা ক্যাসিনোতে চেকরুম পেয়েছে। লং আইল্যান্ডে। মা বলল, আমি যেন অবশ্যই তার সঙ্গে যোগাযোগ করি। তার নাম ক্লিফোর্ড উলফে।

সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল- আমি শুনেছি তুমি নিউইয়র্কে এসেছ। থাকো কোথায়?

আমি বললাম।

-তুমি কি চেকরুমে আমার সঙ্গে কাজ করবে? সপ্তাহে তিনরাত।

-হ্যাঁ। আমি করব। আমার এক বন্ধুকেও আনব?

নিয়ে এসো।

কাজ শুরু হল। আমরা দুজনেই লং আইল্যান্ডে কাজ করতে যেতাম। গ্লেনকোভ ক্যাসিনোতে। দায়িত্ব ছিল মাথার টুপি আর কোট পাহারা দেওয়া। তিন ডলার করে পেতাম। এছাড়া বুফের টেবিলে গিয়ে পেট ভরে খেতে পারতাম।

একটা গাড়ি আমাকে তুলে নিয়ে যেত। ঘণ্টা দেড়েকের যাত্রাপথ। সন্ধ্যার অবসান। আমরা আবার হোটেলে ফিরে আসতাম। যে বেশি টাকাটা আমার হাতে এল, সেটা মার কাছে পাঠাতাম। মা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তা ফেরত পাঠিয়ে দিত।

এক সন্ধ্যায় আমি চেকরুমের দিকে এগিয়ে গেছি। ক্লিফোর্ড আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল- তুমি যে সুটটা পড়ে আছে, সেটা ছিঁড়ে গেছে। নোংরা।

-হ্যাঁ।

-আর কোনো স্যুট নেই? আমি মাথা নাড়লাম- আমার ওয়াদ্রোবে একটা মাত্র ব্রিফকেস থাকতে পারে।

সে বলল- আমরা এটা দেখছি।

পরের রাত। আমি গ্লেনকোভে পৌঁছে গেছি। দাদা আমার হাতে একটা নীল রঙের স্যুট দিয়ে বলল, যাও, আমার দরজির কাছে চলে যাও, দেখো এটা তোমার ফিট করছে কিনা।

এরপর আমি যখনই গ্লেনকোভে যেতাম, ওই স্যুটটা পরতাম।

আমার মনোভাবে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন হচ্ছে। আনন্দ অথবা বেদনা কিছুই জাগছে। ১৯৩৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর। মা-বাবাকে লিখেছিলাম- এখন ইচ্ছেশক্তি অনেকটা কমে এসেছে। আমি জানি না শেষ পর্যন্ত জিততে পারব কিনা।

এক মাস বাদে আমি লিখেছি গান লেখার ব্যাপারটা অনেক কমে এসেছে। হয়তো, কোনো একদিন নাম করতে পারব। এখন কিছুই বলতে পারছি না।

মাথার ভেতর অনেক চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। দু-দুটো এপিসোড লিখে ফেলেছি। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কী হবে বুঝতে পারছি না। একটা ছন্নছাড়া পরিবেশ।

এক থিয়েটারের ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করলাম। হাতে একটা পাণ্ডুলিপিও ছিল। ম্যানেজার আমার পাণ্ডুলিপিটা পড়েও দেখলেন না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন- না, এখানে আপনার কোনো জায়গা হবে না।

নতুন এক ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন আমার নাম ম্যাক্স রিচ। আপনি কে?

আমি নাম বললাম।

ম্যাক্সের নাম আমি জানতাম। ইতিমধ্যে তাঁর লেখা দুটো গান বেতারে বাজছে। জনপ্রিয় হয়েছে একটা হল স্মাইল, ডার্ন ইয়া স্মাইল। আর দ্বিতীয়টি হল দ্য গার্ল ইন দ্য লিটল গ্রিন হাট।

-সিডনি, আপনার কোনো গান কি প্রকাশিত হয়েছে?

একই প্রশ্ন। আমি বললাম না, আমি দরজার দিকে পা বাড়ালাম।

উনি হাসলেন- ব্যাপারটা পাল্টাতে হবে। আপনি কি আমার হয়ে কাজ করবেন?

আমি অবাক, এটাই বোধহয় একটা সুযোগ। আমার স্বপ্ন।

আমি বললাম- এটা আমার ভালোবাসা।

-তিনতলায় আমার একটা অফিস আছে। কাল সকাল দশটায় আসুন। আমরা একসঙ্গে কাজ শুরু করব। সঙ্গে গানগুলো আনবেন, কেমন?

আমি আমতা আমতা করছি। আমি ঠিক সময়ে পৌঁছে যাব, মিঃ রিচ। আমি কোনোরকমে বলেছিলাম।

সিডনি রোসেনথালকে সব কথা বললাম। সে বলল-ধন্যবাদ। ম্যাক্স রিচ যে কোনো গান প্রকাশ করতে পারবে।

সময় হলে আমি তোমার গানগুলোও দেখাব।

আগে নিজের ভবিষ্যৎ ভাবার চেষ্টা করো কেমন।

সেই রাতে আমরা দুজন হৈ-হৈ করে ডিনার সেরেছিলাম। আমি এত উত্তেজিত যে খেতে পারছি না। এবার বোধহয় আমার সত্যিকারের ভাগ্যের উদয় হচ্ছে।

ম্যাক্স রিচ এক অসাধারণ মানুষ, প্রথম দর্শনেই আমার মনে হয়েছে।

মা-বাবাকে জানাব কি? একটু সময় হাতে থাক।

রাতের অন্ধকার, আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছি, ম্যাক্স রিচের মতো এক নামকরা মানুষ কেন আমার সাথে কাজ করতে রাজী হবেন? সমস্ত প্রকাশক আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। তার মানে? আমাকে আরও একবার আশাহত হতে হবে হয়তো।

সকাল দশটা। ম্যাক্স রিচ আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি তখন একটা গ্রেহাউণ্ড বাসের যাত্রী। চিকাগোতে ফিরতে হবে।

০৭.

১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে ভগ্ন মনোরথ হয়ে চিকাগোতে ফিরে এলাম। বাড়ির সবাই আমার দিকে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। মা বলেছিল, ওরা জানে না, কত বড়ো প্রতিভার অপমৃত্যু হয়ে গেল।

অর্থনৈতিক অবস্থাটা একই রকম আছে। আমাকে আবার বিশমার্ক চেকরুমে কাজ করতে হবে। দিনের বেলা একটা রেস্টুরেন্টে কাজ পেলাম। গাড়িগুলো দেখাশোনা করা। এটা রজার্স পার্কে অবস্থিত।

এক সন্ধ্যাবেলা আমার স্টুয়ার্ট ওয়ারনার আর তার বউ ভেরা অ্যাপার্টমেন্টে এল ডিনারের জন্য। তাদের সঙ্গে চার্লি ফাইনও ছিল। আমি সস্তার চিনা খাবার আনিয়ে ছিলাম। তখন ভেরা কথায় কথায় বলল- আমি আসছে সপ্তাহে সাক্রামেন্টোতে যাব, ক্যালিফোর্নিয়াতে।

ক্যালিফোর্নিয়া- এই নামটা আমার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকের সৃষ্টি করল। হলিউড, নতুন এক জগতের রাস্তা হয়তো আমার জন্য খুলে যাবে। আমি কি সেখানে যাব? একটার পর একটা স্বপ্ন দেখছি। শেষ অব্দি আমি বলেছিলাম- আমি কি সঙ্গে যাব?

তারা সকলে আমার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল।

ভেরা বলল- সিডনি, তুমি কী করে যাবে?

আমি বললাম আমার খুব যেতে ইচ্ছে করছে। মা-বাবার দিকে তাকিয়ে বললাম, ভেরার সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়া যাচ্ছি।

তারা নীরবতা পালন করল।

বাবা বলেছিল- এইমাত্র তুমি এসেছ, এখনই আবার চলে যাবে?

-হ্যাঁ, হলিউডে একটা চাকরি পেলে ভালো হয়।

না, আমরা দেখছি, এখানে একটা ভালো কাজ পাওয়া যায় কিনা?

আমি জানি, চিকাগো কখনও আমাকে ভালোবাসবে না। চিরকাল আমাকে এই চেকরুম আর ড্রাগস্টোরেই কাজ করতে হবে। আর ভালো লাগছে না।

কিছুক্ষণের নীরবতার পর মা বলল- সিডনি যা চাইছে ওকে তা করতে দেওয়া উচিত। এসো, এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আর চিন্তা করব না। তিন সপ্তাহের মধ্যে ওখানে যদি কোনো কাজ না পাও, তাহলে চলে এসো কিন্তু।

আমি জানি, হলিউডে আমার চাকরি পাকা। যতই ভাবছি, ততই আশাবাদী হয়ে উঠছি।

এবার সত্যি সত্যি অশান্তির অবসান হবে। পাঁচদিন বাদে আমি জামাকাপড় গোছাতে শুরু করেছি। ভেরা আর তার মেয়ে কারমেলের সাথে সাক্রামেন্টোতে যেতে হবে।

রিচার্ডের মন খুবই খারাপ- তুই কেন আবার চলে যাচ্ছিস? এই তো এলি।

আমি বললাম- তোকে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস পাঠাব কেমন?

শেষ অব্দি আমরা সাক্রামেন্টোতে পৌঁছে গেলাম। ভেরা এবং কারমেলকে গুডবাই জানিয়ে একটা সস্তার হোটেলে গিয়ে উঠলাম। পরের দিন সকালে বাস ধরে গেলাম সান ফ্রানসিসকোতে, সেখান থেকে লস এঞ্জেলস।

লস এঞ্জেলসে এসেছি হাতে একটা স্যুটকেস আর পকেটে ৫০ ডলার নিয়ে। লস এঞ্জেলস টাইমসের একটা কপি কিনলাম। সস্তার ঘর ভাড়া নিতে হবে।

একটা ব্যাপার আমার মনে এল, তা হল, এখানে বোর্ডিং হাউসের জন্য অনেক টাকা জমা দিতে হয়। এটা হলিউড। কিছু দূরেই সানসেট বুলেভার্ড।

তা হলে থাকব কোথায়? শেষ অব্দি খুঁজে খুঁজে একটা বাড়ি পেলাম। শান্ত পরিবেশে অবস্থিত।

আমি ডোরবেলে হাত দিলাম। বছর চল্লিশের এক হাসি খুশি ভদ্রমহিলা দরজাটা খুলে দিলেন।

দি আদার সাইড থ্রু ম্যাঁ। সিডনি সেলডন

-হ্যালো, বলল তোমাকে কীভাবে সাহায্য করব?

-আমার নাম সিডনি সেলডন। আমি কি কদিন এখানে থাকব?

-আমি গ্রেসি সাইডেল, ভেতরে এসো।

আমি স্যুটকেস নিয়ে হলে প্রবেশ করলাম। হ্যাঁ, এই বাড়িটাকে বোর্ডিং হাউস করা হয়েছে। মস্ত বড়ো লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, ব্রেকফাস্ট রুম, কিচেন। বারোটা বেডরুম। বেশির ভাগেই লোক আছে। চারটে সাধারণ বাথরুম।

আমি বললাম ভাড়া প্রতি সপ্তাহে ৪.৫০, তাই তো। এর মধ্যে ব্রেকফাস্ট ধরা আছে।

গ্রেসি সাইডেল আমার দিকে তাকালেন। আমার ছেঁড়া শার্ট। বললেন তুমি যদি চাও, আমি প্রতি সপ্তাহে চার ডলার করে নেব।

আমি ওনার দিকে তাকালাম, বললাম না, আমি সাড়ে চারই দেব। কিন্তু কতদিন থাকতে পারব, জানি না।

উনি হেসে বললেন -ঠিক আছে। তোমার ঘরটা দেখাই।

ঘরটা ছোটো, কিন্তু সুন্দরভাবে সাজানো। আমি গ্রেসির দিকে তাকিয়ে বললাম-ভাগ্য বোধহয় সদয়।

দি আদার সাইড থা মাঁ । সিডনি সিলডন

-ভালো । এই হল ফ্রন্ট ডোরের চাবি । তুমি কিন্তু এখানে কোনো মেয়েকে আনতে পারবে না ।

-না, আনব না ।

-এসো, তোমার সঙ্গে অন্য বোর্ডারদের আলাপ করানো যাক ।

উনি আমাকে লিভিং রুমে নিয়ে গেলেন । কয়েকজন বোর্ডার বসে আছেন । চারজন লেখকের সঙ্গে দেখা হল । তিনজন অভিনেতা, একজন পরিচালক, একজন গায়ক । সময় এগিয়ে গেল । আমি পরে জেনেছিলাম, এরা সবাই স্বপ্নভাঙা মানুষ । পকেটে পয়সা নেই, সঙ্গতি নেই, শুধু কল্পনা করতে ভালোবাসেন ।

বিলি হল থ্রেসির বারো বছরের ছেলে । সে স্বপ্ন দেখে একদিন ফায়ারম্যান হবে । এটা একটা অদ্ভুত স্বপ্ন ।

আমি মা-বাবাকে ফোন করে সবকিছু জানিয়ে দিলাম ।

বাবা বলল -তিন সপ্তাহের মধ্যে চাকরি না পেলে তুমি কিন্তু ফিরে আসবে । এটাই আমার শেষ কথা ।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা থ্রেসির বোর্ডাররা বিরাট লিভিং রুমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে । যুদ্ধের : গল্প বলছে ।

–সেলডন, এটা একটা মস্ত বড় সংগ্রাম। প্রত্যেক স্টুডিওতে একটা গেট আছে। গেটের ভেতর প্রোডিউসাররা বসে থাকেন। তারা নতুন প্রতিভার সন্ধান করছেন। তাদের দরকার নতুন পরিচালক, অভিনেতা এবং লেখক। তুমি যদি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকো, তা হলে ভেতরে ঢোকার ছাড়পত্র পাবে না। বাইরের লোকের জন্য গেট চিরদিন বন্ধ থাকে।

আমি ভাবলাম কীভাবে ভেতরে ঢুকব।

আমি জানলাম হলিউড বলে কিছু নেই। যেমনটি আমি ভেবেছিলাম। কলম্বিয়া পিকচারস, প্যারামাউন্ট এবং আর কে ও হলিউডে অবস্থিত। মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ার আর সেলজেনিক ইন্টারন্যাশনাল আছে কালভার সিটিতে। ইউনিভারসাল স্টুডিও আছে ইউনিভারসাল সিটিতে। ডিজনি স্টুডিও আছে সিলভার লেকে, টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স আছে সেঞ্চুরি সিটিতে। রিপাবলিক স্টুডিও আছে স্টুডিও সিটিতে।

থ্রেসি একটা পত্রিকা আমার হাতে তুলে দিলেন। পত্রিকাটির নাম ভ্যারাইটি। এর মধ্যে সিনেমা জগতের অনেক খবর থাকে। দেখলাম, একুশ দিন হাতে আছে। তার মধ্যে একটা চাকরি জোগাড় করতেই হবে। ঘড়ির কাঁটা টিকটিক করে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু কী ভাবে চাকরি পাব?

পরের দিন সকালবেলা, ব্রেকফাস্টের আসর। টেলিফোন বাজল। টেলিফোনে উত্তর দেওয়া অলিম্পিক লড়াইতে পদক জেতার মতো। সবাই ছুটে গেছে। কেউ জানে না, এই ফোনটা কার জন্য আসছে? কার ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে?

অভিনেতা ফোনটা ধরল। একমুহূর্ত শুনে থ্রেসির দিকে তাকিয়ে বলল আপনার ফোন।

হতাশার অন্ধকার। এই ফোন কারও জীবনরেখা হল না। আমি লস এঞ্জেলসের একটা টুরিস্ট গাইড কিনেছিলাম। থ্রেসির বোর্ডিং হাউসের সব থেকে কাছাকাছি কলম্বিয়া পিকচারস। সেখান থেকেই অভিযান শুরু করতে হবে। এই স্টুডিওটা গোইয়ার স্ট্রিটে অবস্থিত। সানসেটের কাছে। না, এর সামনে কোনো দরজা নেই।

আমি ঢুকে গেলাম। বয়স্ক চেহারার এক প্রহরী ডেস্কে বসে ছিল। সে একটা রিপোর্টের ওপর চোখ বোলাচ্ছিল। সে বলল-কী দরকার?

আমি বললাম আমার নাম সিডনি সেলডন। আমি একজন লেখক হতে চাই। কার সঙ্গে দেখা করব?

সে বলল -অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে?

আমি বললাম না।

সে বলল -তা হলে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হবে না। সে আবার রিপোর্ট পড়তে শুরু করল।

আমি দু-সপ্তাহ ধরে ঘুরে বেড়লাম। লস এঞ্জেলস শহরটা অনেকটা ছড়ানো ছোটানো। এখানে অনায়াসে ঘোরা যায়। কিন্তু কী হবে?

প্রত্যেকটা স্টুডিওর একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। প্রহরীরা একই রকম নির্মম এবং হৃদয়হীন। আমার মনে হত, তারা সকলেই বোধহয় একই মানুষ। একই পোশাক পরে ডিউটি দিচ্ছে।

আমি একজন লেখক হব একই প্রশ্ন এবং উত্তর।

-অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?

-না।

-তাহলে এখান থেকে বেরিয়ে যাও।

হলিউড একটা ক্যাবারে, আমি ক্ষুধার্ত, আমি তাকিয়ে আছি, দরজায় চাবি দেওয়া।

টাকা ক্রমশ ফুরিয়ে যাচ্ছে, সময় পিছলে যাচ্ছে।

যখন স্টুডিও পাড়ায় ঘোরাঘুরি করি না, তখন ঘরে বসে থাকি। গল্পগুলো টাইপ মেশিনে টাইপ করি।

একদিন থ্রেসি ঘোষণা করলেন আমি দুঃখিত, এবার থেকে আর ব্রেকফাস্ট দেওয়া হবে না।

কেন? এ প্রশ্ন কে করবে? সকলেরই টাকা বাকি পড়ছে। উনি বোধহয় আর আমাদের রাখতে চাইছেন না।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙল। অসম্ভব খিদে পেয়েছে। ব্রেকফাস্ট কেনার পয়সা নেই। একটা গল্প লিখতে হবে। মন দিতে পারছি না। শেষ অব্দি আমি কিচেনে গেলাম, থ্রেসি দাঁড়িয়ে আছেন, স্টোভ পরিষ্কার করছেন।

আমি কী বলব? আমি বললাম-থ্রেসি, আমি নতুন নিয়মটা শুনেছি। কিন্তু কিছু কি পাওয়া যাবে? কয়েকদিনের মধ্যেই...

উনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন -তুমি তোমার ঘরে চলে যাও।

আমার ভাগ্য ভেঙে গেছে। আমি ঘরে ফিরে এলাম। টাইপরাইটারের সামনে বসে আছি। হ্যাঁ, আমি সকলকে বিরক্ত করছি কেন? কাজে মন দেবার চেষ্টা করলাম। না, এত খিদে পেলে কি গল্প লেখা যায়?

পনেরো মিনিট বাদে দরজায় কার হাতের শব্দ। দরজা খুলে দিলাম। থ্রেসি দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে একটা ট্রে। মস্ত বড়ড়া গ্লাসে কমলালেবুর রস, কফি, শূয়োরের মাংস আর ডিম।

উনি বললেন-গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নাও।

এটাই বোধহয় আমার জীবনের সব সেরা ব্রেকফাস্ট এবং স্মরণযোগ্য।

আমি ফিরে এলাম। একদিন বিকেলবেলা। আর একটা কর্মরুান্ত দিন শেষ হয়ে গেল।

অটোর কাছ থেকে চিঠি এসেছে। বাস টিকিট এসে গেছে। হ্যাঁ, এত বিচ্ছিন্ন কাগজ আমি কখনও দেখিনি।

বাবা লিখেছে –আসছে সপ্তাহে বাড়ি চলে এসো কেমন। ভালোবাসা।

চারদিন বাকি আছে। কোথায় যাব? ঈশ্বর হয়তো হাসছেন।

সেই সন্ধ্যাবেলা আমি লিভিং রুমে বসেছিলাম। থ্রেসি এক বোর্ডারের সঙ্গে কথা বলছেন।

একজন বলল আমার বোন এম জি এম, এ চাকরি পেয়েছে। গল্প পাঠিকা হিসেবে।

তার মানে? আমি অবাক।

সে বুঝিয়ে দিল গল্পের সারাংশটা প্রযোজকদের শোনাতে হয়। তারা তো এত বেশি সময় পায় না। কোনো কোনো সময় আবার সারাংশটা তৈরি করতে হয়। আমার মন ছুটে চলেছে। ইতিমধ্যে আমি স্টেনবকের অসাধারণ উপন্যাস অফ মাইস অ্যান্ড মেন পড়ে ফেলেছি।

তিরিশ মিনিট কেটে গেছে। আমি ওই বইটার সারাংশ তৈরি করে ফেললাম।

পরের দিন দুপুরবেলা। ছটা স্টুডিওতে ওটা পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি জানি, দু-একদিনের মধ্যে খবরটা পেয়ে যাব।

তিন নম্বর দিনটা এসে গেল। কোনো চিঠি আসেনি। শুধু ভাই একটা চিঠি পাঠিয়েছে।

চতুর্থ দিনে মায়ের চিঠি এল।

পরের দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। রবিবারের টিকিট কাটা আছে। আর একটা স্বপ্ন মরে গেল। আমি গ্লোসিকে বললাম আমি রোববার সকালে চলে যাব।

তিনি বললেন কিছু কি করব আমি?

আমি ওনাকে জড়িয়ে ধরে বললাম আমি আপনার ঋণ কোনোদিন শেষ করতে পারব না। কিন্তু আমার স্বপ্ন ভেঙে গেছে।

উনি বলেছিলেন স্বপ্ন দেখার অবসান করো না কিন্তু।

পরের দিন সকালবেলা, টেলিফোনটা বাজল। এক উঠতি অভিনেতা ঝাঁপিয়ে পড়ল। রিসিভারটা নিয়ে সে বলল -গুডমর্নিং। কে?

তার কণ্ঠস্বরে হঠাৎ পরিবর্তন-ডেভিড স্বেলজনিকের অফিস?

ঘরে বিরাজ করছে থমথমে নীরবতা। ডেভিড হলেন হলিউডের অন্যতম সেরা অভিনেতা। তিনি অসাধারণ কতগুলো ছবির জন্ম দিয়েছেন। যেমন - আ স্টার ইন বর্ন, ডিনার অ্যাট নাইট, আ টেল অফ টু সিটিজ, ডেভিড কপারফিল্ড। ওই অভিনেতা বলল

-হ্যাঁ, সে এখানে আছে।

কে সে?

অভিনেতা আমার দিকে তাকিয়ে বলল –এই ফোনটা তোমার সেলডন।

আমার হাত-পা কি ভেঙে গেল? আমি ছুটে গেলাম।

এক মহিলার কণ্ঠস্বর –আপনি কি সিডনি সেলডন?

–হ্যাঁ।

–আমি অ্যানা বলছি। ডেভিডের সেক্রেটারি। ডেভিড একটা সংক্ষিপ্ত উপন্যাসের সংক্ষিপ্তসার চাইছেন। কিন্তু আমাদের কোনো রিডারকে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি হাজির আছি, আমি তো আছি বলতে চেয়েছিলাম।

–মিঃ সেলজনিক, আজ সন্ধ্যা ছটার মধ্যে ওই সারাংশটা চাইছেন। এটা চারশো পাতার একটা উপন্যাস। আমাদের সংক্ষিপ্তসারগুলো তিরিশ পাতার বেশি হয় না। এর সঙ্গে দুপাতার একটা অবতরণিকা থাকবে। একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে মন্তব্য লিখতে হবে। আজ ছটার মধ্যে পাঠাতে হবে কিন্তু। আপনি কি পারবেন?

এটাই সেলজনিক স্টুডিওতে ঢোকার একমাত্র চাবিকাঠি। চারশো পাতার উপন্যাসটা পড়তে হবে। কোনো জায়গা থেকে একটা ভালো টাইপমেশিন সংগ্রহ করতে হবে। তিরিশ পাতার সারাংশ লিখতে হবে। সবকিছু সন্ধ্যা ছটার মধ্যে।

আমি বললাম হ্যাঁ, আমি পারব।

-এখনই কালভার সিটিতে চলে আসুন। বই নিয়ে যান।

-আমি এখনই যাচ্ছি।

ঘড়ির দিকে তাকালাম নটা বেজে তিরিশ মিনিট। কালভার সিটিতে পৌঁছোতে দেড় ঘণ্টা সময় লাগবে। তার মানে? টাইপিস্টকে খুঁজতে হবে। তিরিশ পাতার সিনপসিস তৈরি করতে হবে। এটাই আমার জীবনের শেষ সুযোগ।

এগারোটার সময় কালভার সিটিতে পৌঁছে গেলাম। সাত ঘণ্টার মধ্যে একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে হবে।

আমার অন্য একটা পরিকল্পনা ছিল।

.

০৮.

কালভার সিটি পৌঁছোতে একটা স্ট্রিটকার এবং দুটো বাসের সাহায্য নিতে হয়েছিল। দ্বিতীয় বাসের প্যাসেঞ্জারদের দিকে আমি তাকালাম। তাদের বলতে চেয়েছিলাম, ডেভিড সেলজনিকের সঙ্গে দেখা করতে চলেছি। বাসটা আমাকে সেলজনিক ইন্টারন্যাশনাল স্টুডিওর কাছে নামিয়ে দিল।

স্টুডিওটা বিরাট, জর্জিয়ান স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন। ওয়াশিংটন স্ট্রিটের দিকে মুখ করা।
এই স্টুডিওটার অনেক ছবি আমি সিনেমাতে দেখেছি।

আমি ভেতরে ছুটে গেলাম। এক ভদ্রমহিলা ডেস্কের আড়ালে বসেছিলেন।

আমি বললাম মিঃ সেলজনিকের সেক্রেটারির সাথে অ্যাপয়ন্টমেন্ট আছে।

-আপনার নাম?

-সিডনি সেলডন।

উনি নীচু হয়ে ডেস্ক থেকে একটা প্যাকেট বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন -এটা
আপনার জন্য।

-আমি কি একবার সেলজনিকের সঙ্গে দেখা করতে পারব না?

-না, উনি খুবই ব্যস্ত মানুষ।

প্যাকেটটা ধরে আমি বাড়ির বাইরে চলে এলাম। এম জি এম স্টুডিওর দিকে তাকালাম।
ছটা ব্লক দূরে অবস্থিত। পরিকল্পনাটা দ্রুত এগিয়ে চলেছে। হ্যাঁ, সিমুর একবার তার
প্রাক্তন স্ত্রী সিডনি সিনগারের কথা বলেছিল।

-সিমুর, তুই কি কখনও তাকে দেখেছিস?

দি আদার সাইড থু মাঁ । সিডনি সেলডন

হ্যাঁ, সে হলিউডে গেছে, এম জি এম এ চাকরি করছে। এক মহিলা পরিচালিকা ডরোথি আরজনারের কাছে।

আমি সিডনি সিনগারকে জিজ্ঞাসা করব সে কি আমাকে সাহায্য করবে?

এম জি এম স্টুডিওতে পৌঁছে গেলাম। লবির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ড বলল- কী দরকার?

পরিচয় দিয়ে বলেছিলাম আমি সিডনি সিনগারের সঙ্গে দেখা করব।

-সিডনি? ডরোথির সেক্রেটারি?

-হ্যাঁ।

উনি কি জানেন?

-হ্যাঁ। আমি মিথ্যে বললাম।

সে ফোনটা তুলে এক্সটেনশনে ডায়াল করে বলল -সিডনি সেলডন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আমার নামটা আরও একবার বলল।

কিছুক্ষণ পরে বলল- কিন্তু উনি যে বলছেন...?

তখন আমি ভগবানকে প্রার্থনা করছি একটা হা-বাচক শব্দ শোনার জন্য।

প্রহরী রিসিভারটা নামিয়ে রেখে বলল -২৩০ নম্বর ঘরে চলে যান।

হুৎপিণ্ড লাফাচ্ছে।-ধন্যবাদ।

-এলিভেটরে যান।

করিডরে পৌঁছে গেলাম, তিনতলায়। সিডনির অফিসটা একেবারে কোণে। আমি ঢুকে গেলাম-হ্যালো সিডনি।

-হ্যালো। কণ্ঠস্বরে এতটুকু উষ্ণতা নেই।

আমি জানি সিমুরের সাথে তার সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। সে তাই হয়তো আমাকে সহ্য করতে পারছে না। আমি কেন এখানে এলাম? সে কি আমাকে বসতে বলবে না?

-তুমি এখানে কী করছ?

-এটা একটা লম্বা গল্প।

-আমি এখন লাঞ্চ খেতে যাব। হাতের কবজিতে বাধা ঘড়ি দেখে সে বলল।

-না, এখন যাবে না।

-সে কী?

-সিডনি, আমার একটা সমস্যা হয়েছে। আমি সংক্ষেপে পুরো গল্পটা বলে দিলাম। নিউইয়র্ক, লেখক হবার স্বপ্ন, স্টুডিও গेट পার হতে না পারার যন্ত্রণা। সকালে ডেভিড সেলজনিকের সেক্রেটারির ফোন।

সে সব কিছু শুনল। আমার গল্পটা শেষ হয়ে গেছে। তার ঠোঁট শক্ত। সে বলল তুমি সেলজনিকের কাজ নিয়ে এখানে এসেছ। আর আমি তোমার জন্য টাইপ করব?

-আমি তা বলছি না। আমি বলছি, আমি আশা করেছিলাম। তোমাকে কষ্ট দিলাম বলে দুঃখিত। হ্যাঁ, তোমার ওপর আমার কোনো অধিকার নেই।

-না, তুমি তো তা জানো। এখন তুমি কী করবে?

-আমি এই বইটা সেলজনিককে দিয়ে আসব। কাল সকালে চিকাগো চলে যাব। ধন্যবাদ। সিডনি, তুমি যে আমার জীবনকাহিনী শুনেছ, সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ। গুডবাই।

আমি উঠে দাঁড়িয়েছি। দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেছি।

-শোনো।

আমি তাকালাম।

দি আদার সাইড থু মাঁ । সিডনি সেনডন

-এই ব্যাপারটা তোমার জীবন পালটে দেবে, তাই তো?

আমি মাথা নাড়লাম, উত্তেজনায় কথা বলতে পারছি না।

-প্যাকেটটা ভালো। দেখি ভেতরে কী আছে?

আমি বললাম -সিডনি?

সে বলল -চুপ করো। আগে বইটা দেখতে দাও।

-তার মানে তুমি...।

-কেন পাগলামি করছ, আমি চেষ্টা করব। তোমার প্রতিজ্ঞা আমার ভালো লাগছে। তার মুখে এই প্রথম হাসি, আমি তোমায় সাহায্য করব।

আমার সমস্ত শরীরে আনন্দের অগ্নিশিখা। আমি নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না।

-এটা খুব বড়ো বই, তুমি কি ছটার মধ্যে সারাংশ তৈরি করতে পারবে?

সে বইটা আমার হাতে তুলে দিল। আমি ভালোভাবে তাকালাম। হ্যাঁ, এক ধরনের রোমান্টিক গল্প, যেটা দর্শকরা ভালোভাবে উপভোগ করবে।

সিডনি জিজ্ঞাসা করেছিল -তুমি কীভাবে কাজটা করবে?

-আমি ছোটো ছোটো বাক্যে পরিণত করব। তারপর তোমাকে বলব, তুমি টাইপ করবে।

সে মাথা নেড়ে বলল দেখা যাক, তোমার এই পরিকল্পনাটা কাজ করে কিনা।

আমি তার উল্টোদিকে একটা চেয়ার নিয়ে বসে পড়লাম। পাতাগুলো ওল্টাতে শুরু করলাম। পনেরো মিনিটের মধ্যে পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা হল। আমি টুকরো টুকরো অংশ মুখে বলতে শুরু করলাম। সে টাইপ করা শুরু করল।

আমি জানি না, কেন সিডনি সেদিন আমাকে সাহায্য করেছিল। হয়তো আমার অসহায় অবস্থা দেখে। আমি কখনও এই রহস্যটা জানতে পারব না। আমি জানি, সেদিন সমস্ত দুপুরবেলা সে ডেস্কে বসেছিল। আমার দিকে তাকিয়ে ছিল অবাক চোখে।

ঘড়ির কাঁটা দ্রুত এগিয়ে চলেছে, সামনের দিকে। বেলা চারটে। অর্ধেকটা শেষ হয়েছে।

সিডনি বলল-চারটে বেজে গেছে। আমি আরও তাড়াতাড়ি বলার চেষ্টা করলাম।

তিরিশ পাতার সারাংশ শেষ হল। দুপাতার অবতরণিকা। এক পাতায় পর্যালোচনা। ছটা বাজতে দশ মিনিট বাকি আছে।

সিডনি আমার হাতে শেষ পাতাটা তুলে দিল।

আমি বললাম কীভাবে কৃতজ্ঞতা জানাব বুঝতে পারছি না।

ও হাসল-একটা লাঞ্চ হলে ভালো হয়।

আমি ওর ঠোঁটে একটা আলতো চুমু দিলাম। পাতাগুলো নিয়ে ছুটতে শুরু করেছি।

ইন্টারন্যাশনাল স্টুডিওতে পৌঁছে গেলাম। এক মিনিট বাকি আছে।

একই ভদ্রমহিলা ডেস্কের পেছনে বসে আছে। পরিচয় দিলাম। শোনা গেল সেক্রেটারি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি করিডর দিয়ে ছুটছি। এটা একটা সূত্রপাত। এর থেকে এক মস্ত বড় বিস্ফোরণ হয়ে যাবে।

আমি সেক্রেটারির অফিসে পৌঁছে গেলাম। ভেতরে ঢুকলাম।

উনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন আমি চিন্তায় ছিলাম।

-কোনো সমস্যা হয়নি। আমি প্যাকেটটা তার হাতে তুলে দিলাম। উনি তাকিয়ে আছেন।

-দারুণ হয়েছে, এই এনভেলপের মধ্যে আপনার পারিশ্রমিক দশ ডলার আছে।

-ধন্যবাদ। পরের সারাংশটা কখন করতে হবে?

উনি বললেন আমি দুঃখিত। আমাদের সম্পাদক কালকেই চলে আসবেন। মিঃ সেলজেনিক সাধারণত বাইরের কাউকে এই দায়িত্বটা দেন না। আসলে আপনি হয়তো ভুল করে ওনাকে লেখাটা পাঠিয়ে ছিলেন।

তার মানে? আমি কখনও ডেভিড সেনজনিকের দলভুক্ত হতে পারব না? না, এই স্বপ্নটাও হয়তো শেষ হয়ে যাবে। আমার মনে হতাশা, কিন্তু আমাকে তো আনন্দ পেতেই হবে।

থ্রেসির কাছে পৌঁছে গেলাম। তার ছেলেরা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

-ডেভিডকে কেমন দেখতে? সে কী বলে?

-তোমরা কি একসঙ্গে কাজ করবে?

এতগুলো প্রশ্ন, আমি কোনটার জবাব দেব? আর কত মিথ্যে বলব?

আমি বললাম এই সন্কেটা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না।

ঘরে চলে গেলাম। দরজাটা বন্ধ করলাম। টেবিলের ওপর বাসের টিকিট, আমার হতাশার প্রতীক। আমাকে আবার চেকরুমে ফিরতে হবে। ড্রাগ স্টোর এবং পার্কিং জোন। সেই এক ঘেয়ে জীবন। নাঃ এর থেকে আমার মুক্তি নেই।

নাতালি ফোন করেছে- হ্যালো, কবে তুই আসবি? ঠিক আছিস তো?

-আমি ভালো আছি, মা। তোমাকে একটা ভালো খবর দিচ্ছি মা, এইমাত্র ডেভিড সেনজনিকের জন্য একটা কাজ করলাম। উপন্যাসের সংক্ষিপ্তসার।

-দারুণ খবর। মানুষটা কেমন রে?

এই প্রশ্নের কী জবাব দেব? আমি চিৎকার করে বলেছিলাম- মা, দরজাগুলো আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে। আর কয়েকদিন সময় লাগবে।

মা একটু চিন্তা করে বলল ঠিক আছে ডার্লিং, কবে আসবি জানাস। আমি কখনওই বাড়ি আসব না।

পরের দিন সকাল, বাস স্টেশনে গেলাম। টিকিটটা বেচে পয়সা নিলাম। সারাদিন চিঠি লিখলাম, সমস্ত বড়ো বড়ো স্টুডিওর ঠিকানাতে। দেখা যাক, ভাগ্যের চাকাটা খোলে কিনা।

চিঠিটা ছিল এইরকম এই মাত্র আমি ডেভিড সেলজনিকের হয়ে একটা বইয়ের কাজ শেষ করেছি। এখন যে কোনো কাজ করতে প্রস্তুত।

দুদিন বাদে টেলিফোনের আর্তনাদ। টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স আমায় প্রথম ডেকেছে, তারপর প্যারামাউন্ট, প্রত্যেক সারাংশের জন্য ৫-১০ ডলার করে পাচ্ছি।

প্রত্যেকটা স্টুডিওতে নিজস্ব সম্পাদক আছে। যখন বেশি কাজের চাপ পড়ে, তখনই বাইরের লোককে ওরা ডেকে পাঠায়। আমি একদিনে একটা উপন্যাস শেষ করতে পারি। স্টুডিওতে গিয়ে উপন্যাসের কপিটা নিয়ে আসি। থ্রেসির বোর্ডিং হাউসে চলে আসি। বইটা পড়ে ফেলি। সারাংশটা টাইপ করি। আবার স্টুডিওতে চলে যাই। সপ্তাহে দু-তিনটে করে কাজ পাচ্ছি। কিন্তু সিডনির সাহায্য হয়তো আর দরকার হবে না।

দি আদার সাইড থু মাঁ । সিডনি জেলডন

টেলিফোন করলাম একজন লোককে। তার সাথে তখনও দেখা হয়নি। তিনি হলেন গর্ডান মিশেল। তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে বসে আছেন। মোশন পিকচারস আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স অ্যাকাডেমির টেকনিক্যাল ব্রাঞ্চার প্রধান।

আমি ভেরা ফাইনের নাম বললাম। আমি একটা চাকরি চাইছি। একথাও জানালাম।

উনি বললেন দেখা যাক, তোমার জন্য কী করতে পারি।

শেষ অর্দি আমি ওই অ্যাকাডেমিতে কাজ করার সুযোগ পাব?

পরের দিন সকালবেলা আমি ওনার সঙ্গে অফিসে দেখা করলাম।

উনি বললেন তুমি বিকেলবেলা এখানে এসো। প্রোজেকশন রুমে গিয়ে আমাদের ছবিগুলো দেখো।

আমি বললাম-কাজটা কী?

-আমাদের ছবিগুলো দেখতে হবে।

আমি অবাক হয়ে গেছি।

উনি ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করলেন। আমাদের এই অ্যাকাডেমি বিভিন্ন মানুষের চোখে ছবি কেমন তা বোঝার চেষ্টা করে। তোমার কাজ হল, একটা ছবি কতবার

দেখানো হচ্ছে, সেটা লিখে রাখা। এর জন্য তোমাকে আমরা প্রতিদিন তিনডলার করে দেব।

নতুন একটা জীবন শুরু হল। প্রথমে যে ছবিটা দেখেছিলাম, সেটা হল দি ম্যান ই লিভস টোয়াইস। আমি প্রত্যেকটা শব্দ মনে রাখার চেষ্টা করলাম। একই ছবি বারবার দেখতে হচ্ছে। সারাদিন অপেক্ষা করছি টেলিফোনের শব্দ শুনব বলে।

১৯৩৮ সালের ১২ ডিসেম্বর। একটা ফোন এল। কোন স্টুডিও থেকে ইউনিভার্সাল।

-আপনি কি কাল সকালে আসতে পারবেন?

আবার তিন ডলার।

-হ্যাঁ।

মিঃ টাউনসেন্ডের অফিসে চলে যাবেন।

ইউনিভার্সালের সম্পাদক হলেন টাউনসেন্ড। আমি স্টুডিওতে পৌঁছে গেলাম।

-আপনার সারাংশটা খুবই সুন্দর হয়েছে। আমি সব কটা পড়েছি। একজন স্টাফ রিডারের দরকার। আপনি কি যোগ দেবেন?

আমি অবাক। উনি বলছেন- সতেরো ডলার করে দেওয়া হবে প্রতি সপ্তাহে। সপ্তাহে ছ দিন। সকাল নটা থেকে সন্ধ্যা ছটা। সোমবার থেকে কাজটা শুরু হতে পারে।

সিডনিকে ফোন করে খবরটা দিতে হবে। সিডনি সাহায্য না করলে আজ আমি কোথায় তলিয়ে যেতাম।

একটা অপরিচিত কণ্ঠস্বর।

আমি সিডনি সিনগারের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি চাইলাম।

ভদ্রমহিলা কে, জানতে চাইলাম। উনি ডরোথি।

আমি বললাম, ম্যাডাম, মিস সিনগারের সঙ্গে দেখা হবে?

ভদ্রমহিলা বলেছিলেন সিনগার চাকরি ছেড়ে চলে গেছেন। কোনো ঠিকানা লিখে রেখে যাননি।

ঘটনাটা আকস্মিক। এবং অপ্রত্যাশিত। হয় সিডনি, তোমাকে আমি আর কখনও খুঁজে পাইনি, কিন্তু তোমার ঋণ আমি কখনও পরিশোধ করতে পারব না।

ইউনিভারসাল একটা সুন্দর স্টুডিও। ১৯১২ সালে তৈরি হয়েছিল।

আমার কাজ শুরু হল, সোমবার সকালবেলা। মনের ভেতর নানা আশার গুঞ্জন। একটার পর একটা সেটের পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছি। কী অদ্ভুত এই জগৎ। কখনও পশ্চিম দেশের শহর, ভিক্টোরিয়ান হাউস, সানফ্রানসিসকো স্ট্রিট এবং নিউইয়র্কের রাস্তা।

টাউনসেন্ড আমার কাজটা বুঝিয়ে দিলেন। আমাকে একটার পর একটা চিত্রনাট্য পড়তে হবে। সেগুলো নীরব ছবির জন্য তৈরি করা হয়েছে। কীভাবে এগুলোকে টকি অর্থাৎ সবাক চলচিত্রে পালটানো যায়, তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে হবে। বেশির ভাগ চিত্রনাট্য একেবারে বাজে।

এভাবেই দিন কেটে গেছে। কাজটা ক্রমশ ভালো লাগছে। একমাস কেটে গেল। আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল।

মা-বাবাকে সব কথা জানাইনি। তারা চাইবে, আমি যেন চিকাগোতে ফিরে আসি। আমি জানতাম, আমার ভবিষ্যৎ এই শহরের সঙ্গে গাঁথা। আমাকে আর একটা চাকরি খুঁজতে হবে। কিছুদিনের জন্য। তারপর আবার স্টুডিওর হাতছানিতে সাড়া দেব।

খুঁজতে খুঁজতে একটা চাকরির সন্ধান পেলাম। হোটেলে সুইচবোর্ড অপারেটরের দরকার। কোনো অভিজ্ঞতা লাগবে না। সপ্তাহে কুড়ি ডলার পাওয়া যাবে। ব্রান্ট হোটেলের নাম লেখা আছে।

হলিউড বুলেভার্ডে ব্রান্ট হোটেল অবস্থিত। লবিটা একেবারে ফাঁকা, হোটেল ম্যানেজার ছাড়া।

আমাকে কাজটা বুঝিয়ে দেওয়া হল। দুটো প্লাগ আছে। একটাকে বলে সিস্টার প্লাগ, আলো জ্বালাতে হলে এই প্লাগটা গর্তে ঢুকিয়ে দিতে হবে। কোন ঘরে আলো জ্বালাতে হবে, তার নাম্বার পাশে দেওয়া আছে।

ম্যানেজার ঠিক কথা বলেছিলেন, সুইচবোর্ড চালানোর ব্যাপারটা একটা শক্ত কাজ নয়। এটা স্বয়ংক্রিয় ভাবেই জ্বলে। যখন একটা আলো জ্বলে ওঠে, আমি প্রথম সারিতে প্লাগ লাগিয়ে দিয়ে বলি- মিঃ ক্লেম্যান, আপনার জন্যই এই আলোটা জ্বালা হয়েছে।

আমি গেস্টদের খাতার দিকে তাকিয়ে থাকি। মিঃ ক্লেম্যান হয়তো ২৩১ নম্বর ঘরের বাসিন্দা। সিসটার প্লাগটা ২৩১ নম্বর গর্তে ঢুকিয়ে দিই। বোতামটা টিপে দিই। শব্দ হতে থাকে। খুবই সহজ ব্যাপার। আমি ভাবলাম, আস্তে আস্তে আমাকে নাইট ম্যানেজার হতে হবে।

তারপর জেনারেল ম্যানেজার হব। এইভাবে আমাকে বসে থাকলে চলবে না।

দুটো রাত কেটে গেছে। রাত তিনটে। একজন গেস্ট সুইচবোর্ডে শব্দ করেছেন নিউইয়র্কের একটা নাম্বার –এখুনি ধরতে হবে।

উনি আমার হাতে একটা নাম্বার দিলেন। আমি রুম প্লাগটা ঢুকিয়ে নিউইয়র্কের নাম্বারে ফোন করলাম।

অনেকক্ষণ বাদে এক মহিলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

–হ্যালো?

–একটা ফোন কল আছে। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করবেন।

আমি সুইচ বোর্ডের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কিন্তু কীভাবে এই কলটা পাঠিয়ে দেব? না, এখানে কোনো নির্দেশ দেওয়া নেই।

আমি অনেককে জাগিয়ে তুললাম। তারা বিরক্ত হল। ব্যাপারটা কেমন গোলমালে হয়ে গেল। সকালবেলা হোটেলের ম্যানেজার এলেন। আমি আমতা আমতা করে সব ঘটনা বলার চেষ্টা করলাম।

ওনার মুখ রাগে থমথম করছে। ইতিমধ্যে খবরটা ওনার কানে পৌঁছে গেছে। আমাকে চাকরিটা হারাতে হল। না, আমি হোটেলচেনের ম্যানেজার হব না।

এবার ড্রাইভিং ইনস্ট্রাকটর। চাকরিটা আমি নিলাম। ছাত্ররা এলোমেলো। লাল আলোর ইশারাতে থমকে থামতে জানে না। ব্রেক এবং অ্যাকসিলেটরের মধ্যে কী পার্থক্য তা বুঝতে পারে না। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। অন্ধ অথবা আত্মহত্যা করতে চাইছে। কাজটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না।

এর পাশাপাশি স্টুডিও পাড়াতে ঘোরাঘুরি চলছে। টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সের জন্য সারাংশ লিখেছি। জেমস ফিসার হলেন সেখানকার সম্পাদক, এক সুভদ্র চেহারার নিউইয়র্ক বাসিন্দা।

এক সন্কেবেলা উনি আমাকে বললেন তুমি কাল ফাঁকা আছো?

-হ্যাঁ, মনে মনে আমি ভাবলাম, আরও তিন ডলার।

–দশটায় দেখা হবে?

নিশ্চয়ই। দশ ডলার, আমি ভাবছি। আবার টাকা কম পড়তে শুরু করেছে।

অফিসে পৌঁছে গেলাম। তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বললেন, তুমি এখানে স্টাফ হিসেবে যোগ দেবে?

–হ্যাঁ, কাজটা আমার ভালো লাগবে।

–তোমাকে ভাড়া করা হল। সপ্তাহে ২৩ ডলার করে দেওয়া হবে।

আমি আবার শো-বিজনেসে ফিরে এলাম।

.

০৯.

টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সের কাজটা একেবারে অন্যরকম। ইউনিভারসাল স্টুডিওর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে সব কিছুই ঘড়ির কাঁটা দিয়ে আবর্তিত হয়। কারণ এখানকার প্রযোজনার মাথায় বসে আছেন ড্যারিয়েল জানুক। ধুরন্ধর মানুষ। তিনি জানেন, কীভাবে মানুষের মন জয় করতে হয়।

লেখকদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান আছ তার। একবার তিনি বলেছিলেন যে কোনো চলচ্চিত্রের সফলতা নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের ওপর। গল্প, গল্প এবং গল্প। গল্প ছাড়া আর কোনো কিছু নেই।

ফক্সে বারোজন স্টাফ রিডার চাকরি করছেন। পঁয়ত্রিশ থেকে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত। তাদের বেশির ভাগই কোনো আধিকারিকের নিকট আত্মীয়।

জুলিয়ান জনসন, ফক্স স্টুডিওর এক এগজিকিউটিভ। আমাকে তার অফিসে ডাকলেন। তাকে আমি এক উদ্দীপ্ত মানুষ বলতে পারি। লম্বা চেহারা। একবার বিয়ে করেছিলেন নাইট ক্লাবের মহারানিকে। বিয়েটা ভেঙে গেছে।

উনি বললেন সিডনি, তুমি এখন শুধু মিঃ জানুকের হয়ে কাজ করবে। যখনই তিনি নতুন একটা ছবি শ্যুটিং করতে চাইবেন, অথবা নাটকে রূপায়িত করতে চাইবেন, তখনই তোমার ডাক পড়বে।

ব্যাপারটা ভাবতেই আমার ভালো লাগছে।

মনে আনন্দ আর ধরে না। আমি নতুন নতুন উপন্যাস পড়ার সুযোগ পেলাম। শুধু তাই নয়, নতুন নাটকের হালচাল কী, তাও বুঝতে পারলাম।

জানুক নতুন বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। আমাকে অনেক সময় মাঝরাত অর্ধি কাজ করতে হত। কাজটা আমার ভালো লাগত। কিন্তু লেখক হবে? স্টুডিও জুনিয়ার রাইটার ডিভিশন নামে একটি বিভাগ খুলল।

আমি জুলিয়ান জনসনকে বলেছিলাম, ওখানে যোগ দিলে ভালো হয়।

উনি বলেছিলেন- না, তুমি জানুকের হয়ে কাজ করছ, এটা আরও গুরুত্বপূর্ণ।

আমার অফিসটা ছিল একটা কাঠের বাড়ির মধ্যে। রাতে একেবারে ফাঁকা থাকত। একাকীত্বের যন্ত্রণায় ভুগতাম। অন্ধকারকে ভয় পেতাম। একরাতে জানুকের অনুরোধে একটা কাজ করছি, গল্পটা ভূতের।

টাইপ করছি। এইভাবে-

সে আলমারির দরজাটা খুলে ফেলল, কী আশ্চর্য, মৃতদেহটা তার ঘাড়ের ওপর পড়ে গেছে।

ঠিক তখনই আমার অফিসের ক্যাবিনেটটা খুলে গেল। বইগুলো ছড়মুড় করে কাঁধের ওপর পড়ে গেল। সমস্ত ঘরে বুঝি কাঁপুনি শুরু হয়েছে। আমি দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

হ্যাঁ, এটা এক ভয়ংকর ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা।

সেপ্টেম্বরে এক অচেনা মানুষ আমার অফিসে এসে বলল আমার নাম অ্যালান জ্যাকসন। আমি কলোসিয়াতে থাকি। আমি একজন রিডার।

আমি বলেছিলাম- আপনাকে দেখে ভালোই লাগছে। বলুন কী করতে পারি।

ভদ্রলোক বললেন আমরা একটা গিল্ড তৈরি করতে চলেছি। আপনি যোগ দিলে ভালো লাগবে।

তার মানে একটা সংগঠন তৈরি হচ্ছে। কিন্তু কেন? আমার তো তেমন কোনো ভূমিকা নেই। আমি জানি, বেশির ভাগ রিডারেরই এ ব্যাপারে অসহিষ্ণুতা আছে।

আমি বলেছিলাম ঠিক আছে, সাহায্য করব।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সবাই এই গিল্ডে যোগ দিতে উৎসুক। আমি অ্যালান জ্যাকসনকে খবরটা দিয়েছিলাম। উনি হেসে বলেছিলেন-বাঃ, ভাল। অন্য স্টুডিওতেও যোগাযোগ করতে হবে।

মেট্রো গোল্ডউইন মেয়র স্টুডিওতে একটা আলোচনা সভা ডাকা হল। বিভিন্ন স্টুডিও থেকে ছ-জন রিডারকে নিয়ে একটা কমিটি তৈরি হল।

এডি ম্যানিক্সস, মেট্রো গোল্ডউইন মেয়রের এক বিশিষ্ট পথিকৃৎ।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের সমস্যা কী?

একজন বললেন- মিঃ ম্যানিক্স, আমাদের জীবন যাত্রার মান অনেক কমে গেছে। প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু সেই তুলনায় পারিশ্রমিক পাওয়া যায় না।

এডি ম্যানিক্স বললেন আমি এসব গল্প শুনতে চাই না। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অধিবেশনটা শেষ হয়ে গেল।

দেখা দিল দারুণ বিশৃঙ্খলা। দু ঘণ্টা কেটে গেছে, রিডারস গিল্ডের অবস্থা কী হবে? শেষ অব্দি ঠিক হল, প্রতি সপ্তাহে স্টাফ রিডারদের ২১.৫০ ডলার করে দেওয়া হবে। যারা বাইরে থেকে কাজ করতে আসবে, তাদের আরও ২০ শতাংশ দেওয়া হবে। আমাকে ওই গিল্ডের সহসভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছিল।

আমি বাবা-মাকে সব খবর দিতাম। খবর শুনে তারা আনন্দে অধীর। আমার বাবা। সকলের কাছে গল্পটা বলতে শুরু করল।

একজন নতুন বোর্ডার এসেছে থ্রেসির বোর্ডিং হাউসে। লাজুক চোখের এক ছেলে। নাম বেন রবার্টস। আমারই মতো বয়স। গায়ের রঙ কালো, পাতলা ফিনফিনে চুল এবং মুখে হাসি। সবসময় কৌতুক করতে ভালোবাসে। আমরা অচিরেই বন্ধু হলাম।

বেনও একজন লেখক। কিন্তু সে ছোটো ছোটো লেখাতেই মন দিতে চায়। প্রতি সন্ধ্যায় আমি এবং বেন ড্রাগ স্টোরে চলে যেতাম। ডিনারের সময় স্যান্ডউইচ খেতাম। অথবা কোন সস্তার চাইনিজ রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসতাম। বেন খুবই শক্তিশালী। যথেষ্ট মগজ আছে তার। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমরা একটা গল্প লিখে ফেললাম। সমস্ত স্টুডিওতে পাঠালাম। কোনো সুযোগ আসবে কি?

বৃথা প্রতীক্ষা, সুযোগ এল না।

বেন এবং আমি আর একটা গল্প লিখলাম। একই ভাবে পাঠালাম। এবারও কোনো সুযোগ এল না।

তিন নম্বর গল্পটাও লেখা হল। হতাশার আচ্ছাদন।

একদিন আমি বললাম একটা রহস্য গল্প লিখলে কেমন হয়? নাম দেব ভয়ংকর ছুটির দিন।

আমি বেনকে গল্পটা বললাম। তার ভালো লাগল। গল্পটা লিখে সব স্টুডিওতে পাঠালাম। কোনো শুভ সংবাদ এল না।

এক সপ্তাহ কেটে গেছে। আমি বোর্ডিং হাউসে ফিরে এসেছি। বেনের সঙ্গে দেখা হল। উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে।

—আমি গল্পটা একজন প্রোডিউসারকে দিয়েছিলাম। টেড রিচমন্ড, পি আর সি-তে আছেন।

এটা একটা ছোট্ট স্টুডিও। প্রোডিউসার রিলিজিং করপোরেশন।

উনি ডেনজারাস হলিডে গল্পটাকে ভালো বলেছেন। ৫০০ ডলার দেবেন। আমাদের চিত্রনাট্য লিখতে হবে।

আমার মনে আনন্দ— হ্যাঁ, কাজটা করতেই হবে। হলিউডের সমস্যা হয়তো সমাধান হবে। নতুন কেউ এখানে জায়গা পায় না। নিউইয়র্কের কথা মনে পড়ল।

তার মানে? আবার নতুন করে সব কিছু শুরু করতে হবে।

ডেনজারাস হলিডে লেখা শুরু হল।

কয়েক মাস আগে আমার সাথে রায় ক্রোসেটের দেখা হয়েছিল। সে লেল্যান্ড হেওয়ার্ড এজেন্সির একটা বিভাগে কাজ করে। এই এজেন্সিকে আমরা সব থেকে বড়ো ট্যালেন্ট এজেন্সি বলতে পারি। ভদ্রলোক আমাকে যথেষ্ট ভালোবাসতেন। বলেছিলেন সাহায্যের দরকার থাকলে যোগাযোগ করতে।

আমি রায়কে ফোন করলাম। টেড রিচমণ্ড সম্বন্ধে খবরটা দিলাম।

— আমি বললাম-বেন এবং আমি আমাদের প্রথম গল্পটা বিক্রি করেছি। ডেনজারাস হলিডে।

কাকে?

-পি আর সি।

-কে পি আর সি?

আমি অবাক হয়ে গেলাম। এত বড়ো একজন মানুষ, অথচ পি আর সি-র নাম শোনেন নি?

আমি বললাম একটা স্টুডিও, প্রোডিউসার রিলিজিং করপোরেশন। টেড রিচমণ্ড নামে একজন প্রোডিউসার আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি ৫০০ ডলার দেবেন বলেছেন। চিত্রনাট্য লিখতে হবে।

ব্যাপারটা কি শেষ হয়ে গেছে?

-না, আমরা একটু সময় নিয়েছি।

-পরে ফোন করছি, রায় বললেন, ফোনটা নামিয়ে রাখলেন।

দু ঘন্টা কেটে গেছে। আবার ফোনের আত্ননাদ তোমাদের গল্পটা প্যারামাউন্টে বিক্রি করে দিলাম। ওরা তোমাকে একহাজার ডলার দেবে। তোমাদের চিত্রনাট্য লিখতে হবে না।

আমি অবাক হয়েছিলাম। এমন ঘটনা কেন ঘটল? প্রত্যেকটা স্টুডিওতে গল্পের সংক্ষিপ্তসার থাকে। রায় প্যারামাউন্টে ফোন করেছিলেন। বলেছিলেন, ডেনজারাস হলিডে আর একটা স্টুডিও কিনে নিচ্ছে।

রায়, আমি বলেছিলাম, ব্যাপারটা ভালো, কিন্তু আমরা এই প্রস্তাবটা মানতে পারব না।

-তুমি কী বলছ? তুমি দুগুণ অর্থ পাবে। সত্যিকারের ভালো স্টুডিও।

-না, টেড রিচমণ্ডের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না।

দ্বিতীয় সাইড থ্রু ম্যাঁ । সিডনি সিলভার

-সব ব্যাপার বুঝিয়ে বলো । উনি সব বুঝতে পারবেন ।

-আমি চেষ্টা করব ।

আমি জানি টেড রিচমন্ড কখনও এই প্রস্তাবটা মেনে নেবেন না । মেনে নেওয়া সম্ভব নয় ।

আমি কথা বলার চেষ্টা করলাম । শোনা গেল, উনি কাটিং রুমে আছেন । ওনাকে এখন ব্যস্ত করা যাবে না ।

আমি বলেছিলাম উনি একটু ফাঁকা হলে আমাকে ফোন করবেন ।

এক ঘন্টা বাদে আমি আবার ফোন করলাম । এখনও ওনাকে পাওয়া গেল না ।

সেদিন বিকেলবেলা তিনবার ফোন করে শেষে হতাশ হলাম ।

রায় ক্রোসেটকে ফোনে বললাম, রিচমন্ড আমার ফোনে সাড়া দিচ্ছেন না । তা হলে প্যারামাউন্টের সাথেই কাজটা শেষ করুন ।

চারঘন্টা আগেই ব্যাপারটা হয়ে গেছে ।

বেন এল, সব ব্যাপারটা বললাম । বেন উত্তেজিতভাবে বলল ভীষণ ভালো খবর । প্যারামাউন্ট নাম করা স্টুডিও । টেড রিচমন্ডকে কী বলব?

ভালো প্রশ্ন। সেই বিকেলে আমি টেডের বাড়িতে ফোন করলাম। উনি ফোন ধরলেন।

আমার বুক কাঁপছিল। আমি বললাম অনেকবার আপনাকে ফোন করেছি, আপনি কেন ফোন করেননি?

-আমি দুঃখিত, কাটিং রুমে ছিলাম।

-আপনি ফোন করলে ভালো হত। বেন আর আমি একটা কাজ করেছি।

-কী কাজ?

-প্যারামাউন্ট আমাদের ডেনজারাস হলিডে গল্পটা কিনে নিয়েছে। আপনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাইনি। গল্পটা বিক্রি করে দিয়েছি।

-সে কী? আমি তো এটাকে ফ্লোরে পাঠাব বলে ঠিক করেছি।

-আপনি চিন্তা করবেন না। বেন আর আমি আর একটা গল্প লিখব। এর নাম হল সাউথ অফ পানামা। এটা নাটক, ভালোবাসার গল্প, এর মধ্যে শিহরণ আছে, অনেক . ঘাত-প্রতিঘাত আছে। এত সুন্দর লেখা আমরা কখনও লিখতে পারিনি।

উনি বললেন ঠিক আছে, আমার এবং অ্যালেক্সের সাথে পিগ-এ দেখা করো। আগামীকাল সকাল আটটায়।

অ্যালেক্স হলেন পি আর সি-র এগজিকিউটিভ প্রধান।

আমি বললাম আমি সেখানে চলে যাব। বেনের দিকে তাকিয়ে বললাম, আজ আর ডিমার খাব না। এসো, দুজনে বসে বসে একটা সুন্দর প্রেমের গল্প ভাবি। যার মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত থাকবে। কাল সকাল সাতটা পর্যন্ত সময় পাওয়া যাবে।

সমস্ত রাত জেগে কেটে গেল। একটার পর একটা ভাবনা মাথায় আসছে আর বেরিয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আমরা একটা সুন্দর গল্পের প্লট পেয়েছিলাম। আমরা সাউথ অফ পানামা। শেষ করলাম। তখন ঘড়িতে সকাল পাঁচটা বাজে।

বেন বলল চলল, এবার দেখাতে হবে।

সাতটার সময় ঘড়িতে অ্যালার্ম দিলাম। দুঘণ্টা ঘুমোতেই হবে।

অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। গল্পটা পড়লাম। এই গল্পটা মোটই ভালো লাগছে না। চরিত্রগুলো হাস্যকর। সংলাপ জমছে না। কিন্তু অ্যালেক্স আর টেডের সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

আটটার সময় ঠিক জায়গাতে পৌঁছে গেলাম। টেড এবং অ্যালেক্স, দুজনে একটা বুথে বসেছিলেন। আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

আমি গল্পটার দুটো কপি দিলাম।

অ্যালেক্স বললেন-এখনই পড়লে ভালো হয়।

টেডও তাই বললেন।

তারা দুটো কপিতে চোখ রাখলেন। পড়া শুরু করলেন। আমি তাদের মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। তারা পাতা উলটে যাচ্ছেন, একটার পর একটা পাতা। কোনো কথা বলছেন না।

আমি বুঝতে পারছি। এত চাপ থাকলে কি গল্প লেখা যায়?

গল্পটা শেষ হল।

অ্যালেক্স আমার দিকে তাকিয়ে বললেন -অসাধারণ।

টেড বললেন দারুণ হয়েছে। হ্যাঁ, একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, ডেনজারাস হলিডে -র থেকে এটা অনেক ভালো হয়েছে।

আমি কী শুনছি, বিশ্বাস করতে পারছি না।

-পাঁচশো ডলার দেব। তুমি এবং বেন এর চিত্রনাট্য তৈরি করবে।

বেন এবং আমি একটা অলৌকিক কাজ করেছি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দু-দুটো গল্প লিখে ফেলেছি। শুধু লেখা নয়, গল্প দুটো বিক্রি করা সম্ভব হয়েছে।

সে রাতে আমি এবং বেন হলিউডের একটা ক্লাসিক রেস্টোরাঁতে গিয়েছিলাম। আনন্দের মুহূর্তকে উদযাপন করতে। এই প্রথম আমরা এত বড়ো রেস্টোরাঁর খরচ চালাতে পারছি। এভাবেই আমার চব্বিশতম জন্মদিনটা কোথায় হারিয়ে গেল।

সাউথ অফ পানামা প্রোডিউসার রিলিজিং করপোরেশন এটাকে নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করল। বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যোগ দিয়েছিল। প্যারামাউন্ট ডেনজারাস হলিডে , নিয়ে নাটক করল, নাম দিল ফ্লাই-বাই-নাইট।

বেন আর আমি সেখানে ছোটোখাটো ভূমিকা পেয়েছিলাম। আমি ফক্সের কাজটা ছেড়ে দিলাম। মিঃ জানুকের ওপর আর আস্থা রাখতে পারছি না। বেন এবং আমি আর একটা গল্প বিক্রি করলাম। বোয়ড হিরো শিরোনামে। মনোগ্রাম নামে একটা ছোট্ট স্টুডিওতে। ডেনজারাস লেডি এবং গাম্বলিং ডটারস বিক্রি করলাম পি আর সি-কে। প্রতিটা গল্পের জন্য পাঁচশো ডলার করে পাচ্ছি। দুজনে ভাগ করে নিচ্ছি।

এবার আরও কিছু গল্প লিখতে হবে। জাতীয় চিত্রনাট্যকার হিসেবে আমাদের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

রিপাবলিক স্টুডিওর প্রোডিউসার লিওনার্ড ফিল্ডসের সঙ্গে দেখা হল। তিনি আমাদের কাছ থেকে গল্প কিনলেন। নাম মিঃ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ইন দ্য কাটার কেস। এই গল্প এবং চিত্রনাট্যের জন্য আমরা দুজনে ৬০০ ডলার পেয়েছিলাম।

কাজ এগিয়ে চলেছে। দিনগুলো আরও কর্মমুখর হয়ে উঠেছে।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনের দিনে চিকাগোতে এলাম। রিচার্ড এবং মা-বাবাকে দেখে খুবই ভালো লাগল। পাড়া প্রতিবেশীদের বলা হয়েছিল। বাবার চোখে আমি বিশ্ববিজয়ী বীর। যার পায়ের তলায় থরথর করে হলিউড কাঁপছে।

বাড়ির পরিবেশ ভালো লাগল। রিচার্ড বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে। সে গ্রামার স্কুল থেকে। গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। এবার হাইস্কুলে যাবে। মা-বাবার ঝগড়া এখনও আগের মতো চলেছে। রিচার্ড মধ্যস্থ থাকার চেষ্টা করছে। আমি মা-বাবার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বললাম। কিন্তু তিক্ততা আকাশ ছুঁয়েছে। একে অন্যকে সহ্য করতে পারছে না।

আমি ভাবলাম-রিচার্ডকে হলিউডে নিয়ে যেতে হবে। একজন সাহায্যকারী চাই। আমি রিচার্ডকে প্রস্তাবটা দিলাম। বললাম-হলিউড হাইতে যাবি?

সে অবাক কী বলছে?

-আমি তোকে নিয়ে যাব। কিছুক্ষণের নীরবতা।

-হ্যাঁ, তারপর সে রাজী হল কি?

এক সপ্তাহ বাদে রিচার্ড গ্রেসির বোর্ডিং-এ ঢুকে পড়ল। আমি তাকে সব জায়গায় পরিচয় করালাম। তাকে এত আনন্দিত এর আগে কখনও দেখিনি। কতদিন আমরা একে অন্যকে ছেড়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম। চিকাগো থেকে আসার পর তিনমাস কেটে গেছে। বাবা আর মা ডিভোর্সের জন্য আবেদন করেছে। এই ঘটনাটা আমার মনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

একদিন সকালে আমি একটা টেলিফোন কল পেলাম।

-সিডনি?

-হ্যাঁ।

-হাই, আমি বব রাসেল।

বব রাসেল কে? কোনো সেলসম্যান কি?-আমি দুঃখিত আমার এখন সময় নেই।

-আমরা ম্যাকস রিচের জন্য গান গেয়েছিলাম।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। ভাবতেই পারিনি কে? সিডনি রোসেলথাল?

বব রাসেল, সে বলল, আমি হলিউডে আসছি।

এক সপ্তাহ কেটে গেছে। বব রাসেল গ্রেসির বোর্ডিং হাউসে এসে উপস্থিত হল। তাকে দেখে ভালো লাগল। আগের মতোই আশাব্যঞ্জক তার চরিত্র।

-তুমি এখনও গান লেখো?

-হ্যাঁ, তুমিও গান লেখা ছাড়োনি তো?

দি আদার সাইড ওফ ম্যাঁ । সিডনি সিলভার

রিচার্ড খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। হলিউড হাইতে তার বেশ কয়েকটা বন্ধু জুটেছে। অনেককে সে গ্রেসির বোর্ডিং হাউসে নিয়ে আসছে। মাঝে মধ্যে সেখানে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যাচ্ছে।

একরাতে আমাদের একটা ডিনার পার্টিতে আমন্ত্রণ জানানো হল। আমি আকস্মিক দুর্ঘটনাতে আঘাত পেয়ে তিনদিন বিছানাতে কাটাতে বাধ্য হলাম।

একদিন সন্ধ্যাবেলা মা আমাকে ফোন করে বলল -ডার্লিং, তোর জন্য একটা ভালো খবর আছে। আমি আবার বিয়ে করতে চলেছি।

আমার মনে উত্তেজনা। আমি বললাম-কে?

-ওর নাম মার্টিন লীব। সে খেলনা তৈরি করে।

-খবরটা খুবই ভালো। কখন তার সাথে আমার দেখা হবে?

-তোমার ওখানে আসছি, কেমন?

রিচার্ডকে খবরটা দিলাম। সেও খুব উত্তেজিত।

পরের ফোনটা এল বাবার কাছ থেকে সিডনি, আমি বিয়ে করতে চলেছি।

-কে?

দি আদার সাইড অফ ম্যাঁ । সিডনি সিলভার

-তার নাম অ্যান কার্টিস । ভারী সুন্দরী মহিলা ।

কবে দেখা হবে?

-আমি ওখানে যাব ।

আমার অবাক হবার পালা ।

বব রাসেল এসে গেছে । পুরোনো পরিবেশ জমে উঠেছে বোধহয় ।

শেষ গানটা সে আমাকে শোনাল । একটা অন্যরকম গান ।

আমি পিয়ানোতে বাজালাম । বললাম, অসাধারণ হয়েছে । একটা খবর দিলাম, শনিবার একটা নতুন ক্লাবের জন্ম হবে, একজন গায়িকা সেখানে গান গাইবে । এই গানটা তাকেই দেওয়া যেতে পারে ।

পরের দিন আমি ক্লাবে গেলাম । ওই ভদ্রমহিলা গানের অনুশীলন করছিল । তাকে গানটা দেখানো হল । সে বলল আমি পঞ্চাশ ডলার দেব ।

আমরা টাকাটা নিয়ে ববের হাতে তুলে দিলাম । বব বলল এবার বোধহয় আমি সত্যিকারের পেশাদার লেখক হলাম ।

হলিউডে মাঝে মধ্যে ছোটোখাটো বিস্ফোরণ ঘটে চলেছে। ইউরোপে এবার সত্যিকারের ঝড় শুরু হবে। ১৯৩৯ -জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করল। ব্রিটেন এবং ফ্রান্স যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল।

১৯৪০-ইতালি জার্মানির সঙ্গে হাত মেলাল। ইউরোপে যুদ্ধের রণদামামা বেজে উঠেছে। আমেরিকা এখনও পর্যন্ত তার নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখছে।

১৯৪১ সালের ১৭ ডিসেম্বর পার্ল হারবার আক্রমণ করল জাপানিরা। পরের দিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট জাপানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

যুদ্ধ ঘোষণা করার পর এক ঘণ্টা কেটে গেছে। মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ারের প্রধান লুইস বি, মেয়ার একটা মিটিং ডাকলেন। সেখানে সকলে উপস্থিত হয়েছিলেন।

মেয়ার বললেন -পার্ল হারবারের ঘটনা আপনারা সকলে জানেন। আমাদের লড়াই করতে হবে। আমরা আমাদের মহান প্রেসিডেন্টের হাত শক্ত করব।

বেন, বব আর আমি আরও কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি।

বেন বলল-ফোর্ট ডিক্সে একটা ট্রেনিং ফিল্ম ইউনিট আছে। আমি সেখানে নাম নথিভুক্ত করব।

সারাদিন ধরে তার প্রস্তুতি চলল। এক সপ্তাহ বাদে সে পূর্বদিকে চলে গেল।

আমি ববকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তুমি এখন কী করবে?

-আমি জানি না, আমার শরীরটা খুব একটা ভালো নয়। আমাকে ওরা আর্মিতে নেবে না। আমি নিউইয়র্কে চলে যাব। দেখা যাক কী করতে পারি। তুমি কী করবে?

-আমি বিমানবাহিনীতে যোগ দেব।

১৯৪২ সালের ২৬শে অক্টোবর। আমি বিমানবাহিনীতে আবেদন করলাম। যাতে আমার এই আবেদনটা গ্রাহ্য হয় সেজন্য আমি তিনজন বিখ্যাত মানুষের সুপারিশপত্রও জুড়ে দিয়েছিলাম। এই ব্যাপারটাও যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে করতে হয়েছে। বিখ্যাত মানুষদের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ ছিল না। আমি কংগ্রেস সদস্যের কাছে চিঠি দিলাম। লিখলাম- দেশকে সেবা করতে আমি বদ্ধপরিকর। তাই তাদের সাহায্য দরকার। দুমাস লেগেছিল তিনখানা চিঠি জোগাড় করতে।

এবার ফেডারেল বিল্ডিং-এর সাথে একটা যোগাযোগ করতে হবে। এটা লস এঞ্জেলসের ডাউন টাউনে অবস্থিত। সেখানে একটা পরীক্ষা হবে। দুশো জন আবেদনকারী ছিল। পরীক্ষার মধ্যে সবকিছু ছিল। তর্কবিদ্যা থেকে ভাষার গঠন, অঙ্ক এবং সাধারণ জ্ঞান। চারঘন্টার পরীক্ষা।

অঙ্কের পরীক্ষা আমাকে বোকা বানিয়ে দিল। স্কুল ছাড়ার পর অঙ্কের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

তিনদিন কেটে গেছে। বলা হল এখনই আমাকে বিমানবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। শারীরিক পরীক্ষা হবে। আমি অবাক হলাম। লিখিত পরীক্ষায় পাশ করেছি। মাত্র তিরিশজন আবেদনকারীকে নেওয়া হয়েছে।

এবার শারীরিক পরীক্ষা হবে। আমি নিশ্চয়ই এই পরীক্ষায় পাশ করব।

পরীক্ষা হয়ে গেল। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন তোমার কি কোনো শারীরিক অসুখ আছে?

—না, শেষ অব্দি বললাম, আমার হার্নিয়া আছে। কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধা হবে না।

যে করেই হোক আমাকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতেই হবে। এটাও একটা নতুন স্বপ্ন।

আমাকে আর একটা অফিসে পাঠানো হল। আমার হাতে দুটো ইনডেক্স কার্ড তুলে দেওয়া হল। এবার চোখের পরীক্ষা হবে।

আমাকে বলা হল ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

সব শেষ হয়ে গেল। থ্রেসির কাছে ফিরে গেলাম। রিচার্ডকে সব কিছু জানালাম।

রিচার্ডের মন খারাপ হয়ে গেছে। রিচার্ড বলল তুমি থাকবে না দাদা, আমার একলা থাকতে খারাপ লাগবে।

আমি আশ্বস্ত করে বলেছিলাম-গ্রেসি তোর দেখাশুনা করবেন। মা আর মারতি কদিনের মধ্যেই এখানে আসবে। যুদ্ধ তো আর চিরদিন চলবে না।

পরের দিন সকালে আমি ডাঃ ফ্রেড সেভনের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। প্রথম কার্ডে তার নাম লেখা ছিল। অনেকেই সেখানে ভিড় জমিয়েছে। সকলেরই চোখের পরীক্ষা হবে। একঘণ্টা বসার পর ডাক পেলাম।

তিনি কার্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন এখানে বসুন, আপনি কি পাইলট হবেন? এর জন্য ২০/২০ দৃষ্টি শক্তি দরকার।

তিনি আমাকে একটা ছোটো ঘরে নিয়ে গেলেন। দেওয়ালে একটা চার্ট ঝুলছিল। ডাঃ সেভন ঘরটা অন্ধকার করলেন। তারপর বললেন, ওপর থেকে সবকিছু পড়তে।

দুটো লাইন পড়লাম। আরও লাইন এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেই দুটো লাইন পড়তে পারলাম না।

লাইট জ্বেলে দেওয়া হল। ডাক্তার কিছু একটা লিখলেন।

-এটা রিসেপশনিস্টকে দিন। উনি বললেন।

আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। আমার নাম লেখা আছে। তলায় লেখা আছে চোখের দৃষ্টি খুবই খারাপ। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। কোনো কিছুই আমার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে না।

রিসেপশনিস্ট বললেন- স্যার, আপনার কার্ডটা কোথায়?

আমি কথা শুনতে না পাওয়ার ভান করে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম।

এক ঘন্টা বাদে আমি আমার চোখের ডাক্তারের কাছে পৌঁছে গেলাম। সব ঘটনা খুলে বললাম।

তিনি বললেন- হ্যাঁ, চোখের দৃষ্টি ভালো না হলে কেউ পাইলট হতে পারে না।

-আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন?

এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন তিনি। তারপর কতগুলো গ্লাস বের করে আমার হাতে দিলেন। বললেন- এখনই ব্যাপারটা দেখতে হবে। তোমার কী সমস্যা বলো। কয়েকটা ওষুধ দেব, তা হলেই দৃষ্টিশক্তি বেড়ে যাবে।

আমি হাতে হাত রাখলাম।

দ্বিতীয় ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। ডাঃ এডওয়ার্ড গেল।

পরের দিন সকাল দশটা।

তার অফিসেও একই রকম মানুষের ভিড়।

আমি ভেতরের ঘরে চলে গেলাম। কার্ডটা ডাঃ গেলের হাতে তুলে দিলাম। তিনিও বললেন-এয়ার ক্রপ, বসুন।

ঘরটা অন্ধকার করা হল। দেওয়ালে চার্ট টাঙানো ছিল। তিনি আমাকে পড়তে বললেন। কী আশ্চর্য, মস্ত বড়ো একটা A ছাড়া আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

উনি অবাক হয়ে গেছেন এই চোখের দৃষ্টি নিয়ে আমি সেনাবাহিনীতে কাজ করব কী করে?

-ডাক্তার, আপনি কেন বুঝতে পারছেন না, সমস্ত সপ্তাহ জুড়ে ভীষণ পরিশ্রম গেছে। চোখ দুটো ক্লান্ত। আমার প্রিয় কাকার মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটা সাংঘাতিক। আপনি কি আমাকে আর একটা সুযোগ দেবেন?

উনি আমার কথা শুনলেন। বললেন তাতে কিছু লাভ হবে কী?

আমার কণ্ঠস্বরে একটা মরিয়া ভাব ছিল।

উনি মাথা নেড়ে বললেন -কালকে একবার আসতে পারেন। কিন্তু.....

-অনেক ধন্যবাদ।

আমি আবার আমার ডাক্তারবাবুর কাছে চলে গেলাম।

আমি বললাম আপনি কী গ্লাস দিয়েছেন। কতক্ষণ পরতে হবে। আমি তো তিরিশ মিনিট ধরেই চশমা পরেছি।

বুঝতে পারলাম, এই চার্টটা আমাকে মুখস্থ করতে হবে।

কিন্তু বিভিন্ন চার্টে কি একই রকম বর্ণ সংস্থাপন করা হয়? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

পরের দিন সকাল দশটায় আমি আবার ডাঃ গেলের অফিসে গিয়ে হাজির হলাম।

উনি বললেন আপনি কেন এসেছেন?

-আর একবার চেষ্টা করতে দোষ কী?

আমরা একই ঘরে ফিরে গেলাম। আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। আমি চেয়ারে বসলাম। চার্টের লেখাগুলি পড়ার চেষ্টা করলাম। ডাঃ পিটারস ঠিকই বলেছিলেন। এখন লেখাগুলো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। শেষ লাইনটা পর্যন্ত পড়ে ফেললাম।

লাইট জ্বলে উঠল। ডাঃ গেল অবাক। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন আমি জীবনে এমন ঘটনা কখনও দেখিনি। তিনি বললেন, শেষের দুলাইনে আপনি দু-একটা বর্ণ পড়তে পারেননি, আপনার ২০/২০ কেন, আরও বেশি দৃষ্টিশক্তি আছে।

পরের দিন সকালে আমি আর্মি অফিসারের কাছে রিপোর্ট করলাম। এটা ফেডারেল বিল্ডিং-এ অবস্থিত। তিনি আমার কার্ডের দিকে তাকালেন। বললেন -ঠিক আছে, এবার আপনাকে কিছু শিক্ষা নিতে হবে।

তার মানে আমি সরাসরি যোগ দিতে পারব না?

-হ্যাঁ, আপনি কি ওয়ার ট্রেনিং সার্ভিসের নাম শুনেছেন?

-না, স্যার।

-এটা হল আর্মি এয়ার ক্রুপের একটা নতুন বিভাগ। একে সিভিল এয়ার পেট্রল বলা হয়। এখানে আপনাকে অনেক কিছু শেখানো হবে। আপনি কী করে ফেরি নিয়ে ইওরোপে যাবেন, তা আপনাকে শিখতে হবে। অথবা যদি আপনি ফ্লাই ইনস্ট্রাকটর হতে চান, তাহলেও আপনাকে অনেকগুলি বিষয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে। কিন্তু আপনি যুদ্ধ বিমান চালাবেন না। আপনি কি তাই চালাতে চাইছেন?

-হ্যাঁ, স্যার। আমি তাই চাইছি।

-আপনি তো নিয়মিত সৈন্য হবেন না। আপনাকে নিজস্ব ইউনিফর্মের ব্যবস্থা করতে হবে। আপনাকে ক্যাডারদের মতো টাকা দেওয়া হবে। তাহলে হবে তো?

-হ্যাঁ, স্যার।

-আপনাকে রিফিল্ডের উটাইতে যেতে হবে। আজ থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে।

আমার মন অধীর হয়ে উঠেছে।

মা তার নতুন স্বামীর সঙ্গে আমাদের কাছে এল। রিচার্ড আর আমি তাদের আনতে গেলাম। ভদ্রলোক খর্বাকৃতি। মাথায় ধূসর চুল। মুখে খুশি-খুশি ভাব। তাকে আমার পছন্দ হয়ে গেল। আমরা তার সঙ্গে রাতের খাবার খেলাম। সব কথা গুছিয়ে বললাম।

মারিতি বললেন –তোমার একটা ইউনিফর্ম দরকার। চলল, আমরা শপিং করতে যাই।

ইউনিফর্ম সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। মারিতি আমাকে একটা আর্মি নেভি স্টোরে নিয়ে গেলেন। সুন্দর অফিসারের ইউনিফর্ম কিনে দিলেন। এর সঙ্গে ছিল চামড়ার ফ্লাইং জ্যাকেট। একটা সাদা রুমাল কিনলাম, গলায় বুলিয়ে রাখব বলে। মনে হবে, আমি যেন সত্যিকারের পাইলট।

আমেরিকা যেন যুদ্ধে জেতে, এমন একটা মনোভাব নিয়ে আমি শিক্ষানবীশ হয়ে গেলাম।

.

১০.

রিফিল্ড ছোট্ট একটা শহর। ছ-হাজারের মতো জনসংখ্যা। চারপাশে মনরো পাহাড়ের উপস্থিতি। ভারী সুন্দর একটা হোটেল, মেইন স্ট্রিটে অবস্থিত। আমরা ক্যাডাররা আমাদের ঘরে পৌঁছে গেলাম। সবাই লবিতে গেলাম। এক লম্বা চেহারার ভদ্রলোক, ইউনিফর্ম পরা, সামনে এসে দাঁড়ালেন।

তিনি বললেন-সকলেই চেক করেছো?

আমরা একসঙ্গে বললাম-হ্যাঁ, স্যার।

-আমি ক্যাপটেন অ্যান্ডারসন, তোমাদের চিফ ইনস্ট্রাকটর। পনেরো মিনিটের দূরত্বে
এয়ারপোর্ট অবস্থিত। একটা বাস তোমাদের সকাল ছটার সময় এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবে।
রাতে ভালো করে ঘুমোবার চেষ্টা করো।

উনি চলে গেলেন। পরের দিন সকালে আর্মি বাস এসে আমাদের এয়ার ফিল্ডে নিয়ে
গেল।

ক্যাপটেন অ্যান্ডারসন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

তিনি কাছাকাছি বাড়িতে চলে গেলেন। আমরা সকলে তাকে অনুসরণ করলাম। এই
বাড়িটাকে একটা স্কুলে পরিণত করা হয়েছে। ঘরগুলো যেন ক্লাসঘর।

আমরা বসলাম।

তিনি বললেন তোমাদের ছ মাসের ফ্লাইং কোর্স শেখানো হবে। কিন্তু এখন যুদ্ধ চলছে,
আমরা তিনমাসে এটা শেষ করব। তোমরা ম্যাপ পড়তে শিখবে, বাতাসে কীভাবে বিমান
ভেসে থাকে, সে বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করবে। এর পাশাপাশি আবহাওয়া
সংক্রান্ত ব্যাপারেও তোমাদের কিছু শেখানো হবে। এই ব্যাপারে কেউ কোনো প্রশ্ন
করতে চাও?

আমরা কেউ প্রশ্ন করতে চাইলাম না।

ক্লাস শুরু হল। অনেকগুলো বই পড়তে হল। সারাদিন ক্লাসের মধ্যে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে।

ঘাড়ের ওপর চাপ পড়ে গেছে। একটার পর একটা ক্লাস। এতটুকু ফুরসত নেই। হাসিঠাট্টা করার উপায় নেই।

ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন অনর্গল বলে চলেছেন। তিনমাসে কি ছমাসের পাঠক্রম শেষ করা সম্ভব?

রোজ একই গতানুগতিক রুটিন পালন করতে হচ্ছে। ক্লাস শেষ করার পর ফিভে গিয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করতে হচ্ছে।

একদিন ক্লাসে ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন বললেন তোমাদের দুটো জিনিসের ওপর নজর দিতে হবে। সবসময় সামনের দিকে তাকাবে। আর পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখবে শত্রুপক্ষের বিমান আশে-পাশে এসেছে কিনা। যতটা উঁচুতে উঠবে, তার সঙ্গে গতি বজায় রাখতে হবে। কখনও যেন বিমানটা দুর্ঘটনায় না পড়ে।

এবার সত্যিকারের ট্রেনিং শুরু হল। হ্যাঁ, আকাশ আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। চারপাশে উঁচু পাহাড়ের সীমারেখা। আমরা ৭৫০০ ফুট উঁচুতে উড়ে গেলাম।

ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন বললেন- এবার আমরা ঘুরপাক খাব।

বিমানটা ঘুরতে শুরু করেছে। এটাই সত্যিকারের সমস্যা।

আমি কিছুতেই বিমানটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছি না। বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠছে চোখে-মুখে। আমার এই বিপর্যয় দেখে ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন খুবই হতাশ হয়েছেন।

পরের দিন আমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লাম।

শেষ পর্যন্ত বিমানটাকে নামানো হল। ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন জিজ্ঞাসা করলেন তুমি, আজ সকালে ব্রেকফাস্ট খাওনি?

-হ্যাঁ, স্যার।

-কাল থেকে তুমি লাঞ্চার আগে কিছু খেও না, কেমন?

-তার মানে? এতক্ষণ না খেয়ে থাকব কী করে?

এই প্রথম ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন আমাকে নিয়ন্ত্রণ শেখালেন। উনি বুঝতে পেরেছিলেন, আমার এক ধরনের অসুখ করেছে। তখন থেকে আমি আরও অনুভবী হয়ে উঠলাম। কাজের প্রতি মনোযোগ বেড়ে গেল।

প্রত্যেক সপ্তাহে আমি রিচার্ডকে ফোন করতাম। মাকেও ফোনে সব কিছু জানাতাম।

একদিন রিচার্ড আমাকে একটা খুশির খবর দিল।

সে বলল-সিডনি, আমিও যুদ্ধে যোগ দেব।

হঠাৎ আমার মনে হল, এ কী, রিচার্ড তো এখন আর ছোট্ট ছেলেটি নেই।

আমি বললাম তোকে অনেক ধন্যবাদ।

ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন আমাকে আরও পাকাঁপোক্ত করে তুলতে চাইলেন। একদিন তিনি দেখলেন, ইঞ্জিনটা ঠিক মতো কাজ করছে না। তিনি বললেন-সেলডন, এখনই তোমাকে জরুরি অবতরণ করতে হবে।

আমি নীচের দিকে তাকালাম। নামাবার মতো কোনো জায়গা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু চোখে মুখে ভয়াবহ অভিব্যক্তি আনা চলবে না। আমি ধীরে ধীরে প্লেনটাকে আরও নীচে নিয়ে এলাম। তারপর অবতরণ করার মতো একটা জায়গা পেলাম।

যখন আমি অবতরণ করতে যাব, ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন মেশিনটা চালিয়ে দিলেন। বললেন -আবার ওপরে উঠে যাও।

একদিন ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন বললেন এবার তোমাকে একাই বিমান চালাতে হবে।

উত্তেজনায় সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপছে।

-একটা কথা মনে রেখো, উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে গতিকে নিয়ন্ত্রণ করো। তা না হলে সর্বনাশ।

আমি প্যারাসুটটা দেখে নিলাম। এই প্রথম বিমানে আমি একা। সকলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বাতাসের বুকে উড়ান পাখি ভেসে গেল। অসাধারণ অনুভূতি। স্বাধীনতার স্বপ্ন। পৃথিবীর সীমারেখা পার হয়ে মহাশূন্যের উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছি, এমন একটা অনুভূতি।

আমি ৬১০০ ফুট উচ্চতায় উড়ে গিয়েছিলাম।

সেখানে আমাকে কুড়ি মিনিট থাকতে বলা হয়েছিল। ঘড়ির দিকে তাকালাম। হ্যাঁ, এবার ভালোভাবে অবতরণ করতে হবে। আমি নীচে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোকে দেখতে পাচ্ছি। তারা ফিঙে দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্য।

কোথায় অবতরণ করতে হবে তা আগে থেকে বলা আছে। আমি মাটির কাছাকাছি নেমে এলাম। আলটিমিটারের দিকে তাকালাম। হ্যাঁ, কতটা গতি রাখতে হবে, তা আমি ভুলে গেছি। আসলে সব কিছুই তখন মাথার বাইরে চলে গেছে। আমি প্রচণ্ড ভয় পেলাম। যে কোনো মুহূর্তে বিমানটায় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আমি গতি আর উচ্চতার সূত্র মনে করার চেষ্টা করলাম। মনটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। যদি ভুল হয়, তাহলে আমার মৃত্যু হবে। সমস্ত শরীরে ভয় ঢুকেছে। কী করব, কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমি আবার নামতে শুরু করলাম। হা, ফরমূলাটা একেবারে ভুলে গেছি। হাজার ফিট নেমে গেছি। এখন ঘণ্টায় ৬০ মাইল গতি রাখতে হবে।

৩০০ ফুট, ঘণ্টায় ৫০ মাইল গতি রাখতে হবে। আমার গতিটা কি বেশি হয়ে যাচ্ছে?

বিমানটা আছড়ে পড়ল মাটির ওপর। দুলে উঠল। আবার আছড়ে পড়ল, আবার দুলে উঠল। শেষ পর্যন্ত স্থির হল। আমি ব্রেক নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছি। কাঁপতে কাঁপতে বিমান থেকে বেরিয়ে এলাম।

ক্যাপটেন অ্যান্ডারসন শহরে চলে যাচ্ছিলেন। তিনি ফিরে এসেছেন। তিনি বললেন –এ কী করলে? এমন করে কেউ বিমান নামায়।

আমার সমস্ত শরীরে ঘাম, না, ভুল হয়ে গেছে। পরের বার ভুল হবে না।

–আমাদের অভিধানে পরের বার বলে কিছু নেই। তোমাকে এখনই করতে হবে।

আমার মাথা ঘুরছে, এখনই?

–হ্যাঁ, তুমি বিমানটাকে আবার ওড়াবে।

উনি বোধহয় ঠাট্টা করছেন। আমি অপেক্ষা করছি। আমি আমতা আমতা করে বলার চেষ্টা করছি এখনই কি আমায় উড়তে হবে?

উনি বললেন–হ্যাঁ, এটা আমার আদেশ।

সকলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি বিমানটাকে আবার বাতাসে ভাসিয়ে দিলাম। মনটা শান্ত রাখার চেষ্টা করলাম। ক্লাসে যা শিখেছিলাম, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। এবার আমার মনটা পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি পনেরো মিনিট আকাশে ছিলাম। এবার সুন্দরভাবে বিমানটাকে নামিয়ে আনলাম।

বিমানের সামনে এগিয়ে এসে ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন বললেন ভালো হয়েছে। কাল আবার তোমাকে বিমান ওড়াতে হবে।

এরপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। তখন পাঠক্রম প্রায় শেষ হয়ে আসছে। একটা স্মরণযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল।

সেই সকালে আমি সবে মাত্র বিমানটাকে ওড়াব, ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন বললেন –আমরা শুনেছি ঝড় আসছে, সেলডন। ঝড়ের দিকে নজর দিতে হবে। ঝড়ের সংকেত দেখলে সঙ্গে সঙ্গে বিমানটাকে অবতরণ कराবে।

আমি বিমানটাকে আকাশের বুকে ভাসিয়ে দিলাম। পাহাড়ের ওপর ঘুরপাক খাচ্ছি। মাঝে মধ্যে ওপর নীচে হেলেদুলে এগিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, এই পথে ঝড় আসতে পারে।

আমি কী করব?

খবরটা সর্বত্র হয়তো ছড়িয়ে পড়বে। রেডিও এবং টেলিভিশনে সারা পৃথিবী জানতে চাইবে, আমি নিরাপদে অবতরণ করতে পারলাম কিনা। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। অ্যাম্বুলেন্স এসে গেছে কি? অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র? না, এ হল আমার দিবাস্বপ্ন। আমাকে সাহসের পরিচয় দিতে হবে।

হঠাৎ অন্ধকার ঘনিয়ে এল। এবার আমার বিমানটা ঝড়ের মুখে আটকে পড়েছে। আমি অন্ধের মতো চালাবার চেষ্টা করছি। চারপাশে কালো মেঘের হাতছানি। এয়ারফিল্ড

দেখতে পাচ্ছি না। আমি জানি, যে কোনো মুহূর্তে পাহাড় চূড়ার সঙ্গে ধাক্কা লাগতে পারে। এক সেকেন্ডে আমি হয়তো জীবন থেকে মৃত্যুর কাছে চলে যাব।

সামনে কোনো এয়ারফিল্ড আছে কি? কোনদিকে?

বিমানটা অসহায়ের মতো দুলছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কাগজের শিরোনাম-পাহাড়টাকে এড়িয়ে যাব কী করে? আমি ছোটো বৃত্তের মাধ্যমে নীচে নামার চেষ্টা করছি। নীচে আরও নীচে। কোনো একটা নিরাপদ জায়গায় কিছুক্ষণ ভেসে থাকতে হবে। শেষ পর্যন্ত আমি মাটি থেকে ৩০ ফুট উঁচুতে চলে এলাম। এখন কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, ব্রু-রা সব তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

আমি কোনরকমে বিমানটাকে অবতরণ করলাম। আমার প্রশিক্ষক এগিয়ে এলেন। তিনি খুবই রেগে গেছেন।

তিনি বললেন আমি তো বলেছি ঝড়টাকে লক্ষ্য করতে।

-হ্যাঁ, আমি ঝড়ের দিকে নজর রেখেছিলাম।

ক্যাপটেন অ্যান্ডারসন একদিন বললেন এবার ট্রেনিং শেষ হয়েছে। তোমরা বিমান ওড়াতে শিখে গেছে। কিন্তু এখন হাতে যথেষ্ট যুদ্ধ বিমান নেই। তাই কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

দি আদার সাইড অফ ম্যাঁ । সিডনি সিলভন

তখনই আমার মনে বেন রবার্টসের কথা এল। আমি ভাবলাম, নিউইয়র্কে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়?

আমি সকলকে গুডবাই জানালাম। প্লেন ধরে নিউইয়র্কে উড়ে চলেছি। এখনই বেনের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

অসাধারণ একটি উড়ান

১১.

অসাধারণ একটি উড়ান। বিরাট বাণিজ্যিক প্লেন। অনেক প্যাসেঞ্জারের ভিড়। আমার দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

নিউইয়র্কে এসে থামলাম। এটাই তো ব্রিল বিল্ডিং। আর কে, ও জেফারসন এবং ম্যাক্স রিচের অফিস। অনেক স্মৃতির গুঞ্জন।

বেন রবার্টস ইতিমধ্যেই খবর পেয়েছে। সে এয়ারপোর্টে এসেছে আমাকে স্বাগত জানাবে বলে।

আমরা হোটেলে গেলাম।

সে বলল-আমি এখন ফোর্ট ডিক্সের হয়ে কাজ করছি। আমি সিনেমার সাথে যুক্ত হয়েছি। তুমি জানো না, এটা কত সুন্দর অভিজ্ঞতা। তুমি নিউইয়র্কে কী করবে? কতক্ষণ থাকবে?

আমি বললাম এক ঘন্টা হতে পারে। এক সপ্তাহও হতে পারে।

আমি আমার অবস্থাটা বোঝাবার চেষ্টা করলাম। বললাম যে কোনো সময় কর্তৃপক্ষের ডাক আসতে পারে।

আমরা একটা হোটেলে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আগে থেকেই ঘর বলা ছিল। আমি বললাম দূর থেকে একটা ফোন কল আসবে ম্যাডাম, আমাকে সঙ্গে সঙ্গে দেবেন কিন্তু।

বেন আর আমি পরবর্তী রাতে ডিনার খেয়েছিলাম।

সকালবেলা, আমি আমার এজেন্ট লুইস সুত্রকে ফোন করলাম। ক্যালিফোর্নিয়াতে থাকেন। আমি নিউইয়র্কে এসেছি, সেকথা জানালাম।

-অফিস যাচ্ছেন না কেন?

উনি বললেন আমার পার্টনার জুলেসের সঙ্গে দেখা করুন।

জুলেস, নিউইয়র্ক অফিসের প্রধান, বছর চল্লিশ বয়স, দেখতে শুনতে খুব একটা খারাপ নয়।

উনি বললেন লুই, আপনাদের আসার কথা বলেছে। আপনি কি কোনো প্রোজেক্টে কাজ করবেন?

-হ্যাঁ।

-আমার কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রোজেক্ট আছে। আপনি কি জান কিপুরার নাম। শুনেছেন?

-হ্যাঁ, শুনেছি।

-জান কিপুরা হল ইওরোপের একটা মস্ত বড় অপেরা স্টার। তার স্ত্রী মার্থা এগারথেরও খুব নাম আছে। তারা সেখানে অনেকগুলি মুভি তৈরি করেছেন। তারা ব্রডওয়েতে কিছু দেখাতে চলেছেন। দ্য মেরি উইডো।

মেরি উইডো, ফ্রানজ লেহাবের এক বিখ্যাত অপেরা। এমন একজন রাজার গল্প, যিনি এক ছোট ভূমিখণ্ডের প্রধান ছিলেন। তিনি এক বিধবাকে ভালোবাসতেন।

-এই বইটার সারাংশ লিখে দিতে হবে। আপনি কি কাজটা করতে চাইছেন?

আমি কি এখন তা আর পারব? নিজেকে প্রশ্ন করলাম।

শেষ পর্যন্ত জান এবং মাথার সঙ্গে দেখা হল। অসটর হোটেলে। কিপুরা দরজা খুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন -আপনি কি লেখক?

-হ্যাঁ।

-ভেতরে আসুন।

জান কিপুরা একজন শক্তিশালী চেহারার মানুষ। বছর চল্লিশ বয়স। কথার ভেতর হাস্যরসাত্মক টান আছে। মার্থা রোগা এবং আকর্ষণীয়। লম্বা চুলের অধিকারিণী। মুখে আমন্ত্রণী হাসি।

-বসুন। কিপুরা বললেন।

আমি বসলাম।

-দ্য মেরি উইডোকে আমরা দেখাতে চাইছি। জুলেস বলেছেন, আপনি একজন ভালো লেখক। আপনি ইতিমধ্যে কী কী লিখেছেন?

আমি গড়গড় করে বলে গেলাম ফ্লাই বাই-নাইট, সাউথ অফ পানামা।

তারা আমার দিকে অবাক চোখে তাকালেন।

জান বললেন আমরা পরে জানাব।

তিরিশ মিনিট বাদে আমি জুলেস জিগলারের অফিসে পৌঁছে গেলাম।

জিগলার বললেন -হ্যাঁ, ওনারা ফোন করেছিলেন। কাজটা আপনাকে করতে হবে।

আবার ঘন কালো মেঘের অন্ধকার। আমি জানি না, কীভাবে এগিয়ে যাব। ব্রডওয়ের জন্য কবে চিত্রনাট্য লিখব?

জুলেস জিগলার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন- আপনার শরীর ঠিক আছে?

মনের এই ভাব গোপন রেখে আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি।

আমি হোটেল রুমে ফিরে এলাম। বেন রবার্টসকে সব কথা কি জানাব? আমরা কি আবার একসঙ্গে কাজ করব?

ফোর্ট ডিস্কে তাকে ধরে ফেললাম। সে বলল –নতুন কিছু?

–হ্যাঁ, দ্য মেরি উইডোর ওপর সারাংশ লিখতে হবে।

–তুমি কি মদ খেয়েছ?

–কেন? বেন কোনো কথা বলছে না।

পরের দিন সকালে আমি থিয়েটারে গেলাম। সেখানেই দ্য মেরি উইডো দেখানো হবে। নিউ অপেরা কোম্পানি এই পরিবেশনার জন্য পয়সা ঢালছে। এর অন্তরালে এক মধ্যবয়সিনী ভদ্রমহিলার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। তার নাম ইরিয়ন।

এটা একটা প্রথম শ্রেণীর প্রযোজনা। ক্যারিওগ্রাফিটা অসাধারণ। বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব জর্জ সেটা তৈরি করেছেন। তাঁকে এই দেশের অন্যতম সেরা ক্যারিওগ্রাফার বলা হয়। ভদ্রলোকের বয়স খুব একটা বেশি নয়। অসাধারণ নাচতে পারেন। মুখে সুন্দর হাসি আছে। উচ্চারণে রাশিয়ান ভাব।

পরিচালক হলেন বিখ্যাত ফেলিক্স ব্রেনটন। পরিবেশনা করছেন রবার্ট স্টোলজ। নর্তকীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে মিলা স্লাডোভা, এক ইওরোপীয় নর্তকী।

আমি এদের সকলের সঙ্গে দেখা করলাম।

ডিরেক্টর বললেন- আধুনিক শব্দ ব্যবহার করতে হবে।

আর একজন বললেন -ব্যাপারটা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই।

সব কিছু একসঙ্গে কী করে হবে? বেন আর আমি আনন্দে মেতে উঠলাম। ফোর্ট ডিক্স নিউজার্সিতে অবস্থিত। সেখানে বেনকে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হয়। সে রাতে নিউইয়র্কে আসে। আমরা একসঙ্গে ডিনার খাই। একসঙ্গে কাজ করি। কাজ করতে করতে রাত দুটো বেজে যায়। তবুও উৎসাহে ভাটা পড়ে না।

এই প্রথম ব্রডওয়ের হয়ে একটা নাটক লিখতে চলেছি। সমস্ত শরীর উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। বেনের সঙ্গে কাজ করা অনেকটা সহজ। তার মধ্যে একটা সুন্দর সৃজনশীলতা আছে। সে আমার থেকে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী।

প্রথম অঙ্কটা লেখা শেষ হল। সেটা নিয়ে আমি আমার প্রযোজক ইরিয়নের কাছে গেলাম। তিনি পাতাগুলো ওলটাতে থাকলেন।

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন -অসম্ভব। এটা হতেই পারে না।

আমি অবাক, আমি তো চেষ্টা করেছি।

-আপনি কি আমাকে বোকা বানাবেন? আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন?

-আমি দুঃখিত। বলুন কোথায় ভালো হচ্ছে না, আমি আবার লিখে নিয়ে আসছি।

তিনি বাইরে বেরিয়ে গেলেন। এটা একটা অভাবিত আঘাত। আমি কি ব্রডওয়ের জন্য নাটক লেখার যোগ্য নই?

আমি সেখানে বসে আছি। নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করছি।

জর্জ বালানচিন এবং ফেলিক্স ব্রেনটানো অফিসে এলেন।

—আপনার প্রথম অঙ্ক সম্পর্কে আমি শুনেছি। দেখি কী লেখা আছে?

তারা দুজনে পড়তে শুরু করলেন।

আমি মুখে শব্দ শুনতে পেলাম ফেলিক্স ব্রেনটানোর, তারপর হাসি। জর্জ বালানচিন।

তারা পড়তে পড়তে হেসে দিয়েছেন। আহা, এটা তাদের ভালো লেগেছে।

পড়াটা শেষ হল। ফেলিক্স ব্রেনটানো আমাকে বললেন —সিডনি, দারুণ হয়েছে। আপনার কাছ থেকে যা আশা করি সবই পেয়েছি।

জর্জ বালানচিন বললেন দ্বিতীয় অঙ্কটা এমনই ভালো হবে তো?

এই খবরটা বেনকে শোনাতে হবে।

হোটেল গিয়ে আমি টেলিফোনের কাছে চলে এলাম। ভেবেছিলাম আমি এয়ার ক্রপ থেকে যে কোনো মুহূর্তে খবর আসতে পারে। সব সময় তাই নিজেকে তৈরি রাখতে হত।

নিউইয়র্ক একটা একাকীত্বের শহর বলা যেতে পারে। এখানে কারোর সাথে বিশেষ কথা হয় না। ইতিমধ্যে ব্যালেরিনা মিলার সঙ্গে আলাপ হল। এক রবিবার, রিহাসাল ছিল না। তাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করলাম। সে আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল।

আমি তাকে তার মন ভোলাবার চেষ্টা করেছিলাম। আমি তাকে সার্ভিতে নিয়ে গেলাম। তখন আমি ইউনিফর্ম পরে ছিলাম। ডিনার খেতে খেতে মিলা আর আমি আসন্ন উপস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আমি তার মনের টগবগে ভাবটা বুঝতে পারলাম। ডিনার হয়ে গেল। আমি চেকের জন্য বললাম, ৩৫ ডলার। আমি কী করে মেটাব? অনেকক্ষণ চেকের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তখন ক্রেডিট কার্ডের প্রচলন হয়নি।

মিলাডা জানতে চাইল কিছু গোলমাল হয়েছে?

আমি বললাম না, তারপর বললাম আমি এখনই আসছি।

আমি প্রবেশ পথের দিকে চলে গেলাম। সেখানে ওই হোটেলের মালিক দাঁড়িয়ে ছিলেন।

-মিঃ সার্ভি?

-হ্যাঁ।

এখন আমি কী বলব? উনি তো আর দানছত্র খুলে বসেননি।

-এটা আমার চেকের ব্যাপারে।

তিনি আমার দিকে তাকালেন। তিনি এমন অনেক জোচ্ছোরকে আগে দেখেছেন।

-কিছু ভুল হয়েছে?

-এই মুহূর্তে আমার কাছে পয়সা নেই। আমি লক্ষ্য করছি, মিলা আমার দিকে তাকিয়ে আছে কিনা। আমি আবার বললাম, মিঃ সার্ভিস, আমি নাটক লিখি। এই নাটকটা ম্যাজেস্ট্রিক থিয়েটারে দেখানো হবে। রাস্তার ওপারে। থিয়েটার এখনও খোলেনি। যখন পয়সা পাব, আমি টাকাটা দিয়ে যাব। আপনি কি এইটুকু বিশ্বাস আমায় করতে পারেন?

তিনি বললেন কোনো সমস্যা নেই। যে কোনো সময় আমার হোটেলে খেতে আসবেন।

আমি বললাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

-না-না, ধন্যবাদ দেবার কী আছে?

এই ভাবেই সমস্যাটার তাৎক্ষণিক সমাধান হল।

আমাদের প্রযোজক ইওলানডা, বেন এবং আমাকে মোটেই পছন্দ করতেন না। কোনো লেখাপড়ার আগেই তিনি একটা খারাপ মন্তব্য করতেন।

তিনি বলেছিলেন এই পরিবেশনটা একেবারে ফ্লপ হবে।

আমি ভেবেছি, উনি বোধ হয় মানসিক রোগিনী।

জর্জ বালানচিন, ফেলিক্স ব্রেনটানো, রবার্ট স্টোলজ- সকলেই আমাকে খুব ভালোবাসতেন।

রিহাসালের সময় ইওলানডা মাঝে মধ্যে বেশি কাজ করাতেন। সকলকে আদেশ দিতেন।

একদিন রিহাসালের মাঝে একটুখানি সময় দেওয়া হয়েছে।

বালানচিন বললেন তোমার সঙ্গে কিছু গোপন কথা আছে।

-জর্জ, কিছু কি খারাপ হয়েছে?

-না, ভিনটন ফ্রিডলে নামে আমার এক বন্ধু আছে। সে একটা নতুন নাটক তুলতে চাইছে। সে একজন লেখকের সন্ধান করছে। আমি আপনার কথা বলেছি। সে আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য উদগ্রীব।

-সত্যি কথা? আমিও দেখা করতে চাইছি।

বালানচিন তাঁর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন। একটার সময় দেখা করতে হবে।

দুটো ব্রডওয়ের নাটক একই সঙ্গে অভিনীত হবে? এটা অবিশ্বাস্য।

ভিনটন ফ্রিডলে এক বিখ্যাত প্রযোজক। তার অনেকগুলো মঞ্চ সফল উপস্থাপনা আছে। ফানি ফেস, গার্ল ক্রেজি ইত্যাদি। তাকে আমরা এক করিৎকর্মা মানুষ বলতে পারি।

-জর্জ, আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছে।

-আমি চেষ্টা করব।

আমি জ্যাকপট নামে একটা শো উপস্থাপনা করতে চলেছি। এই শো-এর ভেতর এমন একটি মেয়ের গল্প বলা হয়েছে, যে যুদ্ধ ফেরত বন্দীদের জন্য টাকা তুলতে চাইছে।

গল্পটার মধ্যে মজা আছে বলে মনে হচ্ছে। আমি এর মধ্যে একজন চিত্রনাট্যকারের সন্ধান পেয়েছি। তার নাম গাই বোলাটন। কিন্তু তার লেখার মধ্যে বেশির ভাগ ইংরাজি প্রাচীনপন্থা। আমি নতুন ইংরাজি শব্দ আমদানি করতে চলেছি। এই কাজটা কি আপনার ভালো লাগবে?

-অবশ্যই ভালো লাগবে, আমি বললাম, আমার সাথে আর একজন সাহায্যকারী আছে, বেন রবার্টস। সে আমার সাথে কাজ করবে।

ফ্রিডলে বললেন -ঠিক আছে। এই নাটকটার চিত্ররূপ দিয়েছেন ভারনন ডিউক এবং হাওয়ার্ড ডিয়েজ।

ব্রডওয়ে একটি স্মরণযোগ্য নাম।

কবে থেকে শুরু করা যায়?

-এখন থেকে ।

-হ্যাঁ, যে কোনো মুহূর্তে ওই সংস্থা থেকে রিপোর্টের কথা বলা হতে পারে । তখন আমাকে ছেড়ে যেতে হবে ।

ফ্রিডলে কথা বললেন আমরা ইতিমধ্যেই কুশীলবদের ঠিক করেছি । অ্যালান জোনস এবং ন্যাটি ফাত্রে কাজ করতে রাজি হয়েছেন ।

-অসাধারণ উপস্থাপন । আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি । ফ্রিডেল আমাকে নিয়ে আলভিন থিয়েটারে ঢুকে পড়ল ।

স্টেজের ওপর দক্ষিণ দেশের একটা বিরাট বাড়ি তৈরি করা হয়েছে । আমি অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছি ।

-আপনি বললেন যে, এই গল্পটা হচ্ছে এমন এক মার্কিন সৈন্যকে নিয়ে যে...

এটা আমার গত শো-এর সেট । ফ্রিডলে ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন । শো-টা একবারে ফ্লপ হয়েছে । আমরা এই সেটটাকে আবার ব্যবহার করব । তাতে অনেক পয়সা বেঁচে যাবে ।

আমি বুঝতে পারছি না, কী করে গথিক যুগের দক্ষিণ দেশীয় ম্যানসনকে একটা আধুনিক কালের যুদ্ধসংক্রান্ত গল্পের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে।

-আমাকে এখনই অফিসে ফিরতে হবে। গাই বোলটনের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

ভদ্রলোককে দেখে মনে হল, তিনি এক আকর্ষণীয় ইংরেজ। তিনি পি. জি. ওডহাউসের জন্য বেশ কয়েকটি চিত্রনাট্য লিখেছেন। আমি জানি না, উনি আমাকে সাহায্য করবেন কিনা?

অথচ উনি বললেন- আমরা একসঙ্গে কাজ করব, ব্যাপারটা ভাবতেই অবাক লাগছে।

আমি হোটেলে ফিরে এলাম। হোটেল গার্ডকে বললাম আমার কোনো মেসেজ আছে কি?

-না, মি সেলডন।

তা হলে? পরবর্তী উড়ানে আমায় বোধহয় আর কখনও ডাকা হবে না।

আমি হোটেলে ফিরে গিয়ে বেনকে ফোন করলাম ফোর্ট ডিস্কে।

-তুমি আর আমি ভিনটন ফ্রিডলের হয়ে কাজ করব।

অনেকক্ষণের নীরবতা- ওরা মেরি উইডো নিয়ে নিয়েছে?

-না, মেরি উইডোর ব্যাপারে পাকা কথা বলতে হবে।

-কী করে সব শেষ হল?

-আমি জানি না। জর্জ বালানচিন সব কিছু ঠিক করেছেন। আমরা গাই বোলটন নামে এক ইংরেজ সাহিত্যিকের সঙ্গে দেখা করব এবং তার অধীনে কাজ করব।

.

১২.

আমি ব্যস্ত এবং খুশি। প্রতি মুহূর্তে ফোন কলের জন্য অপেক্ষা করি।

পরবর্তী তিন মাসে আমি অনেকগুলো চিত্রনাট্য লিখে ফেললাম। মেরি উইডো, জ্যাকপট, আরও অন্য দুই একটা।

একদিন রোববার সকালবেলা নিউইয়র্কে একটি বিনোদন আসরে গিয়ে আমি উপস্থিত হলাম। যে সমস্ত সৈনিকেরা কিছুদিনের জন্য এসেছে, তাদের মন চাঙ্গা রাখাই এই আসরের উদ্দেশ্য। সেখানে সুন্দর সুন্দর গান বাজানো হয়। সুন্দরী মেয়েরা নাচ প্রদর্শন করে। পর্যাপ্ত খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। এ বুঝি যুদ্ধ নামক মরুভূমিতে এক টুকরো মরুদ্যান।

আকর্ষণীয় চেহারার সোনালি চুলের একটি মেয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল আপনি কি নাচতে চান, সোলজার?

নাচটা সবে শুরু হবে, কে যেন আমার কাঁধে হাত রেখেছে।

আমি বললাম এই তো নাচ শুরু হচ্ছে। এখন কেন?

আমি তাকিয়ে দেখলাম- দুজন বিরাট আকারের মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন।

একজন বললেন- সোলজার, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল। চলুন আমরা থানায় যাব।

-কেন? কী সমস্যা?

-নিজেকে অফিসার হিসেবে পরিচয় দিচ্ছেন?

-আপনারা কী বলছেন?

-আপনি অফিসারের ইউনিফর্ম কেন পরেছেন? আপনার কোনো পরিচয়পত্র আছে?

-না, আমি একজন অফিসার নই। আপনারা মস্ত বড়ো ভুল করছেন। আমাকে এই পোশাকটা পরার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

-কে অনুমতি দিয়েছেন? আপনার মা?

ওঁরা জোর করে আমাকে সেখান থেকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন।

আমার সমস্ত শরীরে এবং মনে ভয়ের আকুতি- আপনারা কেন বুঝতে পারছেন না, আমি এয়ার ক্রুপের একটা স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চার সাথে যুক্ত আছি।

ওঁরা আমাকে তখন দরজার কাছে নিয়ে গেছেন।

-আপনারা কি ওয়ার ট্রেনিং সার্ভিসের নাম শুনেছেন?

না।

আমরা বাইরে বেরিয়ে এসেছি। একটা গাড়ি দাঁড় করানো আছে।

-ভেতরে চলে যান।

-আমি বললাম আমি কখনই যাব না। আপনারা এখনই একটা ফোন করতে পারেন। আমি ওয়ার ট্রেনিং-এর সঙ্গে যুক্ত। আমরা এই ধরনের পোশাক পরতে পারি।

দুজন পুলিশ মুখ চাওয়া চাওয়া করলেন। একজন বললেন- ঠিক। আচ্ছা কোথায় ফোন করতে হবে?

আমি নাম্বারটা দিলাম। একজন পুলিশ বললেন- তুমি এর ওপর নজর রাখো, আমি এখনই ফোন করে আসছি।

কুড়ি মিনিট কেটে গেছে। উনি ফিরে এসেছেন। মুখে একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি।

অন্যজন জিজ্ঞাসা করলেন- কী হয়েছে?

আমি একজন জেনারেলের সঙ্গে কথা বললাম। ওয়ার ট্রেনিং সার্ভিস সম্পর্কে উনি কিছু জানেন কিনা জানতে চাইলাম। হ্যাঁ, এটা হল আর্মি এয়ার ক্রুপের একটা ব্রাঞ্চ।

অন্যজন আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন- আমি দুঃখিত। আমরা ভুল করেছি।

আমি আবার ভেতরে চলে গেলাম। কিন্তু সেই মেয়েটি ইতিমধ্যে তার নাচের সঙ্গীকে খুঁজে পেয়েছে।

গাই বোলটনের সঙ্গে কাজ করার মধ্যে একটা আলাদা আনন্দ আছে। অনেকগুলো জনপ্রিয় নাটক লিখেছেন। সুন্দর সুন্দর শব্দ ব্যবহার করেন।

তিনি লং আইল্যান্ডে একটা ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন। প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে বেন আর আমি সেখানে চলে যাই।

এক সন্ধ্যাবেলা ডিনার পার্টি। আমি এক সুন্দরী মহিলার উল্টো দিকে বসে আছি।

মেয়েটি বলল- গাই আমাকে সব কথা বলেছে। তুমি নাকি ব্রডওয়ের জন্য একটা সংগীত মুখরিত চিত্রনাট্য লিখছ? ব্যাপারটা খুবই আকর্ষণীয়।

আমি জানতে চাইলাম- তার মানে?

-আমি অভিনয় করতে চাইছি।

-তোমার নাম কী?

-ওয়েনডি ব্যারি।

ওয়েনডি ব্রিটিশ। সে ইতিমধ্যে কয়েকটা ছবিতে অভিনয় করেছে। অবশ্য সবই ইংল্যান্ডে।

ডিনার শেষ হয়ে গেল। আমি জানতে চাইলাম- সবকিছু ঠিক হয়েছে?

সে মাথা নেড়ে বলল- চলো একটু হেঁটে আসি।

আমরা বাইরে এলাম, চাঁদের আলোর উদ্ভাস চারপাশ। এখন ইলেকট্রিক আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। চাঁদ ছাড়া আলোর উৎস নেই।

হঠাৎ সে কাঁদতে শুরু করল। আমি কান্নার কারণ জানতে চাইলাম।

সে বলল- আমার বয়ফ্রেন্ড আমাকে অকারণে মারধোর করে।

কথাগুলো কোনোরকমে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

-কেন? তুমি কেন তাকে বাধা দাও না?

দি আদার সাইড ওফ ম্যাঁ । সিডনি সিলভন

-আমি জানি না, তাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি।

সে আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমি তার কাঁধে হাত রাখলাম।

-ওয়েনডি, আমার কথা শোনো। তুমি আর আঘাত পেয়ো না। তাকে ছেড়ে যাবার চেষ্টা করো।

-আমি জানি না, কবে পারব। আমি এখন যাচ্ছি।

-ঠিক আছে। আবার দেখা হবে। তুমি কি নিউইয়র্কে থাকো? কাল রাতে কী করছ?

ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল- কাল রাতে আমার কোনো কাজ নেই।

ডিনারে আসবে?

-এলে ভালো হবে।

পরের দিন রাত্রিবেলা, ওয়েনডি আর আমি সার্ভিতে ডিনার খেলাম। একে অন্যের সাহচর্য উপভোগ করলাম। পরের দু-সপ্তাহের মধ্যে আমরা বন্ধুত্বের আবরণে বাধা পড়লাম।

শুক্রবার সকালবেলা আমি একটা টেলিফোন পেলাম।

-সিডনি?

-হ্যাঁ ।

-তুমি কি জীবনকে উপভোগ করতে চাইছ?

-হ্যাঁ, কেন?

-তাহলে ওয়েনডি ব্যারির সঙ্গে আর কখনও দেখা করো না ।

-তুমি কে কথা বলছ?

-তুমি কি জানো না, কে তাকে কিনে নিয়েছে?

না, সে কখনও আমাকে তার নাম বলেনি ।

বাগসি সাইগেল ।

এরপর আমি আর কখনও ওয়েনডিকে দেখতে পাইনি ।

দুজন জ্যাকপট স্টার বেরিয়ে গেল । অ্যালান জোস এবং নানেটি ফার্নে । জোস এক বিখ্যাত মভি স্টার । ভারী সুন্দর দেখতে, ছ-ফুটের ওপর লম্বা, সুদেহের অধিকারী, সুন্দর হাসি আছে ঠোঁটে । গলায় গান আছে চমৎকার । তাকে এখনই আইকন বলা যায় ।

নানেট্রি ইতিমধ্যেই দর্শকদের মন জয় করেছে। কুড়ি বছর বয়স হয়নি। শরীরটা খুবই আকর্ষণীয়।

হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারলাম এই উপস্থাপনাটা দাঁড়িয়ে যাবে।

একদিন রিহাসাল হয়ে গেছে। এই নাটকের ডিরেক্টর রয় হারথেন্ড আমাকে বললেন চিত্রনাট্যটা অসাধারণ হয়েছে।

ইওলানডার কথা মনে পড়ে গেল। আমি বললাম- ধন্যবাদ রয়।

আমার এক বন্ধুর কথা মনে পড়ছে। সে এই জাতীয় নাটক উপস্থাপিত করতে চাইছে। তুমি কি তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে?

না, এখন আর সময় কোথায়? আমি আর বেন দু-দুটো নাটকের সংলাপ লিখছি। আমাকে যে কোনো সময় যুদ্ধে যোগ দিতে হবে।

তার নাম রিচার্ড কলমার। সে ডরোথিকে বিয়ে করেছে।

আমি খবরের কাগজের পাতায় ডরোথির নাম দেখেছি। সে এবং কলমার ব্রডওয়েতে এক জনপ্রিয় জুটি।

-ডিক, আমি তার সাথে কবে কথা বলব?

রয় হারথ্রেড একটা ফোন করলেন। ফোন শেষ হয়ে গেল। উনি বললেন- কাল সকাল দশটায়।

রিচার্ড ইতিমধ্যেই অনেকগুলো মঞ্চ সফল নাটক পরিবেশনা করেছেন।

তার সঙ্গে যোগাযোগ হল, তিরিশ বছর বয়স হয়নি। রোগা চেহারা। উদ্দীপনার ছাপ আছে।

তিনি বললেন- রয় তোমার বিষয়ে সবকিছু বলেছে। আমি একটা ফ্যানটাসি মিউজিক্যাল করতে চলেছি। অনেক খরচ করা হবে। সেট সেটিং-এ কোনো কার্পণ্য করা হবে না। এটা হল শোপ অপেরা লেখকের গল্প। যে ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখে, সে সুলতানের কাছে খবর বলবে। না হলে তার মৃত্যু হবে।

-ব্যাপারটা খুব ভালো লাগছে। এই ভূমিকাতে কে অভিনয় করবে?

-ভেরা জোরিনা।

বিখ্যাত ব্যালে নতকী, সে এখন এক ব্রডওয়ে স্টারে পরিণত হয়েছে। জর্জ বালানচিনকে বিয়ে করেছে।

-রোনাল্ড গ্রাহাম তার বিপরীত ভূমিকাতে অবতীর্ণ হবেন। তুমি কি ডরোথির সাথে কোনো শো করেছ?

-না, কিন্তু একজন সাহায্যকারী চাই।

-বেন রবার্টস, কবে থেকে শুরু হবে।

এখন থেকে। ঘুম চলে গেছে চোখের পাতা থেকে। একটার পর একটা কাজ এসে গেছে। এতটুকু সময় পাচ্ছি না।

আমি তখনও আমার ইউনিফর্ম পরে আছি। যে কোনো সময় ফ্লাইটের ট্রেনিং হবে আশায় আছি। তার আগে কতটা সময় পাব?

ঈশ্বর বোধহয় তাকিয়েছেন আমার দিকে।

রিচার্ড কলমারের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর দু-ঘন্টা কেটে গেছে। কাজটা আমি নিয়েছি, ফোন বেজে উঠল।

আমি মেজর বেকার বলছি। কাল সকাল নটায় আপনাকে ক্যাপ্টেন বার্নসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে আর্মি হেড কোয়ার্টারসে।

আমার হৃদয় স্তব্ধ হয়ে গেছে। আমার অবস্থা খুবই খারাপ। আমার হাতে তিন-তিনটে নাটকের সংলাপ। এক রাতের মধ্যে কী করে শেষ করব?

ক্যাপ্টেন বার্নস এক লম্বা চেহারার টাকমাথা মানুষ। ইউনিফর্ম পরে আছেন। তিনি আমার দিকে তাকালেন। আমাকে বসতে বললেন। আমি প্রাথমিক শিক্ষানবিশী শেষ করেছি কিনা জানতে চাইলেন। তারপর বললেন, আপনাকে সেকেন্ডারি ফাইট স্কুলে পাঠানো হবে। এখানে অন্য প্লেন দেওয়া হবে।

-কেন?

যুদ্ধ এখন পাণ্টে গেছে, আমরা রক্ষণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হব। এখন ফাইটার পাইলটদের দরকার। আপনার চোখের দৃষ্টি খুবই ভালো।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। উনি আরও অনেক কথা বললেন। তার মানে, এখন আমাকে সবসময় সৈনিক হতে হবে।

কিন্তু আমি তা পারব কি?

হোটলে ফিরে এলাম। বেনকে ফোন করলাম। বললাম অনেকক্ষণ রাত জেগে কাজ করতে হবে।

-কেন? কী হয়েছে?

দেখা হলে সবকিছু বলব।

বেন আমার সমস্যার কথা মন দিয়ে শুনল। তারপর বলল, চিন্তা করো না। নাটকটা আস্তে আস্তে লিখলেই চলবে।

পরবর্তী তিনদিন আমরা অনেক পরিশ্রম করেছিলাম। একটার পর একটা থিয়েটারে যাচ্ছি। সংলাপটা ঠিক মতো লিখতে হবে।

চতুর্থ দিন, আমি হোটেলে ফিরে এলাম। হোটেল ক্লার্ক আমার হাতে একটা চিঠি তুলে দিল- লেখা আছে- শুভেচ্ছা।

আমি পড়তে শুরু করলাম। চিত্রনাট্যকার হিসেবে আমার নতুন পেশা শুরু হচ্ছে। হ্যাঁ, সংলাপগুলো দারুণ হয়েছে। আমি জানি, আবেগকে এখন আর নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব নয়। আমি আয়নার দিকে তাকালাম, আমার চোখে এত জল কেন? জীবনযুদ্ধে হেরে যাবার যন্ত্রণা? আমি নিজেকেই প্রশ্ন করলাম।

পরের দিন সকাল নটা, আমাকে আর্মি হেডকোয়ার্টারে পৌঁছাতে হল। ক্যালিফোর্নিয়াতে যে পরীক্ষা করা হয়েছিল, তারই পুনরাবৃত্তি। তিরিশ মিনিট ধরে পরীক্ষা চলল। আমাকে ডাক্তারের চেম্বারে দেখা করতে বলা হল।

ভদ্রলোক কতগুলো কাগজের দিকে তাকিয়ে বললেন- আপনার মেডিকেল রিপোর্ট বলছে, আপনার হার্নিয়া আছে।

-হ্যাঁ, স্যার। প্রথম পরীক্ষার সময় আমি এটা বলেছিলাম।

যদি কোনো সময় আপনি হার্নিয়াতে আক্রান্ত হন, তাহলে কী হবে? না আপনাকে আমরা কখনও নির্বাচিত করব না। আপনাকে আমি অযোগ্য বলে লিখে দিলাম। আরও জানাতে হবে, আপনাকে এই সৈন্যদলে আর লাগবে না।

আমি অনেকক্ষণ বসে ছিলাম। এই ঘটনাটা কীভাবে মেনে নেব বুঝতে পারছিলাম না। তারপর চলে যাওয়ার চেষ্টা করলাম।

উনি বললেন- ইউনিফর্মটা খুলে দিয়ে যান।

আমি আবার সাধারণ মানুষে পরিণত হলাম।

কী সব ভাবতে ভাবতে একটা কাপড় জামার দোকানে ঢুকে পড়লাম। দুটো স্যুট কিনলাম, কতগুলো ছোটো প্যান্ট, শার্ট এবং টাই। হ্যাঁ, এবার চিত্রনাট্যকার হিসেবেই আমার সবসময়ের জীবন শুরু হবে।

১৯৪৩ সালের ৪ঠা আগস্ট, দি মেরি উইডো ম্যাজেস্টিস থিয়েটারে শুরু হল। এটা ব্রডওয়ের অন্যতম জনপ্রিয় নাটকে পরিণত হয়।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রকাশিত হচ্ছে

। দ্য নিউইয়র্ক টাইমস মন্তব্য করেছে অসাধারণ উপস্থাপনা।

দ্য হেরাল্ড ট্রিবিউন লিখল শহরের সকলে অবাক হয়ে গেছে।

দ্য মিরর-এ প্রকাশিত হল- অসাধারণ বৈচিত্র্যসম্পন্ন এবং সংগীতবহুল।

দ্য জার্নাল আমেরিকান মন্তব্য করল- একটা কৌতুক পরিপূর্ণ হাসির গল্পকথা।

ওয়াল্টার উইনচেল লিখলেন- আগস্ট মাসেই এর প্রস্ফুটন ঘটে গেছে। দ্য মেরি উইডো সাধারণ মানুষ দারুণভাবে গ্রহণ করেছে।

হ্যাঁ, এবার বোধহয় আমি নাম করতে চলেছি।

.

১৩.

ডরোথিকে এক সৃজনশীল মহিলা বলা যেতে পারে, কৌতুকবোধ আছে মনের মধ্যে। সকলের সাথে মিলেমিশে কাজ করতে ভালোবাসেন।

প্রথমদিকে উনি ছিলেন একজন ক্রাইম রিপোর্টার। তারপর ব্রডওয়ে এবং হলিউডের নামকরা সাংবাদিক হয়ে উঠেন। বিভিন্ন বিষয়ে অন্ততদন্তমূলক লেখালেখিতে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। বিশেষ করে ডঃ শ্যাম শেফার্ডের বিচারের কথা লিখেছেন অকপটভাবে।

ডরোথি এবং বেন একসঙ্গে ড্রিম উইথ মিউজিক-এর চিত্রনাট্য লিখেছিলেন। গাই বোলটন এবং আমি জ্যাকপট-এর চিত্রনাট্য শেষ করলাম। ভিনটন ফ্রিডলে ব্রডওয়েতে। এলেন ওপেনিং শো দেখতে। এভাবেই তখন জীবন এগিয়ে চলেছে।

১৯৪৪ সালের ১৩ই জানুয়ারি। অলভিন থিয়েটারে জ্যাকপট শুরু হল। বেশির ভাগ সমালোচক এটাকে ভালো বলেছিলেন।

আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আমাদের সবথেকে বড় সফলতা আসতে চলেছে।

ড্রিম উইথ মিউজিক-এক অসাধারণ উপস্থাপনা, ভিনটন ফ্রিডলে নন, রিচার্ড কোলমার এই পরিবেশনার অন্তরালে অর্থ সাহায্য করলেন। ব্রডওয়েতে বিস্ফোরণ ঘটে গেল। স্টুয়ার্ট চানি সব কটা সেট সাজিয়েছিলেন। মাইলস হোয়াইট কসটিউমের পরিকল্পনা করেছিলেন। জর্জ বালানচিন ছিলেন ক্যরিওগ্রাফার।

বেন আর আমি সময়টা ভাগ করে নিয়েছি। আমি ডরোথির জন্য চিত্রনাট্য লিখছি। কখনও তার সুন্দর সাজানো অ্যাপার্টমেন্টে পা রাখার অনুমতি পাচ্ছি। বেন এবং আমি রাতের অন্ধকারে কাজ করছি। হোটেলে বসে, বেন তো এখন ফোর্ট ডিস্কে চাকরি পাবে। সেদিকটাও মানিয়ে চলতে হবে।

এক সন্ধ্যাবেলা বেন আর আমি লিখছিলাম। আমি একটা কলম ফেলে দিয়ে সেটা তোলার চেষ্টা করছি। আমার হার্নিয়াটা প্রচণ্ড যন্ত্রণা দিতে শুরু করল। আমি ছটফট করতে থাকলাম। নড়তে চড়তে পারছি না। বেন অ্যাম্বুলেন্সের জন্য ফোন করল। তিনদিনের জন্য আমাকে হাসপাতালে থাকতে হল। অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে। মনটা কেমন যেন হয়ে গেছে।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলাম, আবার কাজ শুরু হল। কাজটা শেষও হয়ে গেল।

ডরোথি, বেন এবং আমি থিয়েটার হলে বসে আছি। রিহাসাল দেখছি। হ্যাঁ, রিহাসাল দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে, আসল পরিবেশনা কেমন হবে। স্টেজে নিত্যনতুন টিউমের ভিড়। অসাধারণ প্রতিচ্ছবি। ভেরার নাচের আসর কি?

এই নাটকটি শুরু হয়েছে ভেরা এবং রোনাল্ডের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে। তারা দুজনেই প্রথম রজনীতে উতরে গেলেন।

মা এবং মাতরি প্রথম দিন নিউইয়র্কে এসেছিল। আমরা প্রথম সারিতে বসেছিলাম। থিয়েটারে অনেক মানুষের সমাবেশ ঘটে গেছে। বেন আর আমি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলাম।

মনে হচ্ছে নাটকটা বোধহয় আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। দিনে দিনে দর্শকদের সমাবেশ আরও বাড়ছে।

ড্রিম উইথ মিউজিক নাটকটির মধ্যে দুটো অঙ্ক এবং তেরোটা দৃশ্য ছিল। প্রথম দৃশ্য শুরু হবার আগে আফ্রিকান-আমেরিকান শো-গার্লদের নাচ প্রদর্শনের ব্যবস্থা হল। এই ব্যাপারটা জনসাধারণের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এটা একটা নতুন উপস্থাপনা। ধীরে ধীরে বাজনার ছন্দ বাড়তে থাকে। ওই স্বল্পবসনা সুন্দরীরা স্টেজ ফ্লোরের ওপর এসে দাঁড়ায় একে একে। দর্শকরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

এটা হল শুরুর কথা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী যেন ঘটে গেল।

এবার ভেরা জোরিনার মঞ্চে আসার পালা। সে হল বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যালে নর্তকী, একবার নাচতে নাচতে সে হঠাৎ পড়ে গিয়েছিল। দর্শকরা শিহরিত হয়ে উঠল। বেন আর আমি সিটে বসে ঘামছি।

দুটো দৃশ্যের পরের কথা। ভেরা আর রোনাল্ড অসাধারণ পোশাকে সুসজ্জিত। তারা সেন্টার স্টেজে এসে দাঁড়াল। এবার একটা প্রেমের দৃশ্য অভিনীত হবে। হালকা চাঁদের আলো। প্রেক্ষাপটে আরণ্যক পটভূমি। বেন এবং আমি যেসব সুন্দর শব্দ লিখেছিলাম, সেগুলো এবার উচ্চারিত হবে। শেষ পর্যন্ত দৃশ্যটা ভালোভাবে উতরে গেল। জনগণ স্তব্ধ হয়ে সবকিছু শুনছে।

হঠাৎ আলোটা নিভে অন্ধকার হয়ে গেল। ঘুরঘুটি অন্ধকার। জোরিনা এবং গ্রাহাম স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কী করবে বুঝতে পারছে না। তারা সংলাপ বলে যাবার চেষ্টা করল। একটু বাদে থেমে গেল। অনেকক্ষণ বাদে আলো ফিরে এল।

ফ্ল্যাশলাইটের আলো, দুজন প্রেমিক-প্রেমিকার মাথার ওপর আলো ধরা হল। বুঝতে পারা গেল, একটা অসাধারণ দৃশ্যপটের সৃষ্টি হয়েছে।

এটা হল ব্রডওয়ের ইতিহাসে সবথেকে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। আমরা শান্তভাবে একটা রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করলাম। জানি, সমালোচনার বিষতীর আমাদের বিদ্ধ করবে।

কোনো কোনো সমালোচক অবশ্য সহানুভূতির দৃষ্টিতে সব কিছু বিচার করার চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের উদ্যমের প্রশংসাও করা হয়েছিল। মনটা ভীষণ দমে গেল। এই ধরনের বিপর্যয় আমরা কেউই আশা করিনি।

ড্রিম উইথ মিউজিক অভিনয় শেষ হয়ে গেছে। এক ভদ্রলোকের ফোন পেলাম। উচ্চারণের ভেতর হাঙ্গেরিয় ছাপ আছে। তিনি নিজেকে লাডিসলাস নামে পরিচয় দিলেন। জর্জ হ্যালি নাকি আমাকে ফোন করতে বলেছেন।

জর্জ হ্যালি হলিউডের এক বিখ্যাত লেখক। আমি জানতে চাইলাম- কী করব আপনার জন্য?

-আমরা কি একসঙ্গে লাঞ্চ খেতে পারি?

আমি ফোনটা বুলিয়ে রেখে জর্জ হ্যালির সঙ্গে কথা বললাম, ভদ্রলোকের পরিচয় জেনে নেবার চেষ্টা করলাম।

জর্জ হেসে বললেন- উনি এক বিখ্যাত হাঙ্গেরিয় চিত্র নাট্যকার। ইওরোপে ওনার যথেষ্ট নাম আছে। সেখানে অনেকগুলো হিট ছবির লেখক।

উনি আমার সঙ্গে কী করতে চাইছেন?

-তোমার জন্য একটা ভালো প্রস্তাব আছে। উনি এমন একজনকে খুঁজছেন, যিনি ইংরাজি বলতে পারেন, তুমি দেখা করো। কোনো অসুবিধা হবে না।

আমার হোটেলে লাঞ্চের আয়োজন। ভদ্রলোককে দেখে মনে হল কর্মক্ষম। খুব একটা লম্বা নয়, পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি হবে। তিনশো পাউন্ডের নীচে ওজন। তবে শরীরের মধ্যে একটা আকর্ষণী ছাপ আছে।

ওর সাথে বাদামী চুলের এক মহিলাকে দেখলাম, উনি পরিচয় করিয়ে দিলেন আমার স্ত্রী মারিকা।

আমরা হাতে হাত রাখলাম। আমরা বসলাম। উনি বললেন- আমরা দুজনেই একই পথের পথিক। ইওরোপে আমরা অনেক কিছু করেছি।

আমি জানি, লাডিসলাস আমাকে সবকিছু বলেছেন।

-মারিকা আর আমি ভবিষ্যৎ নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চাইছি। আপনি কি আমাদের জন্য নাটক লিখবেন?

কী ধরনের নাটক?

-এটা এমন একজন সৈনিকের গল্প, যুদ্ধের শেষে তিনি তার ছোট্ট শহরে ফিরে এসেছেন। প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করেছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেছে। রণক্ষেত্রে ওই যুবক অন্য মেয়েকে ভালোবেসেছেন।

ব্যাপারটা খুব একটা উত্তেজক কী? আমি মনে মনে বললাম। মুখে বললাম আমি দুঃখিত। এখন খুব ব্যস্ত আছি।

সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এখানে মূল চরিত্রে অভিনয় করবে একজন মহিলা, অর্থাৎ আমরা, একজন মহিলা সৈনিকের কথা বলব।

আশ্চর্য, এটা একটা নতুন উপস্থাপনা, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ওই মেয়েটির সামনে এখন মস্তবড়ো সমস্যা। প্রাক্তন প্রেমিক অথবা ওই সৈনিক, কাকে সে মন দেবে?

মারিকা জিজ্ঞাসা করলেন- আপনি কি কাজটা করবেন?

-হা, আমি আগ্রহী, কিন্তু আমার একজন সহকারী আছে। লাডিসলাস আমার দিকে তাকিয়ে বললেন-ঠিক আছে। আমরা তাকেও না হয় পারিশ্রমিক দেব।

আমি সেদিন বিকেলে বেনকে ডেকে সব কথা বললাম।

বেন বলল আমার সাহায্য ছাড়া তুমি এটা করতে পারবে। এখন অনেকটা সময় অফিসের কাজে চলে যাচ্ছে।

-তুমি থাকবে না?

-হ্যাঁ, হয়তো কিছুদিন। আশা করি, এই কাজটা ভালো ভাবেই উতরে যাবে।

লাসি অর্থাৎ ওই হাঙ্গেরিয় ভদ্রলোক এবং মারিকা আমার উল্টোদিকে বসলেন। কাজটা শুরু হল। লাসির কথা বোঝা খুবই শক্ত। মারিকা মোটামুটি ভালো ইংরাজি বলতে পারেন। এই নাটকটার নাম দেওয়া হল স্টার ইন দ্য উইনডো।

চারমাসে সংলাপ লেখা শেষ হল। আমার এজেন্ট একটা প্রযোজক দলকে এই নাটকটা দেখাল। তারা এটা উপস্থাপন করার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছে। ঠিক করা হল, জোসেফ এই নাটকটি পরিচালনা করবেন। কে কোন ভূমিকাতে অবতীর্ণ হবেন, তা নিয়ে হিসাব-নিকাশ শুরু হল।

পেগি, ব্রডওয়ের এক বিখ্যাত অভিনেত্রীকে ওই মহিলার চরিত্রটা দেওয়া হবে। আমরা অনেক পুরুষের পরীক্ষা নিলাম। কিন্তু কে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন, তা ঠিক করা সম্ভব হল না। একদিন আমার এজেন্ট এক তরুণ অভিনেতার ছবি নিয়ে এল।

হয়তো তাকেই আমরা নির্বাচিত করব।

সে স্ক্রিপ্টটা পড়তে শুরু করল। অবশেষে সেই উত্তেজক মুহূর্ত। ভালোভাবেই মুখের অভিব্যক্তি দেখিয়ে ছিল সেই ছেলেটি। তার অভিনয় ক্ষমতা দেখে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছি। সে হল কির্ক ডগলাস।

রিহাসাল শুরু হল। পেগি এবং কির্ক এক অসাধারণ যুগলে পরিণত হয়েছে। রিহাসাল শেষ হল। আমরা এবার নাটক উপস্থাপন করব। ওয়াশিংটনে আমাদের কাজ শুরু হবে। সমালোচনার ঝড় বয়ে গেল। বেশির ভাগ সমালোচক প্রশংসা করেছেন।

আমার মনে আনন্দ, ড্রিম উইথ মিউজিকের মতো বিপর্যয় এখানে হয়নি। তা হলে? ব্রডওয়েতে বোধহয় আমি পায়ের তলায় শক্ত জমির সন্ধান করতে পারলাম।

১৯৪৫ সালের ৩১ জানুয়ারি, ব্রডওয়েতে এই ছবির প্রথম অভিনয়। ইতিমধ্যেই নামটা পাল্টে রাখা হয়েছে এলিস ইন আর্মস। প্রথম দিন অভিনয়ের শেষে আমরা সার্ডিতে গেলাম, সমালোচনার ব্যাপারটা বোঝার জন্য। তাছাড়া একটু আনন্দ অনুষ্ঠান করতে হবে বৈকি।

বেশির ভাগ সমালোচক তীক্ষ্ণভাবে নাটকটাকে আক্রমণ করেছেন। অনেকে বলেছেন, এটি এক দুর্বল উপস্থাপনা। অবশ্য কেউ কেউ এর অন্তরালের সৃজনীসত্তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

হা, হয়তো সমালোচকরা ঠিকই বলেছেন। ব্রডওয়ের জন্য নাটক লিখতে গেলে আরও বেশি অনুভবী হওয়া দরকার। আরও মসৃণ চিন্তাভাবনা করতে হবে।

কী ঘটছে, আমি তা বুঝতে পারছি। তার মানে? এমন হতে থাকলে বাকি জীবনটা হোটেল ঘরে বসে দুঃখ জানাতে হবে। আমি ঠিক করলাম হলিউডে ফিরে যাব। সেখানে আমি আবার মৌলিক লেখায় মন দেব। সেটা বিক্রির চেষ্টা করব। হয়তো একটু অনিশ্চয়তা আছে! সবশেষে আছে সৃজনশীলতার আনন্দ।

পরের দিন সকালবেলা আমি কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসলাম। হ্যাঁ, একটা ভালো কিছু লিখতে হবে।

তিরিশ পাতার একটি সারাংশ। নাম দিলাম সাডেনলি ইট স্প্রিং । এটা হলিউডের জন্য তৈরি করেছি।

লস এঞ্জেলসে যাবার পথে চিকাগোতে থামলাম। মা এবং মারতির সঙ্গে দেখা করতে হবে।

মা আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল— এই হল আমার লেখক ছেলে।

আমি এলিস ইন আর্মস এর সমালোচনার কথা বললাম, না বললে মা হয়তো দুঃখ পাবে।

কিন্তু মা সব কথা জেনে গেছে। মা বলল নাটকের নাম পরিবর্তন করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি।

আমি চিকাগোতে কদিন ছিলাম। মাসিদের সঙ্গে দেখা করলাম। ফ্রান, এমা আর পাউলিন তারা ডেনভার থেকে এসেছিল। তারা আমাকে পেয়ে খুবই গৌরব বোধ করেছে।

একজন বলল- ব্রডওয়েতে ড্রিমস উইথ মিউজিক এবং এলিস ইন আর্মস -এর মতো সাফল্য অন্য কোনো নাটক পায়নি।

সব শুনে লজ্জায় আমার মাথা হেট হয়ে গেল। পরিচিত প্রিয়জনরা আমায় কত ভালোবাসে।

এবার বিদায় জানানোর পালা। আমি তখন উড়ান পাখির সওয়ার হয়ে হলিউডের দিকে চলেছি।

এই হল সেই হলিউড। এখন আমার কী পরিচয়? আমি মিলিটারী থেকে বহিষ্কৃত হয়েছি। দুটো ব্রডওয়ে হিটসের রচয়িতা, পাশাপাশি দুটো ফ্লপও আমার নামের পাশে জ্বলছে।

সময় এগিয়ে চলেছে। সৌভাগ্য বলতে হবে। জ্যাকপট-এর এক অভিনেত্রী বেভারলি হিলসে একটা ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট রেখেছিল। সে ওই অ্যাপার্টমেন্টটা আমাকে ভাড়া দিতে রাজী হল। এটা পাম ড্রাইভে অবস্থিত। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটা অল্পবয়সী ছেলে দরজাটা খুলে দিল। তার নাম বিল। সে জানত, আমি সেখানে যাব।

আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম। ছোট্ট সাজানো অ্যাপার্টমেন্ট, একটা শোবার ঘর, ছোট্ট লিভিং রুম আর একটা কিচেনেট।

এবার এখানেই শুরু হবে আমার সংগ্রাম।

এবার আমি কোথায় যাব? কামেল স্ট্রিটে গিয়ে থ্রেসির সঙ্গে দেখা করতে হবে। সব কিছুই একরকম আছে, মুখখানা একটু পাল্টে গেছে। হ্যাঁ, নতুন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছেলের দল বোর্ডিং-এ ভিড় করেছে। আগামী দিনের তারকা, পরিচালক অপেক্ষা করে আছেন কান্নিতে টেলিফোন কলের জন্য।

থ্রেসি এতটুকু পাল্টাননি। এখনও একই রকম চেহারা বজায় রেখেছেন। সকলকেই উপদেশ দিচ্ছেন, যন্ত্রণা উপশমের চেষ্টা করছেন।

আমাকে দেখে এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন- তুমি এখন কত বিখ্যাত হয়ে উঠেছ।

আমি জানি না এই বিশেষণটা আমি পেতে পারি কিনা।

-হা কোনো রকম চলে যাচ্ছে।

অতীতের স্মৃতিচারণ করে বেশ কয়েক ঘন্টা কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত আমি চলে এলাম, এজেন্টের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

উইলিয়াম মরিস এজেন্সির সঙ্গে একটা চুক্তি হল। এটি হলিউডের অন্যতম সেরা এজেন্সি। স্যামি নামে এক অল্পবয়সী ভদ্রলোক এটি পরিচালনা করে থাকেন। তিনি আমাকে আরও কয়েকজন এজেন্টের সাথে কথা বলিয়ে দিলেন।

তাদের মধ্যে একজন হাইড, তিনি বললেন- আপনার কথা অনেক শুনেছি। আমরা একসঙ্গে কিছু উত্তেজক কাজ করতে পারব।

ডোনা হলওয়ের সঙ্গে দেখা হল। লম্বা, পাতলা চেহারা, চোখের তারা ধূসর কিন্তু বুদ্ধির ছাপ আছে। তিনি আমার হাতে হাত রেখে বললেন-হ্যালো মিঃ সেলডন, আপনি আমাদের সঙ্গে কাজ করবেন ভেবে মনে আনন্দ জাগছে।

-হ্যাঁ, এই এজেন্সিটা আমার ভালো লাগল। আমি বললাম, আমি মৌলিক গল্প নিয়ে এসেছি, সেগুলো দেখাতে চাইছি।

স্যামি বললেন- এখন থেকেই কি কাজ শুরু হবে? আমাদের ক্লায়েন্টদের তালিকায় এডি ক্যান্টর আছেন, একটা সমস্যা হল, স্ক্রিপ্টটা কেমন তা না দেখে কিছুই বলা যাবে না।

তারপর? নতুন অভিযান শুরু হল।

১৪.

এডি ক্যান্টর গোটা দুয়েক মুভির পরিচালক। আমাদের দেশের অন্যতম সেরা হাস্যকৌতুক শিল্পী। ব্রডওয়েতে একাধিকবার তার মুখ দেখা গেছে। নিজস্ব টেলিভিশন শো আছে, সেটা অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

আমি রক্সবারিতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। বেভারলি হিলসে তার বাড়িটি অবস্থিত। খর্বাকৃতি মানুষ, সব সময় স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসেন। কথা বলতে বলতে আসছেন। শুনছেন, তখনও হাসছেন।

সিডনি, এই হল অবস্থা, আর কে ও অনেকগুলো স্ক্রিপ্ট বাতিল করেছে। আমি রেডিও রাইটার্সের কথা বলতে পারি, আমি এখন খুবই ব্যস্ত, এমন একটা স্ক্রিপ্ট দরকার যা তিন-চার মাস ধরে দর্শকদের মন ভরিয়ে রাখবে। এমন কিছু ব্লকবাস্টার গল্প কি আছে আপনার কাছে?

-আমি চেষ্টা করে দেখব।

-ঠিক আছে, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি, প্রথম খসড়াটা হয়ে গেলে আমাকে দেখাবেন। যদি অনুমতি পাওয়া যায় তাহলে বাজিমাৎ করব। আর পয়সা কড়ি? এ ব্যাপারে আপনাকে বঞ্চিত করা হবে না। সপ্তাহে আটদিন কাজ করতে হবে একথা যেন মনে থাকে।

আমি বুঝতে পারলাম, এখানে সবকিছু খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে।

টেলিফোনটা বেজে উঠল, উনি বললেন- আমি এডি ক্যান্টর বলছি।

এইভাবে আবার একটি কর্মব্যস্ত দিন শুরু হল।

আমরা একসঙ্গে কাজ করতে শুরু করলাম। এমন একটা নাটক, যেখানে এডি এবং জোয়ান ডেভিস প্রধান ভূমিকাতে অবতীর্ণ হবেন। লেখাটা শুরু হল, আমি এডির বাড়িতে বসে লিখতাম। সকাল থেকেই কাজটা শুরু হত। বিকেল সাতটা পর্যন্ত লিখতাম। শনিবার এবং রোববারেও ছুটি নিতাম না।

তারপর অখণ্ড অবসর। আমার সাথে এক সুন্দরী মহিলার দেখা হল, আমরা একসঙ্গে ডিনারের আসরে উপস্থিত হলাম।

আমি জানতে চেয়েছিলাম- সন্ধ্যাবেলা তুমি কী করো?

সিডনি, আমাকে অন্য কারোর সাথে থাকতে হয়। আমি তোমাদের দুজনকেই খুব ভালোবাসি, এখন মন ঠিক করতে পারছি না।

-সেই লোকটি কে?

-তার নাম যোসে, সে আমাকে বিয়ে করতে চায়। সে এক বিখ্যাত পিয়ানোবাদক। সারা পৃথিবীতে কনসার্ট করে বেড়ায়। এম জি এমের সাথেও তার ভালো যোগাযোগ আছে, প্যারামাউন্ট এবং ফক্সেও সে বাজায়।

না, তার সাথে লড়াইতে আমি নিশ্চয়ই হেরে যাব।

.

মেয়েটি আমাকে বলেছিল- তুমি নাকি এক কোকাকোলা, যোসে আমাকে বলেছে।

-তার মানে?

-তোমার মতো অনেক মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে, তোমার আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।

সেই মেয়েটির সাথে আমার আর কখনও দেখা হয়নি।

এডি ক্যান্টর এবার আর কে ও-র সঙ্গে একটা চুক্তি করতে চলেছে। আমি আমার চিত্রনাট্যটা তুলে দিয়েছি। সেটা আর কে ও-তে পাঠানো হবে।

একদিন স্যামি আমাকে বলল- সিডনি, মনে হচ্ছে তোমাকে বোধহয় বাদ দেওয়া হবে।

.

আমি বললাম- কেন?

ক্যান্টর তার রেডিও লেখকদের নিয়ে এসেছেন।

সে কী? এত পরিশ্রম সব ব্যর্থ হল?

এভাবেই হলিউড আমাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়েছিল।

১৯৪৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে জাপানীরা আত্মসমর্পণ করে। রিচার্ড বাড়িতে ফিরে আসে। আমি তাকে দেখার জন্য ছটফট করছি।

বড়োদিনের আগের দিন অর্থাৎ ২৪শে সেপ্টেম্বর, রিচার্ডের জাহাজ সান ফ্রানসিসকোতে এসে গেছে। আমরা লস এঞ্জেলসে একসঙ্গে ডিনার সারলাম। মন এবং শরীরের দিক থেকে সে সম্পূর্ণ সুস্থ আছে! কী ঘটেছে তা জানতে আমার মন আগ্রহী হয়ে উঠেছে, সে কোথায় কোথায় গেছে? নিউ গুমিয়া থেকে মোরাসাই, লুজন।

ব্যাপারটা কেমন?

আমার ভাই আমার দিকে তাকিয়ে বলল- এটা নিয়ে কখনও আলোচনা করা উচিত নয়।

আমি বুঝতে পারলাম একাকীত্বের যন্ত্রণা তাকে কুরে কুরে খেয়েছে।

সে আবার বলল- ম্যারি আমার জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছে। আমি সেই চাকরিটা নেব। তাহলে মায়ের সঙ্গে বেশির ভাগ সময় কাটাতে পারব।

আমার মনে আনন্দ। আমি জানি ম্যারি তাকে সাহায্য করবে।

স্যাম আমাকে পরের দিন ডেকে বলল সাডেনলি ইট স স্প্রিং -এর দুটো খবর আছে।

আমি বললাম- দারুণ, কোথা থেকে এসেছে?

-একটা এসেছে ওয়ালটার ওয়াগনার থেকে, তারা অনেকগুলো মঞ্চসফল নাটকের প্রযোজক।

-আরেকটা।

-ডেভিড স্লেজডনিক।

আমার হৃৎস্পন্দন শুরু হয়ে গেছে। ডেভিড স্লেজডনিক সত্যি?

হ্যাঁ, উনি তোমার ছোট ছোট ঘাত-প্রতিঘাতগুলোকে ভালো বলেছেন। হয়তো এখানেই ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে।

আমি টাকার কথা খুব একটা চিন্তা করছি না, আমি শুনেছি উনি নাকি এই ধরনের লেখার জন্য পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার দিয়ে থাকেন।

আমি ভাবছি ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে কাজ করতে পারলে কত বিখ্যাত হয়ে উঠতে পারব।

তাহলে? কার বিষয়টা আগে ভাবা যায়? অবশ্যই ডেভিডের। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

পরের দিন সকালে আমি ডেভিড এবং ডোরের সঙ্গে কথা বললাম। ডেভিড এক লম্বা ভদ্রলোক, চেহারার মধ্যে ব্যক্তিত্ব আছে। বিরাট ডেস্কের উল্টোদিকে বসে ছিলেন। সাজানো অফিস। ডোরে এক কালো চেহারার মানুষ। তার চোখে মুখে দীপ্ত বুদ্ধির ছাপ। আমরা হাতে হাত রাখলাম।

ডেভিড বললেন- সেলডন, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমি খুবই খুশি।

এর আগে কতবার আমি চেষ্টা করেছি, প্রতিবারই আমাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হত।

উনি বললেন- আপনার গল্পটা অসাধারণ, আমার মনে হচ্ছে এটা দর্শকদের উদ্বলিত করবে।

ডোরে বললেন- হা, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

ডেভিড আমার দিকে তাকিয়ে বললেন- ওয়াগনার থেকে আপনি একটা সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু আপনার এজেন্টদের সঙ্গে কথা বলে মনে হল এখানেই ব্যাপারটা ভালো হবে।

হয়তো এটাই আমার ভাগ্যরেখা, আমি ভাবলাম।

কাজ করতে শুরু করলাম, আর কে ও স্টুডিওতে। সাডেনলি ইটস স্প্রিং, তখন ধীরে ধীরে তার আসল রূপ ধরছে। এখন আর কে ও মঞ্চসফল একটা নাটক দেখাচ্ছে, তা হল ইটস আ ওয়াভারফুল লাইফ । এর পাশাপাশি দি ফারমার্স ডটার ও দেখানো হচ্ছে।

এই চিত্রনাট্যটা লিখতে আমার খুবই ভালো লেগেছিল। এমন একটা গল্প যাতে উচ্ছন্নে যাওয়া এক প্লেবয় চরিত্র আছে, অল্পবয়সী একটি মেয়ে এবং তার বোন। একজন বিচারককেও আনা হয়েছে।

আমি ভাবলাম, এই চিত্রনাট্যটা দর্শকদের দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ করবে। আমি জানি ডেভিড এটাকে পাল্টে দেবেন। কীভাবে দর্শকদের সামনে তুলে ধরবেন।

লেখা এগিয়ে চলল। মাঝে মধ্যে মনে আবেগের সঞ্চালন, কখনও অভিমানের অনুভূতি। একটানা লিখে চলেছি, ক্লান্তি আসছে না। মাঝে মধ্যে রেস্টুরেন্টে যাচ্ছি। একদিন এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল, সে তার বান্ধবীকে নিয়ে খাচ্ছিল। তার নাম ব্রাউন ডার্বি। সে বলল সিডনি, জ্যানের সঙ্গে আলাপ করো।

জ্যানে নিউইয়র্ক থেকে এসেছে, ভারি আমুদে চেহারার ছটফটে স্বভাবের মেয়েটি। টগবগ করে ফুটছে। তাকে দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তাই হল। আমরা একে অন্যের প্রেমে পড়ে গেলাম। দু-মাস ঘোরাফেরার পর আমরা বিয়ে করলাম।

হনিমুনের সময় কোথায়? সাডেনলি ইটস স্প্রিং নিয়ে তখন খুবই ব্যস্ত।

একমাসের পর আমরা বুঝতে পারলাম জ্যানে আর আমি দুই ভিন্ন পৃথিবীর বাসিন্দা। আমাদের ভালো লাগা বিষয়গুলির মধ্যে কোনো মিল নেই। পরবর্তী ন-মাস আমরা বিয়েটাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছিলাম। শেষ পর্যন্ত দেখলাম এটা এক অসম্ভব কাজ, তখন বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য দুজনেই রাজী হলাম। একটা অব্যক্ত ব্যথা আমাকে আক্রান্ত করল। যেদিন ডিভোর্সটা হয়ে গেল, আমি জীবনে প্রথমবারের মতো মাতাল হয়েছিলাম।

বাড়ির এই অবস্থা, স্টুডিওর অবস্থা মোটামুটি ভালো। চিত্রনাট্য লেখা শেষ হয়েছে।

ডেভিড আমাকে তার অফিসে ডেকে বললেন- আপনার স্ক্রিপ্টটা আমরা ক্যারি গ্রান্টের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।

-উনি কী বললেন?

উনি বললেন এটা উপস্থাপনা করার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

আমার মনে আনন্দ, খবরটা সাংঘাতিক।

-আমরা সারলি টেমপল এবং মেরনা ল-এর সাথে চুক্তি করেছি।

-আহা অসাধারণ ভূমিকা নির্বাচন।

আরভিং রেইস এই নাটকটা পরিচালনা করবেন, ক্যারি গ্রান্ট আপনার সাথে কথা বলতে চেয়েছেন।

কমেডি চরিত্রে ক্যারির নাম সকলেরই প্রথম পছন্দ। এখানে কোনো দ্বিতীয় বিবেচনা চলতে পারে না। ক্যারিকে না পাওয়া গেলে অন্য কারোর নাম মনে করা যেতে পারে।

ক্যারির আচরণ আমার ভালো লাগে। ভারী সুন্দর চেহারা তাঁর, বুদ্ধির ছাপ আছে, মনটা সদা চঞ্চল। অন্য নক্ষত্রদের মতো নিজেকে ঘেরাটোপের মধ্যে বন্দী রাখেন না।

ক্যারির জন্ম হয়েছিল এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে। ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহরে। সার্কাসে জীবনের সূত্রপাত হয়।

তারপর ধীরে ধীরে জীবনের ধারা পাণ্টে যায়। ক্যারি থ্রান্ট নিজেই এখন এক কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছেন।

একবার তিনি বলেছিলেন- সকলেই ক্যারি থ্রান্ট হতে চায়, কিন্তু এই হওয়ার অন্ত রালে কত দুঃখ যন্ত্রণা আছে, সেটা কি কেউ বোঝে?

সারলি টেম্পলের সাথে দেখা হল, আঠারো বছরের এক উদ্ভিন্ন যৌবনা, ছোটোবেলা থেকেই সে মোশান পিকচার জগতের সাথে যুক্ত। তার ছবি অনেক টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এত নাম আছে, কিন্তু আচরণের মধ্যে অহংকারের ছাপ নেই।

মেরনা ল এক প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী, সে দ্য থিন ম্যান সিরিজ-এ অভিনয় করেছে।

এই কাস্টিং দেখে আমি খুবই উদ্দীপ্ত।

ক্যারি এবং আমি মাঝে মধ্যেই লাঞ্চার আসারে গিয়ে বসি। ক্যারির সাথে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়।

ক্যারি গ্রান্ট আমাকে অবাক করে দেয়। কীভাবে জনগণকে আকর্ষণ করা যেতে পারে, সেই মন্ত্র সে সযত্নে শিখেছে।

একদিন ক্যারি ডোরেকে ফোন করলেন। ক্যারি এবং আমার লাঞ্চ খাওয়া শেষ হল, এবার ডোরের সাথে কথা বলতে হবে।

ক্যারির দিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পারলাম, এ ব্যাপারে তিনি খুবই আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। হ্যাঁ, ব্যারিকে দেখে অনেক কিছু শেখার আছে।

আমরা সাউন্ড স্টেজে পৌঁছে গেলাম, আরভিং রেইস বললেন- সবাই নিশ্চুপ হয়ে থাকবেন।

বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, সকলেই তাকিয়ে আছেন।

আরভিং বললেন- ক্যামেরা, তারপর বললেন- আকসান।

আমি অনেকক্ষণ ওদিকে তাকিয়ে ছিলাম। এটা হল আমার স্বপ্ন সফলতার আট কাহিনী।

একদিন ডেভিড আমাকে অফিসে ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন- এখন ন্যাশনাল ব্রাদারহুড সপ্তাহ পালিত হবে। সব ধর্মকে একীভূত করার জন্য ছোটো ছোটো সিনেমা তৈরি হবে।

আমি জানতাম, কিন্তু এ ধরনের চিত্রনাট্য লেখবার কোনো অভিজ্ঞতা আমার ছিল না।

আমি ভাবলাম কী বিষয়ে লেখা যায়।

উনি বললেন- অনেক বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেকের জন্য মাত্র দু-মিনিট করে সময় ধার্য করা হয়েছে।

পরের দিন আমি একটা দু-পাতার পাণ্ডুলিপি তুলে দিলাম ডেভিডের হাতে। ডেভিড পড়তে শুরু করলেন। ভ্যান জনসনের কাছে নিয়ে যেতে হবে। তিনি পাশের বাংলোতে থাকেন।

আমি ওটা নিয়ে ভ্যানের সাথে দেখা করলাম। আমাকে দেখে তিনি দরজা খুলে দিলেন। আমি পরিচয় দিলাম, ভ্যান তখন এম জি এমের অন্যতম বড় তারকা।

আমি বললাম- এখানে দুটো পাতা আছে, খুব তাড়াতাড়ি গুটিং শুরু হবে।

উনি বললেন- ধন্যবাদ, গত রাতে একটা সাংঘাতিক স্বপ্ন দেখলাম।

কী স্বপ্ন?

–মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ার থেকে এক মস্তবড় তারকা নেমে আসছে। কিন্তু সংলাপ পাল্টে দেওয়া হচ্ছে, স্বভাবতই সে খুব ভয় পেয়ে গেছে। তখনই আমার ঘুম ভেঙে যায়।

আমি হাসলাম না, অহেতুক চিন্তা করবেন না, আপনার মুখের সংলাপ কিন্তু পাল্টানো হবে না।

উনি হাসলেন, তারপর বললেন– কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি তৈরি হয়ে আসছি।

আমি সেলজনিকের অফিসে ফিরে এলাম।

সব কিছু ঠিক আছে।

ডেভিড বললেন– ভ্যানের সংলাপ পাল্টাতে হবে।

–ডেভিড, আমি এইমাত্র ওনার সাথে কথা বলে এসেছি। গতরাতে উনি ঘুমোত পারেননি, উনি এই একই আশংকা করছিলেন।

যা হবার হোক, এইভাবে শব্দ পাল্টাতেই হবে।

উনি আমাকে নতুন নির্দেশনা দিলেন। আমি অত্যন্ত দ্রুত অফিসে চলে এলাম, নতুন করে চিত্রনাট্যটা লিখে আবার ডেভিডকে দেখালাম।

উনি বললেন ঠিক হয়েছে।

দি আদার সাইড থা মাঁ । সিডনি জেলডন

আমি ভ্যান জনসনের বাংলোতে ছুটে গেলাম, দরজা খুলে দিলেন উনি।

-আমি তৈরি।

-ভ্যান, সামান্য পরিবর্তন হয়েছে, ডেভিড মনে করছেন এটা আরও ভালো।

আমি নতুন পাতাগুলো ওনার হাতে তুলে দিলাম। ওনার মুখ সাদা হয়ে গেছে।

-সিডনি ওই স্বপ্নটা তাহলে সত্যি হল?

মাত্র দুটো কথা, আশা করি আপনার অসুবিধা হবে না।

উনি বললেন- ঠিক আছে।

আমি ডেভিডের অফিসে ফিরে গেলাম।

উনি বললেন- না, আরেকটু পাল্টানো দরকার, এইভাবে সংলাপ পালেট দিতে হবে।

এইবার আমার চিৎকার করার পালা- ডেভিড, উনি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন। এইভাবে বার বার শব্দ পাল্টালে ব্যাপারটা মারাত্মক হয়ে উঠবে।

-উনি তো একজন অভিনেতা, তাই তো? তাহলে কেন উনি আপোস করবেন না।

অনিচ্ছুকভাবে আমি আমার অফিসে গিয়ে আবার নতুন করে লিখলাম।

ভ্যান জনসনের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াটা খুব খারাপ অভিজ্ঞতা।

আমি আবার বাংলোতে গেলাম, উনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন- কী? আবার কি শব্দ পাঁটাছেন নাকি?

-ভ্যান, মাত্র দুটো শব্দ। আমি কথা দিচ্ছি শেষবারের মতো, আর আপনাকে বিরক্ত করব না।

-দেখি আমার জন্য কী লিখে এনেছেন?

শেষ পর্যন্ত আমি তাকে শান্ত করে বলেছিলাম- সেটে আসুন, তখন আলোচনা হবে।

আমি ডেভিডের অফিসে যাইনি, ডেভিডের সাথে বোঝাপড়া শেষ হয়েছে।

পরের দিন রিচার্ডের ফোন পেলাম। রিচার্ড জানিয়েছে, সে এখন বিয়ে করতে চলেছে।

আমার মনে উত্তেজনা, কে এই মেয়েটি?

-জোয়ান, জোয়ান এবং রিচার্ড শিকাগোতে একসঙ্গে স্কুলে পড়ত।

কবে বিয়েটা হবে?

-তিন সপ্তাহ পরে।

দ্বিতীয় সাইড থ্রু ম্যাঁ । সিডনি জেলডন

-তখন তো আমি দেশের বাইরে থাকব, একটা ছবির শুটিং-এর জন্য।

-ঠিক আছে, পরে যখন তুমি এখানে ফিরে আসবে তখন না হয় ওর সঙ্গে দেখা হবে।
আমরা তোমার ওখানে বেড়াতে যাব।

রিচার্ড এবং তার বউ লস এঞ্জেলসে এসেছিল একমাস পরে। তারা একে অন্যকে ভীষণ ভালোবাসে। আমরা ঘটনা সম্পৃক্ত একটি সপ্তাহ কাটিয়ে ছিলাম। তারপর ওরা চিকাগোতে ফিরে গেল।

পরের দিন সকালে আমি অফিসে এলাম। সেক্রেটারী বললেন মি. ডেভিড, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।

ডেভিড বললেন- সিডনি, কয়েকটা শুভ সংবাদ আছে।

কী?

-আমি এই ছবিটার নাম পাল্টে দিচ্ছি। আমরা একে আর সাডেনলি ইটস স্প্রিং নামে আর ডাকব না।

-তা হলে? কী নাম হবে?

-দ্য ব্যাচিলার অ্যান্ড দ্য ববি স্কয়ার।

আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। উনি কি মজা করছেন?

-ডেভিড, কেউ পয়সা দিয়ে এমন একটা ছবি দেখতে আসবে কি?

শেষ পর্যন্ত আমার অনুমানটা মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

.

১৫.

দ্যা ব্যাচিলার অ্যান্ড দ্যা ববি স্ক্রার ছ-হাজার সিটযুক্ত রেডিও সিটি মিউজিক হলে প্রদর্শিত হল। পৃথিবীর সবথেকে বড়ো মুভি থিয়েটার। পাঁচ সপ্তাহ ধরে এটি নিয়মিত অভিনীত হতে থাকে। থিয়েটার জগতের ইতিহাসে এত বড়ো সফলতা অন্য কোনো থিয়েটার পায়নি। ইংল্যান্ডে তখনও পর্যন্ত এটা দ্বিতীয় স্থানে ছিল। সামনে ছিল শুধু গন উইথ দ্য উইন্ড।

সমালোচকরা প্রশংসা বাক্যে ভরিয়ে দিয়েছিলেন।

এই নাটকের সব থেকে বড়ো সম্পদ এর কুশিলবরা। এজন্য পরিচালক নিজেই ছিলেন আনন্দিত এই মুভিটা বক্স অফিসে ব্লু রিবন অ্যাওয়ার্ড পেল। অস্কারের জন্য মনোনীত করা হল। আমি জানি না, কীভাবে এই আনন্দ উপভোগ করব। হলিউডের সিঁড়ি এবার আকাশ অভিসারী হয়ে উঠেছে।

আর একটা স্ক্রিপ্ট লিখতে হল- অর্কিডস ফর ভার্জিনিয়া। এ-ডি, আর কেওর একজন পরিচালক এটি পছন্দ করলেন।

এর জন্য আমাকে পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছিল।

এক সপ্তাহ কেটে গেছে। ডোরেকে এগজিকিউটিভ প্রোডিউসারের পদে বসানো হল।
তিনি হলেন আর কে ও-র প্রধান প্রোডাকসন ম্যানেজার।

উনি একদিন তার অফিসে আমাকে ডেকে পাঠালেন। অর্চিডস ফর ভার্জিনিয়ার জন্য
অভিনন্দন জানাতে।

ডোরে বললেন- এ ডি আপনার চিত্রনাট্যটা পরিচালনা করতে চাইছে।

আমি বললাম- ভীষণ ভালো খবর।

-আমি চাই না, স্টুডিও এটি কিনে নিক।

-কেন?

আমি এই গল্পটা নিয়ে ছবি করতে চাইছি না। এটা হল এমন এক পুরুষের গল্প, যে
তার স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাসী, তাকে হত্যা করতে চাইছে।

-কিন্তু ডোরে

না, এই গল্পটা আপনাকে ফিরিয়ে দেব।

আমি বললাম ঠিক আছে নিয়ে আসুন।

অন্য একটা পরিকল্পনা করতে হবে।

আমি জানতাম না, ডোরের এই অনুভূতি আমার জীবনটাকে পাল্টে দেবে। আমার এজেন্ট স্যামি বলল- এম জি এম-র সঙ্গে কথা হচ্ছে। দু-সপ্তাহের গ্যারান্টি হবে। তারা তোমাকে দিয়ে থাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস -এর চিত্রনাট্য লেখাতে চাইছে।

আমি এই বইটা কখনও পড়িনি। জেন অস্টিন, লেখিকার কথা মনে পড়ছে। এক অসাধারণ ছোঁয়া আছে ওই উপন্যাসের মধ্যে।

এম জি এম হলিউডের সব থেকে নামী সংস্থা।

তারা বিশ্ব পরিচিত সিনেমা উপহার দিয়েছে। গন উইথ দ্য উইন্ড, মিট মী ইন সেন্ট লুইস, দ্যা উইজার্ড অফ ওজ, দ্য ফিলাডেলফিয়া স্টোরি, ইত্যাদি।

উনত্রিশ বছর বয়স। এম. জি-এম-এর সাম্রাজ্যে প্রবেশ করলাম। অবাক হয়ে গেলাম। এম জি এম নিজেই একটা ছোটো শহর। নিজস্ব বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা আছে। জল এবং খাদ্যের অপরিাপ্ত জোগান।

স্টুডিওটা মস্ত বড়ো। সেখানে সপ্তাহে একটা ছবির শুটিং শেষ হতে পারে। ১৫০ জন লেখক আছেন। এম জি এম-র সঙ্গে চুক্তি করা আছে তাদের। তাদের মধ্যে বিখ্যাত উপন্যাসিক এবং চিত্রনাট্যকাররা আছেন।

প্রথম দিন গিয়ে আমি বিরাট হলে বসে লাঞ্চ খেলাম, আমাকে রাইটার্স টেবিলে বসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ইতিমধ্যে সেখানে প্রায় দশ-বারোজন লেখকের ভিড় জমে গেছে। তারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করছেন।

আমাকে একটা ছোট অফিস দেওয়া হল। একজন সেক্রেটারি দেওয়া হল।

আমরা প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস নিয়ে আলোচনা করব। আমি মেয়েটিকে বলেছিলাম। তুমি কি এই উপন্যাসের একটা কপি আমার জন্য আনতে পারবে? আমি এটা আদ্যোপান্ত পড়তে চাই।

মেয়েটি একটা স্টুডিও নাম্বারে ফোন করে আমার কথা বলল।

তিরিশ মিনিটের মধ্যে বইটা আমার টেবিলে চলে এল।

স্টুডিওর ব্যবস্থা সম্পর্কে আর কী বলব। প্রত্যেক স্টুডিওতে একটা গ্রন্থাগার আছে। গবেষণার বিভাগ, কুশিলবদের জন্য আলাদা বিভাগ, সেট কেমন হবে, তার জন্য একটা বিভাগ, সিনেমাটোগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট, এছাড়া ব্যবসায়িক সংক্রান্ত আলাদা বিভাগ।

পরের দিন সকালবেলা, স্যামি আমার অফিসে এসে বলল- তুমি কী করছ?

-আমি কাজটা শুরু করেছি।

-আর্থার ফ্রেড তোমার সাথে দেখা করতে চাইছেন।

-কেন?

-উনিই বলবেন।

আর্থার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছিলাম। তিনি ইনসিওরেন্স সেলসম্যান হিসেবে তাঁর পেশা শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে নামকরা সংগীত রচয়িতা হয়ে ওঠেন। বিখ্যাত অনেকগুলি গানের সুরও দিয়েছেন। যেমন, দ্য ব্রডওয়ে মেলোডি, গুডমর্নিং, অন আ সানডে আফটারনুন ইত্যাদি।

লুইসের সাথে তার ভালো সম্পর্ক। লুইসের মাধ্যমে তিনি প্রযোজক হয়ে উঠেছেন।

ফ্রেড সম্পর্কে অনেক গুজব বাতাসে ভাসছে। তিনি নাকি কোনো বিষয়ে আদ্যোপান্ত না জেনে তার মধ্যে প্রবেশ করতে চান না।

প্রথম দিনের অভিনয়। ফ্রেডকে আমন্ত্রণ জানানো হল।

আর একবার ফ্রেড আমার কাছে এসেছিলেন।

স্যামি এবং আমি হলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেলাম। আর্থার ফ্রেডের অফিসে যেতে হবে। এটা তিনতলায় অবস্থিত।

ডেস্কের ওপারে ফ্রেড বসেছিলেন। চেহারাটা মোটামুটি ভালো পঞ্চাশ বছর বয়স ছাড়িয়ে গেছে। মাথায় ধূসর পাতলা চুল।

-সেলডন । বসুন ।

আমি বসলাম ।

-আমার একটা সমস্যা হয়েছে । আমি একটা স্ক্রিপ্ট হাতে পেয়েছি । কিন্তু কোন ভূমিকায় কে অবতীর্ণ হবেন, বুঝতে পারছি না । প্রত্যেকে আমার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে । স্ক্রিপ্টের মধ্যে সংগীতের ছোঁয়া আছে । লেখাটাও খুব ভালো হয়েছে । তবে প্লটটা ঠিক হয়নি । প্লটটা অত্যন্ত জটিল । একটু পরিবর্তন করতে হবে । আপনি কি সাহায্য করবেন?

-হ্যাঁ, আমি এখন প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডাইস নিয়ে কাজ করছি ।

ফ্রেড বললেন- এটাও আপনার খারাপ লাগবে না ।

-কী নাম ছবিটার?

-ইস্টার প্যারাডে । আপনি আরভিন বার্লিনের সাথে কাজ করবেন?

এটা এক সুন্দর মুহূর্ত । এম জি এম-এ আমার তৃতীয় দিন । কিংবদন্তী মহানায়ক আরভিন বার্লিনের সাহচর্যে আসার সুযোগ পেলাম ।

আমি বললাম এই কাজটা করতে পারলে নিজেকে ধন্য বলে মনে করব ।

জুডি গারল্যান্ড এবং জেনি কেলি প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন ।

আমি মুখের অভিব্যক্তি না পাল্টে বললাম ঠিক আছে, এটাও ভালো খবর।

-আমি চাইছি, এখনই উপস্থাপনটা শুরু হোক। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

-ঠিক আছে তাই করা হবে।

-এই চিত্রনাট্যটা ভালো করে দেখুন। কোথায় কোথায় পরিবর্তন হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করবেন। আগামীকাল আরভিনের সাথে আপনার বৈঠক হবে।

আমি ফ্রেডের অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম।

ইস্টার প্যারাদের আসল চিত্রনাট্যটা লিখেছেন আলবার্ট এবং ফ্রান্সিস। এই ক্ষেত্রে তাদের যথেষ্ট সুনাম আছে। স্বামী-স্ত্রী মিলে একটা সুন্দর জগৎ তৈরি করেছেন। পরবর্তীকালে তারা ব্রডওয়ের বিখ্যাত নাটক, দ্য ডায়েরি অফ অ্যানা ফ্রাঙ্ক-এর চিত্রনাট্য লিখেছিলেন।

কিন্তু ফ্রেডের মন্তব্য সঠিক ছিল। এই চিত্রনাট্যের মধ্যে একটু কৌতুকের ছোঁয়া দরকার। তা না হলে সাধারণ দর্শকদের মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে।

তারা আর এই থিয়েটারটি দেখার জন্য ভিড় জমাবেন না।

তবে কাজটা ক্লান্তিকর। কারও লেখার ওপর কারুকাজ করা। এটা কি খুব সহজ? আমি নতুন করে ভাবনা চিন্তা করা শুরু করলাম।

পরদিন সকালবেলা, আর্থার ফ্রেডের অফিসে আমার ডাক পড়ল। সেখানে এক খর্বাকৃতি মানুষ বসেছিলেন। চোখের তারায় ঔৎসুক্য।

—ইনি হলেন আরভিন বার্লিন।

এক মুহূর্তের মধ্যে আমার মনে আনন্দের শিহরণ। এই ভদ্রলোক আলেকজান্ডার স
র্যাগটাইম ব্যান্ড-এর মতো অসাধারণ গল্প লিখেছেন! গড ব্লেস আমেরিকা, দেয়ার'স নো
বিজনেস লাইক শো বিজনেস, পুত্তিন টপ হ্যাট- সব তার লেখা?

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করলেন। আমি নিজের পরিচয়
দিলাম। তিনি আমার হাতে হাত রাখলেন— এখন থেকে আমরা একসঙ্গে কাজ করব,
তিনি উঁচু গলায় কথা বলেছিলেন।

আমি নিউইয়র্কে আমার অভিজ্ঞতার কথা বললাম না। সেখানে আমি গান রচয়িতা
হিসেবে ওনাকে হারিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এখন আমরা হাতে হাত রেখেই কাজ করব।
আমি কেন অযথা ওনাকে চিন্তিত করে তুলব।

অনেকের কথাই মনে হচ্ছে। আরভি বার্লিনের মতো স্বনামধন্য মানুষ মাঝে মধ্যেই
আমার অফিসে আসছেন।

বয়স ষাট বছর হলে কী হবে, তার চোখে মুখে এক কিশোরের চঞ্চলতা। আমরা বিভিন্ন
বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। রাইটার্স টেবিলে লাঞ্চে যোগ দিচ্ছি। অন্যান্য
চিত্রনাট্যকাররা কে কী ভাবনা-চিন্তা করছেন তা নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে। একটার

পর একটা শুটিংয়ের কাজ এগিয়ে চলেছে। বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এসে যোগ দিয়েছেন।

সাউন্ড স্টেজের ব্যাপারে অনেকটা জ্ঞান অর্জন করলাম। এতদিনে আমি বুঝতে পারছি কীভাবে একটা চিত্রনাট্যকে সিনেমায় রূপান্তরিত করা হয়।

ইস্টার প্যারাদের চিত্রনাট্য লেখাটা শেষ হল। একদিন স্যামি আমার অফিসে এসে প্রবেশ করলেন।

-সিডনি তোমার জন্য একটা ভালো খবর আছে। এম জি এম তোমার সঙ্গে দীর্ঘকালীন চুক্তি করতে চলেছে।

আনন্দে আমি আত্মহারা- তা হলে? আমার স্বপ্ন সফল হল।

-হ্যাঁ, অনেক দিন ধরেই আমি মনে মনে ভেবেছিলাম। হলিউডের লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করব।

-এখনও পর্যন্ত চুক্তির খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জানতে পারিনি, তার মুখে হাসি, তবে এটা হবেই, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আমি আবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলাম। আমি আমার চিত্রনাট্যটা আর্থার ফ্রেডের হাতে তুলে দিলাম। তার প্রতিক্রিয়া শোনবার জন্য উন্মুক্ত হয়ে আছি। কিছুক্ষণের নীরবতা, তার মানে ওনার এটা পছন্দ হয়নি।

আর একটা দিন চলে গেল, আমি চিত্রনাট্যটা আরও একবার পড়লাম। হ্যাঁ, নিউইয়র্কের সমালোচক ঠিকই মন্তব্য করেছেন, আমার মধ্যে কোনো সুপ্ত প্রতিভা নেই। সংলাপগুলো এত খারাপ যে উচ্চারণ করা সম্ভব হবে না।

আর্থার ফ্রেড বোধহয় আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন না।

এক সপ্তাহ কেটে গেছে, আর্থার ফ্রেডের সেক্রেটারি আমাকে ফোন করলেন।

—মিঃ ফ্রেড আপনার সাথে আগামীকাল অফিসে দেখা করতে চাইছেন, সেখানে জুডি গারল্যান্ড এবং জেনি কেলি আসবেন। ঠিক সকাল দশটায়।

আমার মনে একটা অদ্ভুত আতঙ্কের শিহরণ। কেন ওনাদের সঙ্গে দেখা করতে হবে, সেই রহস্যটা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। তার মানে? আমি কি কোনো অন্যায় করেছি? সেই জন্য আমাকে শাস্তি পেতে হবে।

মিটিংটাতে আমি অবশ্যই যাব।

সেই রাতে ঘুমোতে দেরি হয়েছিল। রাতে স্বপ্নের মধ্যে আর্থার ফ্রেডকে দেখতে পেলাম, আমার অত্যন্ত বাজে লেখাটা নিয়ে তিনি চিৎকার করছেন।

সকাল হয়েছে, আমি আবার সিদ্ধান্ত নিলাম সেখানে যাব, কিন্তু কোনো কথা বলব না। তাদের সমালোচনা শান্তভাবে শুনবো। শান্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে আসব। এক ঘণ্টা আগেই আমার প্রস্তুতি শুরু হল।

সকাল দশটা। আমি আর্থারের অফিসে পৌঁছে গেছি। তিনি ডেস্কের ওপাশে বসেছিলেন, তিনি বললেন- লেখাটা অসাধারণ হয়েছে।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, এটা কি ব্যঙ্গাত্মক উক্তি?

জুডি গারলান্ড এসে প্রবেশ করলেন। তিনি বোধহয় আমার পুরোনো বান্ধবীর মতো, মিকি রুমির চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। অ্যান্ডি হার্ডিতে। এবার ডরোথি গেলের পালা।

জুডি অনেকদিন ধরেই এম জি এমের সাথে কাজ করছেন, বলা যেতে পারে একেবারে কিশোরীবেলা থেকে। অনেকগুলো ছবিতে অসামান্য অভিনয় করেছেন। পনেরো বছর বয়সে অভিনয় জগতে হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর। এখন অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। ন বছরে উনিশটা ছবিতে অভিনয় করেছেন।

তবে তাঁর সম্পর্কে নানা গুজব বাতাসে ভেসে বেড়ায়। অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয়ের জন্য তিনি নাকি ড্রাগে অভ্যস্ত। রাত্রিতে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমোতে যান। একবার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। আমি জানি না এই ঘটনাটা কেন ঘটেছিল।

আমাকে উনি চিনতেন, আমার দিকে তাকিয়ে উনি বললেন- হ্যালো সিডনি, আপনার চিত্রনাট্য আমার ভালো লেগেছে।

এক মুহূর্তের জন্য আমি স্তব্ধ হয়ে গেছি। শুধু ধন্যবাদ শব্দটা উচ্চারণ করতে পারলাম।

আর্থার ফ্রেড বললেন- হ্যাঁ, সত্যি একটা অসামান্য রচনা।

দরজা খুলে গেল, জেনি ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। জেনি আমার আরেক পরিচিত মুখ। অনেকগুলো ছবিতে অভিনয় করেছেন। অনেক দিন ধরেই তাকে আমি চিনি।

তিনি এগিয়ে এসে জুডি এবং আর্থারের দিকে তাকালেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন- এই যে লেখক মশাই, আপনার জন্য একটা ভালো কাজ আছে।

আর্থার ফ্রেড প্রশ্ন করলেন- কাজটা কি আপনি করতে পারবেন?

আমি তখন ঘোরের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছি। কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমি বলার চেষ্টা করলাম- কী ধরনের কাজ?

জুডি বললেন- এটা আমার জন্য করতে হবে।

জেনি বললেন- আমার জন্যেও বলা যেতে পারে।

আর্থার ফ্রেডের মুখে হাসি একটা ছোট্ট মিটিং সারতে হবে, সোমবার থেকে শুটিং শুরু হবে।

মিটিং শেষ হয়ে গেল, আমি অফিসে ফিরে এলাম, জিনিসপত্র আর গোছাতে হবে না।

আমার সেক্রেটারি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন- কী হয়েছে আমি কি জানতে পারি, স্যার?

ঘটনা পরম্পরা আমার মন পরিবর্তনে বাধ্য করেছে।

শুক্রবার, আর্থার ফ্রেড আমাকে তার অফিসে ডাকলেন। উনি বললেন একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমি বললাম- কী সমস্যা? চিত্রনাট্যে কোনো অসুবিধা?

না। জেনি কেলি, ভলিবল খেলতে গিয়ে পায়ের হাড় ভেঙে পড়ে আছেন।

-তাহলে শ্যুটিংটা কি পরে হবে?

-আমি আপনার স্ক্রিপ্টটা ফ্রেডের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। উনি গতবছর অবসর নিয়েছেন। কিন্তু এখনও এই ব্যাপারে সমান উৎসাহী।

আমি মাথা নাড়লাম- ফ্রেডের বয়স আটচল্লিশ বছর, জুডি পঁচিশ বছর, দর্শক কখনওই এই জুটিকে মেনে নেবে না। এই জুটি কখনওই সফল হবে না।

উনি বললেন দেখা যাক ফ্রেড কী বলেন।

ফ্রেড হ্যাঁ বলেছিলেন। তার মানে আবার একটা নতুন উন্মাদনা। তার সাথে আর্থার ফ্রেডের অফিসে দেখা হল পরের দিন। তিনি বললেন, স্ক্রিপ্টটা চমৎকার হয়েছে, সংলাপগুলো মন ভরিয়ে দেয়। মন দিয়ে কাজ করতে হবে।

আমি ওনার দিকে তাকালাম, কে বলবে ওনার আটচল্লিশ বছর বয়েস, দেখে পঁচিশের বেশি মনে হয় না। পেশার প্রতি অসামান্য আনুগত্য আছে ওনার, জিনজার রজার্সের সাথে একটা বইতে অসামান্য অভিনয় করেছেন।

সোমবার থেকে কাজটা শুরু হল। ইস্টার প্যারোডের প্রথম শ্যুটিঙের দিন। ফ্রেড একেবারে কোণের দিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার প্রথম শটটা নেওয়া হবে। অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর ছুটে এলেন, জুডিকে বললেন মিস গারল্যান্ড এবার আপনি তৈরি তো?

জুডি বললেন- না, আরেকটু বাকি আছে। গল্পটা তাড়াতাড়ি শুনে নিতে হবে।

আমি গল্প বলা শুরু করলাম। আমি জানি শ্যুটিং করার সময় কত টাকা নষ্ট হয়। এক এক মুহূর্তের দাম আকাশছোঁয়া।

আমি বলেছিলাম- জুডি গল্পটা পরে শেষ করলে কেমন হয়? এটা কি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার?

-না, গল্পের শেষটা না জানা অবধি আমি অভিনয় করতে পারব না।

জুডি, আপনি কি এই ছবিতে অভিনয় করতে চাইছেন না?

জুডি গারল্যান্ড বললেন না।

-কেন?

উনি কিছু একটা ভেবে বললেন আমি কী করে ফ্রেডের সাথে খোলামেলা দৃশ্যে অভিনয় করব? আপনার চিত্রনাট্য অনুসারে তাকে চুমু খাবার কথা। কিন্তু যে মানুষকে আমি কোনোদিন চোখে দেখিনি তাকে চুমু দেব কীভাবে?

আমরা জানতাম এই দুজন সুপারস্টার পরস্পরের পরিচিত। কিন্তু এখন বুঝতে পারলাম জুলির স্বভাবটা কেমন।

আমি বললাম- সঙ্গে আসুন। আমি জুডির হাত ধরে স্টেজের এককোণে চলে গেলাম। সেখানে সকলেই অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছেন। আমি বললাম- ফ্রেড, ইনি হলেন জুডি গারল্যান্ড।

উনি হাসলেন, আমি আপনার অভিনয়ের মন্তব্যবো ফ্যান।

জুডিও বললেন আমিও আপনার অভিনয় ভালোবাসি।

এবার ডিরেক্টার চার্ক ওয়ালটার এসে গেছেন। উনি বললেন, আপনারা ঠিক জায়গায় বসে পড়ুন।

এভাবেই একটা সমস্যার চটজলদি সমাধান হল। ইস্টার প্যারাদের শ্যুটিং শুরু হল।

একদিন আমি রিহাসাল হলে পৌঁছে গেছি, একা একা ফ্রেড নতুন নাচের মহড়া দিচ্ছে। ভারী সুন্দর কোমর ঘোরাচ্ছেন। উনি আমাকে দেখতে পাননি। এক মুহূর্তের জন্য থামলেন, আমি ওনার কাঁধে হাত দিয়ে বললাম, ফ্রেড, এভাবে নাচতে হবে।

উনি বললেন- ঠিক আছে। আমি ওইভাবে নাচটা করার চেষ্টা করব।

শ্যুটিং শুরু হতে চলেছে। আর্থার ফ্রেড জুল নামে এক অভিনেতাকে নিয়ে এসেছেন। তিনি হাস্যকৌতুক জগতের রাজা। ওনার জন্য একটা ছোট ভূমিকা ছিল। এবার ওনার

দ্বিতীয় সাইড স্কেচ ম্যাঁ। সিডনি জেনডন

কাজ শুরু হবে, আমার হার্নিয়াটা আবার বেড়ে পড়ল, আমি বিছানাতে শুয়ে থাকতে বাধ্য হলাম।

ফোন বেজেই চলেছে, জুলসের সিডনি আপনাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

—তিনদিন বিছানাতে শুয়ে থাকতে হবে।

—না, আমি এখনই যাব।

—অসম্ভব যন্ত্রণা। আমি কথা বলতে পারছি না জুলস, এখন আসবেন না, আমার শরীর ভালো নেই।

—আপনার সেক্রেটারী বাড়ির ঠিকানা দিয়েছে। পনেরো মিনিটের মধ্যে আমি আসছি।

আমি আরেকটা ব্যথা কমানোর ট্যাবলেট খেতে বাধ্য হলাম, দাঁতে দাঁত চেপে অপেক্ষা করছি।

পনেরো মিনিট কেটে গেছে, জুলস আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন— আপনাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?

আমি ওনার দিকে তাকিয়ে আছি।

—নিউইয়র্ক থেকে আমাকে আনা হয়েছে, আমাকে একটা ছোট ভূমিকাতে অভিনয় করতে হবে। কিছু একটা করার চেষ্টা করুন।

এটাই হল একটা সমস্যা, এত যত্নগা, আমি কথা বলতে পারছি না।

উনি বললেন আমার শ্যুটিং কিন্তু আগামীকাল।

আমি চোখ বন্ধ করলাম, ওনার জন্য যে ভূমিকাটা তৈরি করেছিলাম সেটা মনের পর্দায় ভেসে উঠল। এমন একজন মানুষ যে নিজের সম্পর্কে বাড়িয়ে বাড়িয়ে কথা বলতে ভালোবাসেন।

উনি বললেন- এই দৃশ্যটার মধ্যে কিছুই নেই।

-হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম জুলস উত্তরটা খুবই সোজা। কয়েকটা শব্দ পাল্টাতে হবে। শেষ পর্যন্ত তার চরিত্রটা সকলের মনে দাগ কেটেছিল।

ইস্টার প্যারাডে বক্স অফিসে বিজয় পতাকা উড্ডীন করে। ব্লু রিবন অ্যাওয়ার্ড পায়। ডব্লু জি এ স্ক্রিন অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছিল, ১৯৪৮ সালের সেরা আমেরিকান চলচ্চিত্র হিসেবে। আমাকে পুরস্কার দেওয়া হয়, এর সাথে পুরস্কৃত করা হয় ফ্রান্সেস গুডরিজ এবং অ্যালবার্ট হকার্টকে।

এম জি এম যতগুলো সংগীত সমৃদ্ধ ছবি তৈরি করেছিলেন, তার তালিকায় ইস্টার প্যারাডের নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। প্রত্যেক বছর ইস্টার উৎসবে এই সিনেমাটা টেলিভিশনের পর্দায় দেখানো হয়। গত সাতান্ন বছর ধরে এমন ঘটনাই ঘটে আসছে।

হলিউডে ধর্মঘট

১৬.

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর। আমেরিকার রাজনৈতিক ইতিহাস এক শোচনীয় ঘটনা ঘটে গেল। হলিউডে ধর্মঘট দেখা দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে রাশিয়ার মধুচন্দ্রিমা শুরু হয়েছে। জোসেফ ম্যাক কার্থি নামে একজন নিজেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবতে শুরু করেছেন। তিনি একটি বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন। তিনি বললেন মার্কিন সৈন্যদলে অনেক সাম্যবাদী মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

কতজন? প্রশ্ন করা হয়েছিল।

তিনি বললেন, কয়েকশো।

তার এই উত্তর সকলের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করল। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় এই নিয়ে কত উদ্বেগ আর উত্তেজনা।

তিনি আরও একটা সাংঘাতিক খবর দিলেন। তিনি বললেন, নৌবাহিনী এবং প্রতিরক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে অনেক কম্যুনিষ্ট ঢুকে পড়েছেন। তিনি ইন্টারভিউ দিতে শুরু করলেন, কতজন এসেছে সেই সংখ্যাটা ক্রমশ বাড়তে থাকল।

একটা তদন্তকারী কমিটি গঠিত হল। বেশ কয়েকজন সেনেট সদস্য ওই কমিটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। দেশ জুড়ে দারুণ আতঙ্ক।

ম্যাক কার্থির নাম তখন ক্রমশ বাড়ছে। তিনি আরও উল্টোপাল্টা মন্তব্য করতে থাকলেন। সাধারণ মানুষকে সাম্যবাদী হওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হল। তারা আত্মপক্ষ সমর্থনের বিন্দুমাত্র সুযোগ পেল না। প্রতিরক্ষা দপ্তরের ওপর অন্ততদন্ত কমিটির হানা শুরু হল। হলিউডকেও এর আওতাভুক্ত করা হল।

লেখক, প্রযোজক এবং পরিচালকরা নানাভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছেন। হ্যাঁ, অনেক কম্যুনিষ্ট হয়তো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঢুকে পড়েছে, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে কে সাচ্চা সাম্যবাদী আর কে নয় সেই বিচার কে করবে?

দশজন লেখকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল, তাদেরকে গ্রেপ্তার করে কারাগৃহে পাঠানো হল। তিনশো চব্বিশ জনকে কালো তালিকাভুক্ত করা হল। চোখের সামনে কত অসহায় জীবন স্তব্ধ হয়ে গেল।

হলিউডের অবস্থা তখন শোচনীয়। হলিউড থেকে একটা ঘোষণা করা হল, যে মানুষের সাথে কম্যুনিষ্ট পার্টির সামান্য যোগসূত্রতা থাকবে, তাকে আর কোনো কাজ করতে দেওয়া হবে না। এভাবেই দশ বছরের বিধি নিষেধ আরোপিত হল।

আর কেও-র স্টুডিওর সাথে ভোরে যুক্ত ছিলেন, তিনি পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করলেন যে কম্যুনিষ্ট হবার অপরাধে যদি তার চাকরি যায় তাহলেও তিনি বিন্দুমাত্র ভয় পাবেন না। একটা কমিটি গঠিত হল, চারদিকে ব্যাপক বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়েছে। চিত্রনাট্যকাররা যে গিল্ড তৈরি করেছিলেন সেখানে উত্তপ্ত বাদানুবাদ শুরু হল।

অনেকেই লেখক সত্ত্বাকে সবার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলেন। একজন মানুষ রাজনৈতিক মতবাদে যে কোনো দলের অনুগামী হতে পারে, এজন্য কেন তাকে শাস্তিভোগ করতে হবে?

একদিন সকালে মারভিন নামে এক স্টুডিও একজিকিউটিভ আমাকে তার অফিসে ডেকে পাঠালেন। মারভিন কী ধরনের কাজ করেন সে বিষয়ে আমার কোনো নির্দিষ্ট ধারণা ছিল না। আমি শুনেছিলাম তিনি নাকি প্রতি সপ্তাহে তিন হাজার ডলার করে পান, তাঁকে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। অভাবিত কোনো দৃশ্য দেখালে বিপদ ঘন্টি বাজাতে হবে এটাই তার কাজ।

চল্লিশ বছর বয়স হয়ে গেছে, মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে, উনি আমাকে বসতে বললেন, উনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন- রাইটার্স গিল্ডের মিটিং-এ আপনি অ্যালবার্টের স্বপক্ষে ভোট দিয়েছেন?

হ্যাঁ, কদিন আগে আমরা একটা মিটিং করেছিলাম, সেখানে নতুন বোর্ড অব ডাইরেক্টর নির্বাচিত হয়েছে, এটা রুদ্ধদ্বার অধিবেশন, ওনার প্রশ্ন শুনে আমি অবাক হয়ে গেছি। বললাম- হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে?

উনি জিজ্ঞাসা করলেন কেন?

আমি বললাম- ওনার একটা উপন্যাস পড়ে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। আমি চাই ওনার মতো সুখ্যাত লেখকরা যেন এই গিল্ডে প্রবেশের অনুমতি পান।

আপনাকে কেউ কি প্ররোচিত করেছে?

আমি রেগে গিয়ে বললাম না, আমি আমার বিবেকের তাগিদে ভোট দিয়েছি।

—কেউ নিশ্চয়ই আপনাকে প্রভাবিত করেছে।

আমার কণ্ঠস্বর তখন ক্রমশ চড়ছে—মারভিন, আমার উত্তর আমি দিয়েছি। উনি একজন ভালো লেখক। তাই ওনাকে ভোট দিয়েছি।

উনি ওনার সামনে পড়ে থাকা এক টুকরো কাগজের দিকে নজর দিলেন। তারপর বললেন— গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আপনি কি স্টুডিও পাড়াতে গিয়ে শিশুদের জন্য টাকা সংগ্রহ করেছেন?

এবার আমার রাগ আকাশ ছুঁয়েছে। উনি যা বলছেন তা সত্যি, এমন কী আমি নিজেও চাঁদা দিয়েছি। তারপর স্টুডিওতে গিয়ে সকলের কাছে হাত পেতেছি। যে সমস্ত শিশুদের বাবা জেলে বন্দী তাদের অসহায় মুখগুলো আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠেছে।

আমি কোনো সময় রেগে যাই না, কিন্তু তখন ধৈর্য হারালাম।

আমি বললাম— মারভিন, আমি দোষী, আমার এটা করা উচিত হয়নি। হ্যাঁ, ওই শিশুগুলো খিদের জ্বালায় ছটফট করে মরুক, তাদের বাবারা জেল খাটুক, ছেলেদের মুখে কেন খাবার অন্ন তুলে দেবো! তারা মরলেই আমাদের আনন্দ।

আমি চিৎকার করে চলেছি তখন। উনি বললেন- শান্ত হোন, শান্ত হোন, বাড়িতে চলে যান, তারপর ভালো করে ভাবুন কার প্ররোচনায় আপনি অ্যালবার্টকে ভোট দিয়েছেন। কাল সকালে আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

আমি অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম, উত্তেজনায় সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। এভাবে অপমানিত হতে হবে তা ভাবতেই পারিনি।

সমস্ত রাত ঘুমোতে পারিনি। আমি শেষ পর্যন্ত একটা সিদ্ধান্ত নিলাম, সকাল নটা, আমি মারভিনের অফিসে ফিরে এসেছি।

আমি বললাম- আমি কাজটা ছেড়ে দিচ্ছি, আপনি আমার শর্তটা ছিঁড়ে ফেলতে পারেন। এই স্টুডিওতে আমি আর থাকব না।

আমি দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। উনি বললেন- এখনই তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। নিউইয়র্কের সাথে আমি কথা বলেছি। যদি আপনি একটা মুচলেকা দিয়ে বলেন যে আপনি কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য নন অথবা কম্যুনিষ্ট ভাবধারা পছন্দ করেন না তাহলে আপনাকে রাখা হবে। পুরো ব্যাপারটা আমরা ভুলে যাব।

উনি আমার দিকে এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন- আপনি কি এটা সই করবেন?

আমি কাগজটার দিকে তাকিয়ে শান্ত হয়ে বললাম হ্যাঁ, কারণ আমি কম্যুনিষ্ট নই, আর কখনই কম্যুনিষ্ট হব না।

এটা একটা বাজে অভিজ্ঞতা, কিন্তু আমার কিছুই করার ছিল না। অনেক উজ্জ্বল মুখচ্ছবি মনে পড়ল, যাদের আর কখনও হলিউডে দেখতে পার না।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস, মোশান পিকচার অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের জন্য সম্ভাব্য প্রাপকদের তালিকা ঘোষিত হয়েছে। আমি পাঁচটি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য তালিকায় স্থান পেয়েছি। দি ব্যাচেলার অ্যান্ড দি ববি সক্রার নামে একটা মৌলিক চিত্রনাট্য লেখার জন্য আমার এই সম্মান। সহকর্মীদের কাছ থেকে শুভ সংবাদ ভেসে এল। এজেন্ট এবং বন্ধুরা এই সাফল্যের জন্য আমাকে অভিনন্দিত করলেন। আমি জানি অস্কার জেতার সামান্যতম সম্ভাবনা আমার নেই।

ছবিগুলো সত্যিই জনপ্রিয়, একটার পর একটা হলে অসংখ্য মানুষের সমাবেশ।

ডোনা হলওয়ের কাছ থেকে একটা খবর পেলাম। উনিও আমাকে অভিনন্দিত করেছেন। ডোনার সাথে আমার অনেক দিনের বন্ধুত্ব। আমরা অনেক সময় সিনেমা দেখতে যাই একসঙ্গে। কনসার্ট শুনতে যাই। উনি আমার সাহচর্য ভালোবাসেন।

যেদিন অস্কার পুরস্কার ঘোষিত হবে সেদিন ডোনা আবার ফোন করলেন। উইলিয়াম মরিসের কাজ ছেড়ে উনি এখন কলোম্বিয়া স্টুডিওতে কাজ করছেন। হ্যারি কোহনের ব্যক্তিগত সহকারিণী হিসেবে। কোহনকে আমার ঈর্ষা করতে ইচ্ছে হয়, কারণ ডোনার মতো একজন কাজের মেয়ে পেয়েছেন উনি।

ডোনা প্রশ্ন করলেন- অস্কার দেখতে যাবেন তো?

-আমি যাচ্ছি না।

-ডোনা অবাক কেন কী হয়েছে?

-ডোনা, জেতার সামান্যতম সম্ভাবনা নেই। আমি গিয়ে বিড়ম্বিত হব?

-একথা বলবেন না, আমি বলছি অস্কার জেতার সম্ভাবনা আছে, আপনি অবশ্যই যাবেন।

-আপনি কি আমার সঙ্গে যাবেন?

-হ্যাঁ, আমি যাব এবং আপনাকে হাসি মুখে স্টেজে উঠতে দেখব।

সাইন অডিটরিয়াম, ২০তম অ্যানুয়াল অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের অনুষ্ঠান। এটা টেলিভিশনের মাধ্যমে দেখানো হয়নি, কিন্তু দুশো এবিসি রেডিও স্টেশন-এর ধারাবিবরণী প্রকাশ করেছে।

জর্জ মারফি, একজন অসামান্য অভিনেতা, তাকেও দেখতে পেলাম, ডোনা এবং আমি সীটে গিয়ে বসলাম।

ডোনা আমার পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলেন- আপনি কি চিন্তিত?

আমি দৃষ্ট কণ্ঠে না বললাম, চোখে মুখে চিন্তার কোনো ছাপ নেই। আমি জানি এই সন্ধ্যাটা হল সেই সব সৃজনশীল মানুষদের জন্য যারা অনেক পরিশ্রমে এতটা পথ পার হয়েছেন। আমি তো নেহাত এক দর্শক, আমি কেন উদ্বিগ্ন হব।

উৎসব শুরু হয়ে গেছে। একে একে বিজয়ীরা মঞ্চে উঠে যাচ্ছেন। অস্কার পুরস্কার গ্রহণ করছেন। আমি বসে আছি, সব কিছু দেখছি, মনে কোনো আবেগ বা উত্তেজনা নেই।

শেষ পর্যন্ত সবসেরা চিত্রনাট্যকারের পুরস্কার ঘোষিত হবে। জর্জ মারফি ঘোষকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন- এই বিষয়ের জন্য যাদের নির্বাচিত করা হয়েছে তারা হলেন?

জর্জ মারফি একটা এনভেলোপ খুললেন। আমরা সকলে তাকিয়ে আছি। উনি চিৎকার করে বললেন- সেরা চিত্রনাট্যকারের সম্মান পেয়েছেন সিডনি সেলডন, ব্যাচেলার অব দ্য ববি সার চিত্রনাট্যের জন্য।

আমার সমস্ত শরীর হিমশীতল হয়ে গেছে। আমি বুঝতেই পারছি না, এইভাবে পুরস্কৃত হব কোনো দিন।

জর্জ মারফি আবার আমার নাম ধরে ডাকছেন।

ডোনা আমাকে ঠেলা দিয়ে বললেন- উঠে দাঁড়ান।

আমি ঘোরের মধ্যে উঠে দাঁড়ালাম। টলমল পায়ে স্টেজের দিকে এগিয়ে চলেছি। অডিয়েন্স হাততালি দিতে শুরু করেছে।

জর্জ মারফি আমার হাতে হাত রেখে বললেন অভিনন্দন।

আমি কোনোরকমে ধন্যবাদ জানালাম।

জর্জ মারফি বললেন- মিঃ সেলডন, আপনি কিছু বলুন, কোথা থেকে এই গল্পের প্লটটা আপনার মাথায় এল।

আমি কী করে সব কথা বলব? আমি তখন বললাম- যখন নিউইউর্কে ছিলাম তখন অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে, আমি লিখতাম মানুষের দিকে তাকিয়ে, সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই এই গল্পটা লিখেছি।

আমি কী বলেছি কিছুই জানি না, মনে হচ্ছে আর কথা বলতে পারব না। আমি সকলের দিকে তাকালাম, অনেকের নাম মনে পড়ে গেল, তারপর সীটে ফিরে এলাম।

ডোনা প্রশ্ন করলেন- কেমন লাগল? কেমন অনুভূতি।

না, এত আনন্দ জীবনে কখনও হয়নি। কিন্তু আরেকটা বিষয় ভেবে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই সম্মান কি সত্যিই আমার? আমার থেকে আরও ভালো কাজ অনেকে করেছেন, কিন্তু ভাগ্য দোষে তারা হয়তো সেরা শিরোপা পাননি।

উৎসব এগিয়ে চলেছে, কিন্তু স্টেজে কী হচ্ছে তা দেখার মতো ইচ্ছে আমার নেই। রোনাকে দেখা গেল অস্কার পুরস্কার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ ডাবল লাইফ সম্পর্কে কথা বলছেন। লরেট্টা, এক অভিনেত্রী, দি ফারমারিস ডটারের জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন। আমি আর সেখানে বসে থাকতে পারছি না। এই রাতটা আমার জীবনে স্মরণীয় রাত হয়ে থাকবে। আমি কি একজন মনোবিশারদের কাছে যাব? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমার মধ্যে কোনো অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে।

.

ভদ্রলোকের নাম ডাঃ জুড মারনার। বন্ধুরা তার কথাই বলেছিলেন।

বিরাট চেহারার মানুষ, চুলের রং রূপালী হতে শুরু করেছে। উনি শান্তভাবে আমার সমস্যার কথা জানতে চাইলেন।

আমি ওনার দিকে তাকিয়ে নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভারসিটির কথা ভাবলাম। আমার সমস্যা কোথায় তাই তো বুঝিয়ে বলতে পারছি না। সব কথা বলার চেষ্টা করলাম। এমনকি কয়েক দিন আগে যে অস্কার পেয়েছি সে কথাও বললাম। কিন্তু আমার মনে সুখ কোথায়? মনের ভেতর সব সময় হতাশার অন্ধকার।

উনি প্রশ্ন করলেন এই হতাশাচ্ছন্ন অবস্থা সব সময় কি থাকে?

হা কেন এমন হয় বলুন তো?

গত কয়েক বছরের স্মৃতি রোমন্থন করার চেষ্টা করুন। দেখুন তো এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে কী যা আপনার মনকে বিষাদঘন করেছে।

অনেক কথাই মনে পড়ল, কিন্তু সুখের মুহূর্ত তত বেশি আছে, দুঃখের মুহূর্ত কোথায়?

আমি গল্প বলা শুরু করলাম, গল্প কিন্তু নয়, আমার ফেলে আসা জীবনের টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতা, নিউইয়র্কের সংগীত রচয়িতা ম্যাকসিচের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

আরেকটা কঠিন প্রশ্ন উনি বললেন- আপনি কি কখনও আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন?

অনেক দিনের আগের একটা ছবি মনে পড়ে গেল, বাবা ঠিক সময় না এলে আজ আমি বেঁচে থাকতাম না।

প্রশ্নোত্তরের পালা চলল, শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন-আপনার মধ্যে হতাশাচ্ছন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এর অন্তরালে মস্তিষ্কের কিছু ব্যাপার আছে। সব সময় আপনি দুঃখের জগতে বাস করতে ভালোবাসেন।

উনি আমার দিকে আবার তাকিয়ে বললেন- অন্তত কুড়ি লক্ষ আমেরিকাবাসী এই রোগে ভুগছে। দশটি পরিবারের মধ্যে একটি পরিবারে অন্তত একজনকে এই রোগী হিসেবে পাওয়া যাবে। কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে তারা এই রোগের শিকার হন। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এই রোগে আচ্ছন্ন ছিলেন। যেমন ভিনসেন্ট ভ্যান গগের মতো শিল্পী, হারম্যান মেলভিল, এডগার অ্যালান পো, ভার্জিনিয়া উলফের মতো সাহিত্যিকেরা ইত্যাদি।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। তারাও কি আমার মতো একই সমস্যায় ভুগছেন?

আমি জানতে চাইলাম- কতদিন সময় লাগবে এই রোগ থেকে সেরে উঠতে?

উনি বললেন- এই রোগের কোনো শুশ্রূষা নেই।

-তাহলে?

কয়েকটা ওষুধ দিচ্ছি, নিজেকে শান্ত সংযত রাখার চেষ্টা করুন। অনেকের মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতির সৃষ্টি হয়। তারা আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে ওঠেন। এই ব্যাপারটাই সাংঘাতিক।

আমার মন আবার বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

নিজের শব্দের ওপর এবং কাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করবেন।

আমার নিঃশ্বাস বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে।

ডাঃ মারনার আবার বললেন- নানা ধরনের বিশৃংখলা দেখা দিতে পারে। অনেকে মাসের পর মাস কেমন গুম মেরে বসে থাকেন। অনেকে আবার কারো সাথে কথা বলতে চান না। কেউ কেউ মনে মনে বিড় বিড় করেন।

ওনার অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম, সমস্ত শরীর থরথর পরে কাঁপছে, আমি ভালো আছি, নিজের মনকে প্রবোধ দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করি।

অস্কার সম্পর্কে অনেকগুলো প্রবাদ বাক্য জড়িয়ে আছে। যদি একবার তুমি অস্কার জেতো, তুমি এটা আর জিততে চাইবে না। আবার অস্কার জিতলে তুমি কোনো কাজ করতে পারবে না।

অস্কার জেতার পর এক সপ্তাহ কেটে গেছে, স্যামি আমার অফিসে এসে প্রবেশ করলেন, অনেক অনেক অভিনন্দন, কোথায় আছে ওই পুরস্কারটা?

-স্যামি এত আনন্দ করার কী আছে? তুমি কি ভাবছ এটা আমার বাড়ির ছাদ?

উনি হেসে উঠলেন।

-স্যামি, এই পুরস্কার জেতা আমার কাছে একটা আঘাতের মতো।

উনি বললেন আমি জানি, আমি আপনার ভাষণ শুনেছি, কিন্তু আরেকটা কথা জানতে চাইছি, আপনি এখন কী করছেন? সাত বছরের চুক্তি করে ফেলেছেন?

আমি বিশ্বাস করছি না, এটা বোধহয় অস্কার পুরস্কারের ফলশ্রুতি, আমার মনে হল।

অনেকগুলো শর্ত নিয়ে আলোচনা করতে হবে, আমি ওয়েস্ট উডে পৌঁছে গেলাম।

একটা ছোট বাড়ির ভেতর, এখানে একটা ছোট বেহরুম আছে, একটা লিভিং রুম, কিচেন এবং দুটো বাথরুম। বাড়িটার সাথে একটা গ্যারেজ আছে। টনি কার্টিস এবং গ্যানেট লে -এই দুজন বিখ্যাত অভিনেতা কয়েকটা বাড়ি দূরে থাকে। তাদের গাড়ি আছে কিন্তু গাড়ি রাখার জায়গা নেই। একদিন ডিনারে উনি বলল আমাদের একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। তুমি কি তোমাদের গ্যারেজটা ভাড়া দেবে?

আমি বলেছিলাম- তুমি এটা ব্যবহার করতে পারো কিন্তু ভাড়া হিসেবে আমি কিছু নেব না। তখন থেকে ওদের গাড়িটা আমার গ্যারেজে থাকে। আমার বাড়িটা খুবই ছোটো ছিল, সেখানে পার্টি দিতে পারতাম না। মাঝে মধ্যে আমাকে পার্টির আয়োজন করতে হয়, এখন কোথায় বেশি জায়গা পাব। ভাগ্যক্রমে একটা ভালো ফিলিপিনো পাঁচকের সন্ধান পেয়েছি। সে বাড়িটাকে পরিষ্কার রাখে। এম জিএমের সঙ্গে কাজ শুরু হল, গুরুত্বপূর্ণ অনেক মানুষের সঙ্গে পরিচয় হল। ইরা গারসউইন স্ত্রীকে নিয়ে ডিনার খেতে এলেন। স্ত্রীর নাম লী। কার্ক ডগলাস, সিড কিয়েসার, সকলেই আসতে শুরু করেছেন। এলেন অনেক বিখ্যাত মানুষজন। জুলেস মাঝেমধ্যেই আসেন, তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। তার স্ত্রী ডেরিসের সাথে আলাপ হল। মাঝেমধ্যে আমরা মেঝেতে বসে গল্প করি, যথেষ্ট চেয়ার বাড়িতে নেই। কেউ সেদিকে মাথা ঘামায় না।

রবার্টের সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পেয়েছিলাম। ডিজনি স্টুডিওর প্রধান মেকাপ ম্যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রয়াল এয়ারফোর্সের হয়ে কাজ করেছেন। সুন্দর প্রমোদ তরণীর মালিক, বলা যেতে পারে বিশ্ব পরিভ্রমণ করেছেন।

১৯৪৬, স্কিফার ওরিটা একটা ছবিতে কাজ করছিলেন। রিটা তখন যথেষ্ট জনপ্রিয় অভিনেত্রী। তিনি এবং স্কিফার মেক্সিকোতে চলে যাবার পরিকল্পনা করলেন। ছবিটা অনেক দিন আটকে থাকল।

প্রত্যেক শনিবার সন্কেবেলা আমার বাড়িতে জিনের আসর বসত। জনা ছয়েক অতিথি নিয়মিতভাবে আসতেন। আসতেন জেরি ডেভিস নামে একজন লেখক এবং প্রযোজক, আসতেন পরিচালক স্ট্যানলি ডোনেন, আরও কয়েকজন। এলিজাবেথ টেলার তখন সবেমাত্র উনিশ বছরের কিশোরী, তিনিও স্ট্যানলির সঙ্গে আসতেন। প্রত্যেক শনিবার তিনি লাঞ্চ তৈরি করতেন।

এলিজাবেথকে দেখে মনে হত এক প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী। তার কথা বলার মধ্যে একটা মত্ত মাদকতা ছিল। ভবিষ্যতে তিনি যে কিংবদন্তীর নায়িকা হয়ে উঠবেন, তার পরিস্ফুটন তখন থেকেই চোখে পড়েছিল। ভাবতেই পারা যায় না, প্রত্যেক শনিবার উনি আমার রান্নাঘরে বসে স্যান্ডউইচ তৈরি করতেন।

এম জি এমের সাথে সিডের একটা চুক্তিপত্র হয়েছে। মেয়েটি অসম্ভব যৌনবতী এবং প্রতিভাশালিনী। তিনি ব্যালার রোসাতে যোগ দিয়েছেন, তেরো বছর বয়সে। নাচের ভঙ্গিমাটি চমৎকার। আমি তাকে কয়েকবার কয়েক জায়গাতে নিয়ে গিয়েছি। প্রত্যেক শনিবার সন্কেবেলা তাকে আসতে বলতাম, কিন্তু যে কোনো কারণেই সিড সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চাইতেন না।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম-কী সমস্যা?

সিড বলতেন- আসছে শনিবার জবাব দেব।

উনি কিন্তু সমস্যার কথা কখনও বলেননি। কিছুদিন বাদে খবরের কাগজের পাতায় প্রকাশিত হল সেই সংবাদটি। উনি এক বিখ্যাত শিল্পী টনি মার্টিনকে বিয়ে করছেন। সিড আমাকে ফোন করে বললেন -সিডনি, খবরটা শুনেছেন আশা করি।

-হ্যাঁ, মনে হয় বিবাহিত জীবনটা সুখেই কাটবে।

পরবর্তীকালে সিডকে ভুলেই গিয়েছিলাম, তখন আরেকটা কাজ নিয়ে আমি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছি।

এম জি শ্রমের গল্পবিভাগের প্রধান কেনেথ ম্যাককেল্লা একদিন আমাকে তার অফিসে ডেকে পাঠালেন। পঞ্চাশ বছর বয়স হয়েছে, শরীরটা চমৎকার ঝকঝকে রেখেছেন।

কোনো সম্ভাষণ নয়- উনি পরিষ্কার বললেন, আপনার জন্য একটা কাজ আছে, সে বোট।

একটা অসাধারণ চুক্তিপত্র, সোবোটকে আমরা একটি সংগীত সমৃদ্ধ সিনেমা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। এই সিনেমাটা সকলেরই ভালো লাগবে, কিন্তু একটা ছোট সমস্যা আছে।

আমি বলেছিলাম- কেনেথ, দুটো দৃশ্যের লেখা শুরু হয়েছে। আমি কিছু মৌলিক বিষয় ঢোকাতে চাইছি।

উনি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন না, আপনার সাথে আমাদের চুক্তি আছে, একথা কখনই বলবেন না।

আমি সোবোট লিখিনি, তখন অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। তিনমাসের ছুটি আছে, ভাবলাম ইওরোপ থেকে ঘুরে আসব। প্রস্তাবটা অভাবনীয়, একটা ফরাসী জাহাজ ভাড়া করা হল।

ন্যাটলি এবং ম্যারিকে সব খবর দিলাম। রিচার্ড এবং জোয়ানের কাছে খবর পৌঁছে গেল, তারা নিউইয়র্কে এল, আমাকে বিদায় জানাতে।

যাত্রীদের মধ্যে চার্লস ম্যাক আর্থার ছিলেন, তার সাথে আগেই আমার দেখা হয়েছে। উনি অসাধারণ চিত্রনাট্যকার। ফ্রন্ট পেজের মতো একটা সুন্দর ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন। জাম্বো এবং টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ওনারই লেখা। ওর স্ত্রী ছিলেন আমেরিকার সব থেকে সুন্দরী অভিনেত্রী হেলেন হয়াস।

চার্লসের সাথে তার দেখা হয়েছিল একটা পার্টিতে। প্রথম দেখাতেই চার্লসের হৃদয় গলে যায়। তিনি একমুঠো বাদাম হেলেনের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন আমার ইচ্ছেয় ও ভালোবাসায় এই বাদাম হীরক কণায় পরিণত হবে।

কিছুদিন বাদে ওদের বিয়ে হল। পরের বছর হেলেনের জন্মদিন, চার্লস তাঁর হাতে সত্যিকারের হীরে তুলে দিয়ে বলেছিলেন –মনে হয় এগুলো বোধহয় বাদাম ছাড়া আর কিছু নয়।

অন্যান্য সহযাত্রীদের মধ্যে বোসলিন্ত রাসেলের কথা বলা উচিত। তার স্বামী ফ্রেড ব্রিসন, এক বিখ্যাত প্রযোজক। ছিলেন এলসা ম্যাক্সওয়েল, এক বিখ্যাত মানুষ, কলমি ম্যাডাম নামে একটি চলচ্চিত্রের রচয়িতা।

সমুদ্র ভ্রমণের প্রথম দিন, চার্লস আমার কাছে এসে গল্প করতে শুরু করলেন। তিনি বললেন-এলসার কাছে আপনার নাম পৌঁছে গেছে। আজকের রাতে ডিনারে আপনি আসবেন তো?

চার্লি! আমি তার ডিনার পার্টিতে যোগ দিলে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করব।

ওনার মুখে হাসি। সত্যি কথা বলছেন তো?

সন্ধ্যার অন্ধকারে এলসা এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। বললেন -মিঃ সেলডন, আজ রাতে আমি একটা ছোট্ট ডিনার দিচ্ছি, আপনি এলে আমি খুশি হব।

-আমি নিশ্চয়ই যাব।

ডিনারটা অসাধারণ। অতিথিরা সত্যিই আনন্দ করেছেন। খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেল, আমি যাবার জন্য উদ্যত, একজন স্টুয়ার্ট বললেন ক্ষমা করবেন মিঃ সেলডন, টেবিলে তিন ডলার পড়ে আছে।

আমি মাথা নেড়ে বললাম আমি মিস ম্যাক্সওয়েলের অতিথি।

-হা স্যার, তাই তিন ডলার দেওয়া হচ্ছে।

আমি রেগে গেলাম।

চার্লি আমাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন।

আমি বললাম কী ব্যাপার? এই টাকাটা কেন দেওয়া হচ্ছে?

চার্লি হাসলেন- সিডনি, এইভাবেই ওই ভদ্রমহিলা সকলকে এক জায়গায় জড়ো করেন।
তাই উনি কিছু টাকা দিতে চান।

ব্যাপারটা আমাকে অবাক করেছে। লন্ডনে এলাম। স্যাভয় হোটেলে উঠলাম। যুদ্ধ শেষ
হয়ে গেছে, ইংল্যান্ডে তার খারাপ প্রতিচ্ছায়া পড়েছে। জীবনযাত্রায় টানাটানি চলেছে। সব
কিছুতেই অপ্রতুলতা। রুম সার্ভিস ওয়েটার সকালে এল, আমি বললাম -আঙুরের রস
পাওয়া যাবে? ডিম সেদ্ধ? শুয়োরের মাংস আর টোস্ট?

তার মুখের ছবি পালটে গেল স্যার, স্যার, এসব পাওয়া যাচ্ছে না। আপনাকে ব্যাঙের
ছাতা খেতে হবে।

তাই খাব কী আর করা যায়!

দিন এগিয়ে গেল, রাতে রেস্টুরেন্টে খেতে যাচ্ছি। খাবার মতো কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না।
পরদিন সকালে টনি মার্টিনের ফোন পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম।

টনি বললেন- আপনি এই শহরে এসেছেন আমাকে বলেননি তো?

-আমি খুব ব্যস্ততার মধ্যে আছি।

-আপনি আজ আমার শো দেখতে আসবেন তো?

-না। এই মানুষটিকে আমি ঘৃণা করি। কারণ আমার ভালোবাসার মেয়েকে উনি বিয়ে করেছেন।

-আপনার বক্স অফিসের টিকিট থাকবে। উনি আবার বললেন শো শেষ হয়ে গেলে আসবেন কিন্তু।

উনি ফোনটা ছেড়ে দিলেন। শো দেখতে যাবার এতটুকু ইচ্ছে আমার নেই। আমি ব্যাকস্টেজে গিয়ে বলব উনি অসাধারণ অভিনয় করেছেন।

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত আমি নাটকটা দেখতে গেলাম, দর্শকরা তাকে অত্যন্ত ভালোবাসে। আমি ব্যাকস্টেজে গিয়ে তাকে অভিনন্দন জানালাম। সিড সেখানে বসেছিল। সিডকে দেখে আমি এগিয়ে গেলাম। সিড আমার সাথে টনির পরিচয় করিয়ে দিল।

-আজ রাতে আমাদের সাথে ডিনার খেতে হবে। টনি বলেছিলেন।

আমি মাথা নেড়ে বললাম- না আমার অন্য কাজ আছে।

টনি মার্টিন পরে আমার এক অন্যতম বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন। তারপর ডিনারটা আমি খেয়েছিলাম, একটা প্রাইভেট ক্লাবে। আমি জানতাম না লন্ডনের প্রাইভেট ক্লাবে রেশনিং এর ঝামেলা নেই।

ওয়েটার জিজ্ঞাসা করেছিল-আজ কী খাবেন? ভেড়ার মাংস?

ওয়েটার আবার জানতে চাইল-মাংসের সাথে ডিম চলবে তো?

লন্ডনে আসার পর সেই প্রথম ডিমের স্বাদ পেলাম।

এরপর আমি সিড আর টনির সাথেই রাতগুলো কাটাতাম। তাদের মধুচন্দ্রিমার গল্প শুনতাম।

এক রাত, টনি আমাকে বললেন আমরা কাল সকালে প্যারিস যাচ্ছি, আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন।

আমি কোনো কথা বললাম না।

আমরা প্যারিসের দিকে উড়ে গেলাম। শহরটা চমৎকার সুন্দর। উনি একটা সুন্দর লিমুজিন ভাড়া করেছিলেন। সবকটা ট্যুরিস্ট স্পট ঘুরে ঘুরে দেখা হল।

রবিবার সকালবেলা, টনি আমাদের নিয়ে ঘোড়ার দৌড় দেখতে গেলেন। কিন্তু আগের দিন খাওয়ায় কিছু গোলমাল হয়েছিল। আমরা সকলেই অসুস্থ হয়ে পড়েছি।

টনি ফোন করে বললেন –সিড এবং আমার শরীরের অবস্থা ভালো নয়। আমরা হয়তো ট্রাকে যেতে পারব না।

–আমিও পারব না।

–নীচে একটা লিমুজিন দাঁড়িয়ে আছে, আপনার জন্য, ওটাতে চড়ে বসুন।

টনি?

–না, গেলে হয়তো ভালোই লাগবে।

আমি একা গিয়েছিলাম, অর্ধ অচেতন অবস্থায়। কী ঘটেছে কিছুই বুঝতে পারিনি।

আমি ফরাসি ভাষা জানি না, কোনোরকমে ভাঙা ভাঙা ইংরাজি দিয়ে কথাবার্তা চালাচ্ছি।

ঘোড়দৌড়ের লড়াইটা চমৎকার, আমি দুনম্বর ঘোড়ার পেছনে বাজি ধরলাম, কিছু টাকাও হাতে পেয়েছিলাম, এই অভিযানের কথা আমি কখনও ভুলব না। ভাবলাম প্রত্যেক বছর অন্তত একবার ইউরোপে আসতেই হবে।

আগস্ট মাস, ডোরে আর কেওর প্রধান হিসেবে সই করেছেন।

আমাকে ন্যানসি গোস নামে একটি ছবির চিত্রনাট্য লেখার জন্য বলা হয়েছে। এখানে বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীরা অভিনয় করবেন।

জো পাস্টারনক এই ছবিটার প্রযোজক। মধ্যবয়সী হাঙ্গেরীয় মানুষ, কথার মধ্যে হাঙ্গেরীয় টান আছে। এম জি এম আসার আগে তিনি ইউনিভারসালের হয়ে বেশ কয়েকটা কাজ করেছেন। ইউনিভারসালের অবস্থা এখন ভালো নয়, অনেক টাকার ধার দেনা হয়ে গেছে। ডেনা নামে এক অল্পবয়সী অভিনেত্রীকে এমজিএম থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সে ইউনিভারসালে যোগ দিয়েছিল, জো পাস্টারনক ডেনাকে সঙ্গে নিয়ে থ্রি স্মার্ট গার্লস নামে একটি ছবি তৈরি করেছেন।

অবাক কাণ্ড, ছবিটা সকলের হৃদয় জয় করল। রাতারাতি ডেনা এক বিখ্যাত অভিনেত্রী হয়ে গেলেন। ইউনিভারসাল মরে যাওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেল। এরপর জো পাস্টারনক এমজিএমে যোগ দিলেন এক প্রযোজক হিসেবে।

একদিন ডোরে একটা মিটিং ডাকলেন। সকলেই অফিসে বসে আছেন, ডোরে বললেন – আমাদের একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। টি অ্যান্ড সিমপ্যাথি নামে একটা ছবি আমি এইমাত্র কিনেছি। ব্রডওয়েতে এই ছবিটা হিট হয়েছিল কিন্তু সেনসার অফিস এই ছবিটা প্রদর্শনের অনুমতি দিচ্ছে না। এতে সমকামিতার দৃশ্য দেখানো হয়েছে। আমরা ব্যাপারটাকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার চেষ্টা করছি। আমি আপনাদের মন্তব্য শুনতে চাইছি।

কিছুক্ষণের নীরবতা, একজন প্রযোজক বললেন সমকামিতার বদলে আমরা লোকটিকে অ্যালকোহলিক করতে পারি।

আরেকজন মন্তব্য করলেন- হ্যাঁ, তাকে তো ড্রাগে আসক্ত করা যায়।

-তাকে প্রতিবন্ধী করে দিন।

অনেকগুলো কথা ভেসে এল, কোনোটাই মনঃপুত নয়।

আবার কিছুক্ষণের নীরবতা, জো পাস্টারনক বললেন- ব্যাপারটা খুবই সহজ, এই ছবিটা যেমনই আছে তেমনই রাখুন। মানুষটা সমকামী এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সবশেষে মনে হবে এসবই একটা স্বপ্ন।

এভাবেই মিটিংটা শেষ হয়ে গেল।

ন্যানসি গোস টুরাওর শুটিং শুরু হয়েছে। এই শুটিং-এ আমার সাথে লুইসের পরিচয় হল। অসামান্য অভিনেতা। থিয়েটারের জগতে যুক্ত ছিলেন। রাজকীয় অভিজাত্য আছে শরীরের মধ্যে, তীক্ষ্ণ নাক এবং উজ্জ্বল গায়ের রং। কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য আছে। তিনজন অভিনেত্রীকে পর পর বিয়ে করেছিলেন। কথার মধ্যে কৌতুক ঝরে ঝরে পড়ছে। দি ম্যাগনিফিসেন্ট ইয়াংকি-তে অসাধারণ অভিনয় করেছেন।

লুইস একদিন আমার বাড়িতে এলেন ডিনার খাবার জন্য।

আমরা দুজনে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। এই ভাবে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল।

একজন এজেন্ট আমার সাথে এক সুন্দরী অল্পবয়সী সুইডিস অভিনেত্রীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। তার নাম ইনগ্রিড। সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে ইউনিভারসালের একটা পরীক্ষাতে বসেছে। আমাদের মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠল।

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে, রবিবার সকালবেলা, আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। দরজায় বেলটা বেজে উঠল। আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম। ভোর চারটে। এখন কে এল? আমি কোনো রকমে আলখাল্লা জড়িয়ে দরজা খুলে দিলাম। একজন ভদ্রলোক হাতে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে ভেতরে এল।

সে বলল-কুকুরীর বাচ্চা, তোকে আমি মেরে ফেলব।

আমি অবাক হয়ে গেছি। আমাকে মরতে হবে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি বললাম।

-না, তুই আমার বউ-এর সাথে শুয়েছিস।

ওর বোধহয় কোথাও ভুল হচ্ছে। আমি কখনও বিবাহিতা মেয়েদের সাথে সম্পর্ক করি না।

আমি বললাম- কে আপনার স্ত্রী আমি কিছুই জানি না।

ইনগ্রিড। সে বন্দুকটা তুলে বলল।

আমি আমতা আমতা করে বলি, এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন, ইনগ্রিড কিন্তু কখনও আমাকে বলেনি সে বিবাহিতা।

-ওই কুকুরী আমাকে বিয়ে করেছে, তাই এই দেশে আসার ভিসা পেয়েছে সে।

আমি বললাম- এখনই আঘাত করবেন না। এটা একটা নতুন খবর। তার হাতে বিয়ের আংটি নেই, সে স্বামীর কথা উচ্চারণ করেনি। আমি কীভাবে জানব। আপনি বসুন, আসুন কথা বলা যাক।

লোকটা শেষ পর্যন্ত বুঝল, আমার সমস্ত শরীর দরদর করে ঘামছে।

লোকটা বলল -আমি এরকম নই, আমি ওকে ভীষণ ভালোবাসি, আর ও আমার সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে।

-আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না, আসুন একটু ড্রিংক করা যাক।

আমি ড্রিংক তৈরি করলাম, পাঁচ মিনিট কেটে গেছে, সে আমাকে তার জীবনের গল্পটা শোনাল। সে একজন লেখক, ইউরোপে তার সঙ্গে ইনগ্রিডের আলাপ হয়েছিল। ইনগ্রিড হলিউডে আসার জন্য ছটফট করছিল, লোকটারও মনে তাই হচ্ছে।

আমি বললাম আপনি একটা চাকরি চাইছেন? আমি সেই চাকরির ব্যবস্থা করব। আমি মেট্রোতে কেনেথ ম্যাককেন্নার সঙ্গে কথা বলব।

লোকটার মুখে উজ্জ্বল আলো-সত্যি বলবেন?

পাঁচ মিনিট কেটে গেছে, সে এবং তার বন্দুক চোখের সামনে থেকে কোথায় হারিয়ে গেছে।

আমি আলো জ্বালোম, বুঝতে পারছি তখনও ঘোরটা কাটেনি। আবার ঘুমিয়ে পড়লাম, সামনের দরজায় শব্দ হল।

তার মানে? লোকটা কি আবার ফিরে এসেছে? সে কি তার মন পালটেছে? আমাকে মেরে ফেলবে?

আমি দরজা খুলে দিলাম, ইনগ্রিড দাঁড়িয়ে আছে। তার সমস্ত শরীরে রক্তের দাগ। মুখ ফুলে গেছে, চোখের তলায় কালো কালশিটে পড়েছে। ঠোঁট দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। আমি তাকে ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে নিলাম।

সে কোনোরকমে বলল-সেলডন, তোমায় কিছু কথা বলার আছে।

-না, তুমি কেন বলোনি তোমার বিয়ে হয়ে গেছে। তুমি বিছানাতে শুয়ে পড়ো। আমি ডাক্তার ডেকে আনছি।

আমি এক ডাক্তারের ঘুম ভাঙলাম। এক ঘণ্টা কেটে গেছে, ইনগ্রিডের অবস্থা সত্যিই শোচনীয়। সমস্ত শরীরে কাটা চিহ্ন, হাতের হাড় ভেঙে গেছে।

ডাক্তার চলে গেছেন। ইনগ্রিড বলল -আজ সকালে ইউনিভারসালে যেতে হবে, স্ক্রিনটেষ্ট আছে।

আমি মাথা নেড়ে বললাম না, টেস্টটা আজ বাদ দিতে হবে।

আমি তাই করেছিলাম।

ইনগ্রিড সন্কেবেলা চলে গেল, তারপর? কোথায় গেল সে?

১৯৪৮, একটা নতুন প্রযোজনার দল তৈরি হয়েছে, তারা একদিন আমার সঙ্গে স্টুডিওতে দেখা করতে এল।

তারা বলল-আমরা ব্রডওয়েতে একটা ছবি নামাচ্ছি। ওয়ারস চার্লিং, এটা চার্লিস আন্ট নামে একটা ক্লাসিক উপন্যাসের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। চিত্রনাট্যটা আপনি লিখবেন? আমরা আপনার নামটাই প্রচার করতে চাইছি।

আমি এই কাজটা পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছি। চার্লিস আন্ট গল্পটা আমি জানি। গল্পটা অসাধারণ। ভেবেছিলাম এটা জনসাধারণের মন জয় করবে।

ফ্রান্সের সঙ্গে কোথায় দেখা হবে?

ফ্রান্স বেশ কয়েকজন প্রিয় গান লিখেছে।

পাস্টারনকে দেখা গেল তার স্টুডিওতে, ত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেছে, যথেষ্ট প্রতিভা আছে, উচ্চাকাঙ্ক্ষী। যুদ্ধের সময় যে গানগুলি লোকের মুখে ফিরতে তার অনেকগুলো তারই লেখা।

আমরা দুজন মত বিনিময় করলাম।

আমি ডোরের কাছে চলে গেলাম। তিনমাসের ছুটি চাইলাম। ব্রডওয়েতে একটা শো। দেখাতে যেতে হবে।

ডোরে মাথা নেড়ে বলেছিলেন- ব্রডওয়েতে যাবেন? অনিশ্চিত অঙ্ককার। ভালো থাকতে পারবেন তো?

আমি জোরের সাথে মাথা নেড়েছিলাম। তারপর আরেকটা প্রস্তাব এল, নতুন একটা ছবির চিত্রনাট্য লিখতে হবে। ছবিটার নাম হল অ্যানি গेट ইওর গান।

এটা ব্রডওয়ের সব থেকে বড়ো হিট হয়েছিল। তিন বছর ধরে একনাগাড়ে চলে।

১৯৪৫, হারবার্ট এবং ডরোথি ফেইল্ড, রিচার্ড রজার্স ও অসকারের সাথে একটা চুক্তি করেছে। তারা নতুন ছবি দেখাতে চাইছে।

নিউইয়র্কে কার্ন এলেন, তার একটা স্ট্রোক হয়েছিল, কদিন বাদে তিনি মারা যান। প্রস্তাবটা সেখানেই হয়তো থেমে যেত। ইতিমধ্যে আরভিন বার্লিনের সাথে রজার্সের যোগাযোগ হল। বেশ কয়েকটা হিট ছবি উপহার দেওয়া হল।

আমি নানা বিষয় নিয়ে চিন্তা করছি। হোয়ারস চার্লির খবর কী? আরভিন বার্লিনের সাথে আবার কাজ করার সুযোগ হবে।

আমি ডোরের প্রস্তাবটা উপেক্ষা করতে পারলাম না।

শেষ পর্যন্ত আমার সিদ্ধান্তের কথাটা মার্টিনকে জানিয়ে দিলাম।

আমার সিদ্ধান্তটা সঠিক বলে প্রমাণিত হল।

.

১৭.

আরভিন বার্লিনের সঙ্গে কাজ করার একটা উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতা। তার শক্তি কোনোদিন ফুরিয়ে যায় না। প্রত্যেকটি ব্যাপারের ওপর সংবেদনশীল নজর রাখেন।

আর্থার ফ্রেড তার অফিসে বসেছিলেন। আমাকে দেখে বললেন আমি একশোভাগ সুনিশ্চিত এটা জগত জয় করতে চলেছে।

আমি বললাম –আর্থার, কোন্ চরিত্রে কে অভিনয় করবেন সে সম্পর্কে কিছু ভেবেছেন?

–অ্যানির চরিত্রে জুডি গারলান্ড, একটা তরুণ অভিনেতাকে পাওয়া গেছে, তার নাম হাওয়ার্ড কিল, সে ফ্রান্সের চরিত্রে অবতীর্ণ হবে। বাফেলো বিল সাজবে লুই কালোরন। জর্জ সিডনিকে পরিচালনা করতে বলা হবে।

জুড়ির সাথে আবার দেখা হবে, ভাবতে ভালো লাগছে। আর্থার ফ্রেড আমাকে বলে।
ছিলেন-আপনাকে নিউইয়র্ক এবং শিকাগোতে নিয়ে যাব, নাটকটা দেখার জন্য।

এক্সেল মারমান নিউইয়র্কে অ্যানির চরিত্রে অভিনয় করেছেন। শিকাগোতে এই চরিত্রে
অবতীর্ণ হয়েছেন ম্যারি মার্টিন।

-আমি কখন যাব?

-কাল সকাল নটার সময় প্লেন ছাড়বে।

এটা একটা দারুণ ছবি। দেখা গেল দর্শকেরা ভালো ভাবেই গ্রহণ করেছে। আমি
শিকাগোতে গিয়ে ম্যারি মার্টিনের অভিনয় দেখলাম।

ম্যারি কিন্তু সম্পূর্ণ নিজের করে সংলাপটাকে সাজিয়েছে। তার অ্যানি এক লাজুক মহিলা,
তার চরিত্রের ভেতর একটা কোমনীয়তা আছে। আমি ভাবলাম এখেল মারম্যানের
অভিনয়টাও দেখতে হবে। সেটাও দেখে নিলাম, তার অভিনয়ের মধ্যে উত্তেজনার ছাপ
আছে।

শেষ পর্যন্ত আমি ঠিক করলাম, আমার অ্যানি গান্ধীর্ষ এবং তারুণ্যের সংমিশ্রণে তৈরি
হবে। তার মধ্যে অনেক মৌলিক বিষয় থাকবে।

প্রথম এবং দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যে অনেকটা সময় থাকছে। প্রথম অঙ্ক যেখানে শেষ হচ্ছে সেখানে দেখানো হচ্ছে অ্যানি ইওরোপে চলে যাচ্ছে। দ্বিতীয় অঙ্কের শুরুতে সে ইওরোপ থেকে ফিরে আসছে। কিন্তু এই দুটি অঙ্কের মধ্যবর্তী সময়সীমায় কে সেতু বন্ধন করবে?

আমি দেখাতে চেয়েছিলাম অ্যানি বিভিন্ন দেশে ঘুরছে, অথবা একটা দেশেই বসে আছে। ভেবেছিলাম বিরতিটা লম্বা না ছোটো করব। সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। তাহলে অনেক বেশি জায়গাতে শুটিং করতে হবে। প্রযোজক কি চাইবেন?

আমি আর্থার ফ্রেডকে অফিসে ডাকলাম। এই সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। একঘণ্টা বাদে সেক্রেটারী এসে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা বাতিল করে দিল। আমি পরের দিন আবার দেখা করতে চেয়েছিলাম। সেটাও বাতিল হয়ে গেল। পর পর তিনদিন এই ঘটনা ঘটল। তৃতীয়দিন বিকেলবেলা স্যামি আমার অফিসে এসে বসলেন, উনি বললেন- আর্থার ফ্রেডের অফিস থেকে আসছি, আপনার আচরণে উনি খুব দুঃখ পেয়েছেন।

-কেন কী হয়েছে?

-আর্থার বললেন আপনি নাকি লেখাটা এখনও শুরু করেননি।

-আমি তো আলোচনা করতে চেয়েছিলাম।

বুঝতে পারলাম আর্থার ফ্রেড এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে মোটেই আগ্রহী নন। তিনি ছবির অন্যান্য বিষয়গুলি দেখাতে চাইছেন, সংগীত পরিচালনা, নৃত্য সংযোজনা, অভিনেত্রীদের আচার-আচরণ। একটার পর একটা দৃশ্য কীভাবে তুলে ধরা হবে সেই

বিষয়ে নজর দিতে চাইছেন না। মনে পড়ল, ইস্টার প্যারাদের চিত্রনাট্য শোনার পর তার অভিব্যক্তি কেমন হয়েছিল।

আর্থার ফ্রেডের একটা অনবদ্য গুণ আছে, তিনি সঠিক লোককে সঠিক কাজের দায়িত্ব দেন। আমি নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম, চিত্রনাট্য লেখার কাজ এগিয়ে চলল, চিত্রনাট্য লেখা শেষ হল, পরের দিন জর্জ সিডনি আমার অফিসে এলেন।

-আমি কি সত্যি কথা বলব নাকি মিথ্যে প্রশংসা করব?

আমার মুখ শুকনো। সত্যিটা জানতে চাইছি। জর্জ সিডনি বললেন- কী কাজ হয়েছে? তারপর তার চোখ জ্বলে উঠল- আমরা একটা অসাধারণ ছবির জন্ম দিতে চলেছি।

এবার বিভিন্ন জায়গা থেকে নানা অভিমত শুনতে পেলাম। আর্থার ফ্রেড বললেন - সিডনি, আপনি সঠিক বিষয়টা ধরতে পেরেছেন।

জুডি এসে গেছেন, সময় এগিয়ে চলেছে, জুডির যখন কাজ থাকে না তখন তিনি আমার অফিসে এসে গল্পগুজবে মেতে ওঠেন।

জুডির মনের মধ্যে আশঙ্কা সিডনি সবকিছু ঠিকঠাক হবে তো?

-জুডি চিন্তা করবেন না, দেখবেন সকলের মনে এই ছবিটা দাগ কাটবে।

আমি জুডির দিকে তাকালাম, মেকাপের আড়ালে বিষণ্ণ দুটি চোখ।

আমি গুজব শুনতে পাচ্ছি, জুডি নাকি ঠিকমতো শ্যুটিং-এ আসছেন না। মাঝে মধ্যে সংলাপ ভুলে যাচ্ছেন। তার জন্য শ্যুটিংয়ের কাজে অনেক ক্ষতি হচ্ছে। তিনি জর্জ সিডনিকে রাত্রি দুটোর সময় ফোন করে জানাচ্ছেন যে পরের দিনের সেট বাতিল করতে।

শেষ পর্যন্ত শ্যুটিং বন্ধ হয়ে গেল। জুডি গারলাভকে সরিয়ে দেবার কথা ঘোষণা করা হল। আমার মন বিষাদে আচ্ছন্ন। জুডির সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম, শুনলাম জুডি নাকি ইওরোপে চলে গেছেন, হতাশ হয়ে।

এবার অ্যানির ভূমিকাটা বেটি গ্যারেটকে দেওয়া হল, অল্পবয়েসী এক প্রতিভাশালী অভিনেত্রী, শেষ পর্যন্ত তার এজেন্টদের ঝামেলায় এই চরিত্রটি সে হাতে পায়নি।

এবার বেটি হ্যাটনের সঙ্গে কথা হল। বেটি অ্যানির চরিত্রে অভিনয় করবে।

একদিন সকালবেলা, শ্যুটিং চলছে, আরভিন বারিলিন আমার অফিসে এসে বললেন – সিডনি, চলুন আমরা ব্রডওয়েতে একসঙ্গে একটা ছবি তৈরি করি।

আমার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে। আরভিনের সঙ্গে কাজ করা যে কোনো মানুষের স্বপ্ন। আমি বললাম, ঠিক আছে, কী লিখতে হবে বলুন?

–আমার মনে একটা গল্প এসেছে। উনি গল্পটা বলতে শুরু করলেন। আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম।

আমি বললাম সাড়ে বারোটোর সময় লাঞ্চ খেতে যেতে হবে, আমাকে এখন যেতে হচ্ছে, ফিরে আসি। তারপর গল্প শুনবো।

-কোথায় যাবেন?

-বেভারলি হিলসে, ব্রাউন ডারবিতে।

-চলুন আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।

আরভিন বারলিন আমার গাড়িতে উঠে বসলেন। আমি রেস্টুরেন্টে চলে গেলাম। আরভিন সেখানে বসে তার গল্পটা আমাকে শোনাতে শুরু করলেন। এক ঘণ্টা ধরে লাঞ্চ খাওয়া চলতে থাকল। তার চোখে মুখে একটা অদ্ভুত আশার বিচ্ছুরণ।

সেদিন বিকেলবেলা আরভিন বললেন-তিনি লস এঞ্জেলসে যাবেন। কারণ একজন নতুন গায়ক তার গানে গলা মেলাবেন। এখন আরভিনের বয়স ষাট বছর। ভদ্রলোক সৃজনশীলতার চূড়ায় উঠে গেছেন।

বিগত বছরগুলো খুব একটা সদয় ছিল না। আরভিন যখন নব্বইতে পা দিলেন, তখন তার শরীর অসুস্থ হয়ে যায়। টমি টিউন নামে এক ব্রডওয়ের প্রযোজক তাকে ফোন করেছিলেন। বলেছিলেন আরভিন ব্রডওয়ের এক সংগীত মুখর সিনেমাতে আমি আপনার কয়েকটা গান ব্যবহার করতে চাইছি।

-না, আপনি তা পারেন না।

-কেন?

আরভিন বলেছিলেন- অনেকেই আমার গান গাইছে।

আমার দুর্ভাগ্য, শেষ পর্যন্ত ওই স্বপ্নটা সফল হয়নি।

অ্যানি গেট ইওর গান চিত্রনাট্যটা ভালোই লিখেছিলেন। এই ছবিতে অনেকগুলো মোচড় ছিল।

জর্জ সিডনির পরিচালনায় কাজ শুরু হল। ১৯৫০ সালে ছবিটা মুক্তি পেল। সমালোচকেরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন।

১৯৫০- ভারাইটি পত্রিকাতে জনপ্রিয় ছবির তালিকা প্রকাশিত হল। তার মধ্যে আমার চিত্রনাট্যের তিনটি ছবি স্থান পেয়েছে। দ্য ব্যাচেলার অ্যান্ড দ্য ববি সক্রার, ইস্টার প্যারাড এবং অ্যানি গেট ইওর গান।

হতাশার মুহূর্ত হারিয়ে গেছে, আমি ভাবলাম আর কখনও ডাক্তারের শরণাপন্ন হব না। ডোনা হলওয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি, তার সাহচর্য আমাকে আনন্দ দিচ্ছে।

একদিন ডিনারের পর ডোনা বলল -মেরিলিন মনরোর সঙ্গে দেখা করবে?

-হ্যাঁ, আমি অবশ্যই যাব।

মেরিলিন মনরোকে সেক্স সিম্বল বলা যায়, জনপ্রিয় সুপারস্টার। উন্মাদ মায়ের সন্তান, অচেনা পরিবেশের মধ্যে শৈশব কাটিয়েছেন। বিয়েটা ফলপ্রসূ হয়নি। অ্যালকোহল এবং, ট্যাবলেটের সঙ্গে লড়াই করেছেন। কিন্তু কোনো কিছুই তার প্রতিভাকে হত্যা করতে পারেনি।

পরের দিন ডোনা বলল মেরিলিনের সাথে শুক্রবার রাতে ডিনার খেতে যেতে হবে। তার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে তাকে তুলে নিতে হবে।

ডোনা ঠিকানাটা দিল।

আমি শুক্রবার রাতের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। মারলিন মনরো, জেন্টলমেন প্রেফার ব্লোন্ডস, হান্ড টু ম্যারি এ মিলিওনেয়ার, মানকি বিজনেসের মতো অসাধারণ ছবিতে অভিনয় করেছেন, ক্যারি গ্রান্টের বিপরীতে।

সেই সন্ধ্যাবেলা এল, আমি মেরিলিনের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে গেলাম, একজন ভদ্রমহিলা আমাকে ভেতরে ডেকে নিল।

—মিস মনরো কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসছেন, উনি পোশাক পরছেন।

দেখতে দেখতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট কেটে গেল, মেরিলিনি তার বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলেন, রূপের এমন বলক দেখে আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে।

উনি আমার হাতে হাত রেখে বললেন –সিডনি, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালো লাগছে।
আপনার লেখা আমার ভালো লাগে।

আমরা বেভারলি হিলসের একটা রেস্টুরেন্টে ডিনার খেলাম।

আমি বললাম নিজের গল্প বলুন।

উনি কথা বলা শুরু করলেন। মাঝেমধ্যে বিখ্যাত কয়েকজন রাশিয়ান সাহিত্যিকের নাম বলছিলেন। যেমন হস্তো ভস্কি, পুশকিন। তার মানে? এই সুন্দর সুন্দর আড়ালে একটা উজ্জ্বল মস্তিষ্ক লুকিয়ে আছে। আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমি শুনলাম উনি আর্থার মিলার এবং এলিয়া কাজানের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়েছিলেন। এই দুজন ওনার গুরু হিসাবে চিহ্নিত। সন্কেটা আমি কখনও ভুলতে পারবো না, কিন্তু ওনার সঙ্গে আর কখনও কোথাও যাবার সুযোগ হয়নি।

কদিন বাদে উনি আর্থার মিলারকে বিয়ে করেছিলেন।

১৯৬২ সালের আগস্ট মাস, আমি আমার ডাক্তারের সাথে তার বাড়িতে বসে খাওয়া দাওয়া সারছি। হঠাৎ একটা ফোন এল, তিনি টেবিলে এসে বললেন আমি এখনই আসছি।

দু ঘন্টা বাদে উনি ফিরে এলেন।

—আমি দুঃখিত, উনি বললেন, একজন পেশেন্টের মৃত্যু হয়েছে, সে হল মেরিলিন মনরো। তখন মেরিলিনের বয়স মাত্র ছত্রিশ বছর।

হারি কোহনের সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয়েছিল, তখনই মনে হয়েছিল, তিনি ভবিষ্যতে এক কেউকেটা হয়ে উঠবেন। ডোনা হলওয়ের সাথে কলম্বিয়া পিকচার্সের প্রযোজনা বিভাগের প্রধান।

হারির সাথে আমার সম্পর্কটা বরাবরই ভালো ছিল। হারি আমাকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করেছে। হারির কথা আমি ভুলতে পারব না।

হারি কোহনের বয়স যখন মাত্র কুড়ি বছর, তখন তার সেরা বন্ধু ছিলেন হারি রুবি। তারা দুজনে মিলে নানা ধরনের কাজ করতে শুরু করেন। প্রথমে বাসে যোগ দিয়েছিলেন। কোহন ছিলেন কন্ডাকটর, হারি রুবি টিকিট নিতেন। তাদের মধ্যে ছিল অচ্ছেদ্য বন্ধন। পরবর্তীকালে তারা দুজনেই হলিউডে আসেন। তারা অতীত দিনের স্মৃতি রোমন্থন করতে থাকেন। হারি কোহন তখন একটা স্টুডিও চালাচ্ছেন, হারি রুবি নিজেকে এক সফল সংগীত রচয়িতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

হারি রুবি বলতে থাকেন সেই দিনগুলো ডায়নোসরের মতো হারিয়ে গেছে।

হারি রুবি মেয়েদের দিকে তাকান, তারপর তাকান কোহনের দিকে।

-তুমি সপ্তাহে আঠারো ডলার করে পেতে, আমি কুড়ি, তাই তো? হ্যারি কোহনের মুখ লাল হয়ে গেছে।

হ্যারি কোহনের সাথে কয়েকটা ডিনার পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম। প্রথমে তার সাথে আমার সম্পর্কটা ভালো ছিল না, তারপর সম্পর্কটা সরল হয়ে উঠল।

আমি বলেছিলাম রোজ সকাল নটায় আমি নিয়মিত লিখতে বসি, যেমন অফিসের যাত্রীরা অফিসে যায়।

তার মানে? তুমি কি লেখাটাকে একটা ব্যাবসা বলে মনে করো নাকি?

-তা হয়তো করি না, কিন্তু লেখার প্রতি আমি অত্যন্ত অনুগত।

দুজনে তর্ক-বিতর্ক শুরু হল, আমাকে উনি লাক্সে নিমন্ত্রণ জানালেন। উনি বললেন সেলডন, একজন প্রযোজকের সঙ্গে কথা বলতে হবে, তার আগে দেখব ভদ্রলোক কতখানি অনুগত।

-তার মানে?

-উনি শুধু আমার জন্যই কাজ করবেন। আমি একজন দামী পরিচালককে ভাড়া করতে পারি, একটা ফ্লপ হলে কী হবে? তার দাম অনেক কমে আসবে।

একদিন হ্যারি কোহনের অফিসে বসে আছি, স্টুডিও ম্যানেজারের কণ্ঠস্বর সন্টারকসে শোনা গেল।

-হ্যারি, ডোনা কথা বলতে চাইছেন। টনির রেজিমেন্টকে বাইরে পাঠানো হয়েছে। ডোনা তার সঙ্গে যেতে চাইছেন। সানফ্রান্সিসকোয়।

টনি আওয়েন, ডোনার স্বামী, একজন প্রযোজক-কোহন বললেন না এটা কখনই হতে পারে না।

এক মিনিট বাদে স্টুডিও ম্যানেজার ছুটে এসেছেন হ্যারি, ডোনা খুব ভেঙে পড়েছেন। অনেক দিন বাদে স্বামীর সঙ্গে দেখা হচ্ছে, তাকে আটকে রাখা কি উচিত হবে?

কোহন আবার বললেন না, আমি কখনই ছাড়ব না।

স্টুডিও ম্যানেজার আবার এলেন। বললেন হ্যারি, ডোনা কিন্তু কাঁদছেন। তিনি চলে যাচ্ছেন।

হ্যারি বললেন -ঠিক আছে, আমরা ওনাকে আর নেব না।

আমি কোহনের দিকে তাকালাম, অবাক হয়ে গেছি। কোন্ জীবন্ত দস্যুর সঙ্গে আমাকে ঘর করতে হচ্ছে।

জর্জ অরওয়েলের একটা অসাধারণ উপন্যাস পড়েছিলাম ১৯৮৪ সালে। এই উপন্যাসে বলা হয়েছিল রাশিয়াতে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা শুরু হবে। আমি ঠিক করলাম এটাকে নিয়ে একটা চিত্রনাট্য লিখব। আমি অরওয়েলের কাছে চিঠি পাঠালাম, অনুমতি চাইলাম।

ডোরের কাছে চলে গেলাম। ডোরে বললেন-বইটা আমিও পড়েছি, কিন্তু রাশিয়ার বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলা হয়েছে, যেটা প্রয়োজনা করা যাবে না।

-ডোরে, এটা একটা অসাধারণ নাটক হতে পারত।

-অরওয়েলের সাথে আলোচনা করলে ভালো হয়।

আমি ভাবলাম, তারপর বললাম ঠিক আছে আমি, অরওয়েলকে সবকিছু জানাচ্ছি।

প্রিয় মিঃ সেলডন, ৯ আগস্টের চিঠির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি বুঝতে পারছি এই বইয়ের ভেতর যে রাজনৈতিক বিতর্ক আছে তা নিয়ে আপনি চিন্তিত। এই বইতে সাম্যবাদের কথাই বলা হয়েছে। সাম্যবাদ একদিন সামগ্রিক মতবাদ হয়ে উঠবে এই সম্ভাবনার কথাই ঘোষণা করা হয়েছে। আমি জানি এই মতবাদ ইংরাজি ভাষাভাষীদের সমৃদ্ধ দেশের কাছে একটা আঘাত। আমি রাশিয়ার কথাও চিন্তা করছি। আমি কখনোই ব্রিটেনের লেবার পার্টিকে আক্রমণ করতে চাইছি না। আপনি এই চিত্রনাট্যটা করতে পারবেন কি? জানি না আমেরিকার গণমাধ্যম এটাকে কীভাবে নেবে?

ডোরা তখন খুবই ব্যস্ত, ১৯৮৪-র বইটা চিত্রনাট্য করব না এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম!

.

১৮.

সেনেট ম্যাকেনা আমার সাথে যোগাযোগ করলেন। রিচ ইয়ং অ্যান্ড প্রিটি নামে একটা ছবির চিত্রনাট্য লিখতে হবে। জেন ড্যানিয়েল ওয়েন্ডেল এবং তরুণী গায়িকা ভিক ডামন সেই ছবিতে অভিনয় করবেন। খুবই সুন্দর কুশীলব। এই গল্পটা এমন এক মহিলাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত যিনি তার মেয়েকে পরিত্যাগ করেছেন। অনেক বছর বাদে মেয়ের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।

একদিন সকালে জুলেস আমার সাথে দেখা করে বললেন –ডেরিস এবং আমি আপনার সাথে ডিনার খাব আজ। আমি কি আর কাউকে সঙ্গে আনব?

সেই সন্ধ্যায় জুলেস এবং ডেরিস এক অল্পবয়সী ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এলেন।

-এ হচ্ছে ফার্নানো লামাস, আপনার ছবিতে সে অভিনয় করবে।

ফার্নানডোর কথার মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার উচ্চারণ আছে। একদিন সে একজন খুব ভালো অভিনেতা হয়ে উঠবে এ বিশ্বাস আমার ছিল। কয়েকটি ছবিতে সে অভিনয় করেছিল।

রিচ ইয়ং অ্যান্ড প্রিটির সেট তৈরি হয়েছে, শ্যুটিঙের প্রথম দিন। ডরোথি কুপারের সহযোগিতায় চিত্রনাট্য লিখে ফেলেছি। এটা ভিক ডামিনের প্রথম ছবি, স্পষ্টতই তিনি খুব চিন্তিত ছিলেন। পরিচালক ছিলেন নরম্যান টাওরফ, এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক।

টাওরফ বললেন- এবার শ্যুটিং শুরু হবে।

ভিক ডামন বললেন মাফ করবেন মিঃ টাওরফ, একটু জল খেতে পারি?

নরম্যান বলেছিলেন- না, এখন জল খাওয়া চলবে না।

এইভাবেই শ্যুটিং শুরু হল।

বক্স অফিসে খুব একটা সফল হতে পারেনি।

আমি তখন রুথ ব্রুকসের সঙ্গে কাজ করছি তার একটা বিখ্যাত সংস্থা আছে। অনেকগুলো ছবির কাজ করতে হবে। নতুন একটা ছবির টাইটেল নাম দিলাম থ্রি গাইস নের্ড মাইক।

স্পিনকে সেটা দেখালাম, খুব একটা খারাপ হয়নি। নতুন পরিচালককে নেওয়া হল।

বিভিন্ন খবরের কাগজের পাতায় সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। অনেকেই আমাকে তীক্ষ্ণভাবে আক্রমণ করেছেন।

এবার জাস্ট দিস ওয়ানসের চুক্তি করতে হল। ম্যাক্সট্রেলের লেখা একটা গল্পের নাট্যরূপ আমাকে লিখতে হবে। এমন একটা মানুষের জীবন যে মানুষটি খুবই কৃপণ, পৈত্রিক সম্পত্তি টিপে টিপে খরচা করে।

লেখাটা শেষ হল, ক্যারি গ্রান্টকে দেখালে কেমন হয়? স্টুডিও লেখাটা ক্যারির কাছে পাঠিয়ে দিল। উনি রাজি হলেন না।

পিটার লফোর্ডকে প্রধান ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল। জ্যানেট লে এবং লুইস স্টোন জাজ হার্ডিকেও ডাকা হল।

একবছর কেটে গেছে, ছবিটা প্রকাশিত হল। ক্যারি আমাকে বলেছিলেন- সিডনি, তুমি অভিনয় করলে না কেন?

জাস্ট দিস ওয়ানস আমার খুব পরিচিত এবং প্রিয় সিনেমা।

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী, কেনেথ ম্যাককান্না আমাকে ডেকে পাঠালেন।

আমরা ব্রডওয়ের একটা থিয়েটার কিনেছি, রিমেস টু বি সিন নামে। আমি সমালোচনাগুলো পড়লাম, খুব ভালো সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। হাওয়ার্ড লিভসে এবং রাসেল ক্রাওসে এটা লিখেছেন। এটা একজন মহিলা ব্যান্ড সিংগারের জীবন অবলম্বনে লেখা হয়েছে। ওই ভদ্রমহিলাকে একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হয়। তার বিত্তশালী কাকাকে কে বা কারা হত্যা করে। তাকেই সম্ভাব্য হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

ছবিটা দারুণ, কিছু কিছু ঘাত প্রতিঘাত আছে।

আমি নিউইয়র্কে চলে এলাম, ট্রেনে বসে রিমেক্স টু বি সিনের চিত্রনাট্যটা পড়লাম।

লেলান্ড হেওয়ার্ডের সাথে লাঞ্চ খেলাম প্লাজা হোটেলে। তিনি পামেলা চার্লিকে বিয়ে করেছিলেন, বিয়ে করেছিলেন মার্গারেট স্যালিভান এবং ন্যানসি হককে, সকলেই জগত সেরা সুন্দরী। ভদ্রলোকের মধ্যে আলাদা একটা পৌরুষ আছে। নিজেকে সফল করতে পারেন।

লেলান্ড টেবিল থেকে উঠে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন –আপনার সাথে দেখা হয়েছে বলে ভালো লাগছে।

আমরা ছবিটার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করলাম।

অসাধারণ অভিনেতা অভিনেত্রীদের জড়ো করা হয়েছে। কাকে ছেড়ে কার নাম বলব।

আমি হলিউডে ফিরে গিয়ে চিত্রনাট্য লেখার কাজে মনোনিবেশ করলাম। তিনমাস বাদে সেটা শেষ হল, আমি প্রযোজক আথরের হাতে তুলে দিলাম, উনি বললেন, লেখাটা ভালো হয়েছে। এখনই শ্যুটিং শুরু হবে।

কে কোন ভূমিকাতে অভিনয় করবে তা কি ভেবেছেন?

জুডি এবং ভ্যানের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে।

কদিন কেটে গেছে, ডোরে আমাকে তার অফিসে ডাকলেন। বেঞ্জামিন গুডম্যানের চরিত্রে লুইস ক্যালহানন আসছে।

আমি বললাম হ্যাঁ উনি একজন দারুণ অভিনেতা।

-একটা সমস্যা।

-কী সমস্যা?

-অভিনয়টা উনি করতে চাইছেন না, কারণ সংলাপ বিশেষ কিছু নেই।

ডোরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন- লুইসের সাথে আপনার যোগাযোগ কেমন? ভালো তো?

আমি বললাম- হ্যাঁ।

-তাহলে আপনি কথা বলুন। উনি অভিনয় করলে এই ছবিটা একটা অন্য মাত্রা পাবে।

পরের দিন রাত্রিবেলা আমি ক্যালহাননকে একটা ডিনারে নেমন্তন্ন করলাম। তিনি এসে বললেন-যদি কেউ আমাদের দেখে ফেলে তাহলে সর্বনাশ। আমার একটা মুখোশ পরে আসা উচিত ছিল।

আমি আপনার সমস্যা বুঝতে পারছি, আপনি কেন বেঞ্জামিন গুডম্যানের চরিত্রে অভিনয় করতে চাইছেন না?

-এটা কী কোনো চরিত্র হল? তবে আপনার চিত্রনাট্যটা ভালো হয়েছে।

আমি বললাম-লুই, এটা একটা মস্তবড় ছবি হবে, আপনি না থাকলে খারাপ লাগবে। আপনার চরিত্রটা ছোটো হতে পারে, কিন্তু গল্পের সাথে জুড়ে গেছে। আপনার অভিনয়ের ওপর এই ছবিটা দাঁড়িয়ে থাকবে।

আমি আরও আধঘণ্টা ধরে বুঝিয়ে ছিলাম, শেষ পর্যন্ত উনি রাজি হয়েছিলেন।

বক্স অফিসে যা রিভিউ প্রকাশিত হল তা আমাদের অবাক করে দিয়েছে। ক্যালহাননের নাম লোকের মুখে মুখে ঘুরছে।

প্রত্যেক বছর এম জি এমের মুভির একটা প্রদর্শনী হয়ে থাকে। অনেকে দেখতে আসেন।

-আপনি ছবি প্রযোজনা করবেন?

আমি অবাক কী করে করব?

-আমরা সেটা চিন্তা করছি, আজ থেকে আপনি হলেন একজন প্রযোজক।

-আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না।

উনি বললেন সব শিখিয়ে দেওয়া হবে।

আমার বয়স চৌত্রিশ বছর। আমি অস্কার পেয়েছি। এখন প্রোডিউসার হতে চলেছি। কোন্ কোম্পানি, যারা এই ব্যাপারে এক নম্বর। তখন মনে হল, আমার মনে আনন্দ থাকা উচিত কিন্তু ভয় লাগছে কেন? আমি এত চিন্তিত কেন?

রাতে ঘুমোত পারিনি। মধ্য রাতে পোশাক পরে বাইরে বেড়াতে বেরোলাম। একটার পর একটা অভাবিত ঘটনা ঘটে চলেছে। মনে পড়ে গেল, বাবা সে রাতে আমাকে পথে ডেকে নিয়েছিল। বলেছিল, প্রত্যেকটা দিন একটা আলাদা বার্তা নিয়ে আসবে, সিডনি। জীবন একটা উপন্যাসের মতো। শেষ পাতায় পৌঁছোনো না পর্যন্ত আমরা জানি না, কোন্ গল্পটা আমাদের জন্য লেখা হয়েছে।

সকালবেলা ঘুম ভেঙে গেল। আমি চিন্তা করলাম এবার আমি প্রযোজক হব। এক্ষেত্রে যদি কোনো পদস্থলন হয়ে যায় তা হলে আবার লেখকের জীবন যাপন করব।

— আমি স্টুডিওতে গেলাম। আমাকে একটা মস্ত বড়ো অফিস দেওয়া হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম, মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ারের মতো এখানেও সরল সাদা সিঁধে উপস্থাপনা থাকবে। কিন্তু এখানে সব কিছুই রাজকীয়।

প্রোডিউসারদের হাতে রাইটারদের তালিকা তুলে দেওয়া হয়। যখন চিত্রনাট্যটা শেষ হয়ে যায়, তখন কাস্টিং ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলতে হয়-কে কোন ভূমিকাতে অবতীর্ণ হতে পারে তার একটা তালিকা তৈরি করতে হয়।

শেষ পর্যায়ে এজেন্টদের সাথে যোগাযোগ করতে হয়। অনেক ঝামেলা ঝঙ্কি পোহাতে হয়।

একদিন সন্কেবেলা আমি খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। হলিউডের বিখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার অতিথি হিসেবে যারা এসেছিলেন, সেই তালিকার দিকে চোখ বুলালে অবাক হতে হয়। এসেছিলেন আলফ্রেড নিউমাইন, চেহারাটা ছোটো হলে কী হবে সৃজনশীলতায় ভরপুর। তাকে অনেকবার অস্কারের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। এমন নামকরা সংগীত বিশেষজ্ঞের সন্ধান খুব একটা পাওয়া যায় না। তিনি দুশোরও বেশি ছবিতে গান দিয়েছেন।

এসেছিলেন ভিক্টর ইয়ং, তাকে ২২তম অস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। তিনি বেশ কয়েকটা ছবির গান লিখেছেন।

ছিলেন ডিমিত্রি টায়োমকিন, যিনি বেশ কয়েকটা ছবির গান লিখেছিলেন।

আর ছিলেন জোহনি গ্রিন, যাঁর চিত্রনাট্য এবং গান সকলের মন জয় করেছে।

অ্যাড্রে প্রেভিনকেও চোখে পড়ল। এই ভাবেই সেদিন সন্ধ্যায় অনেক বিশিষ্ট মানুষ আমার সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন।

দি আদার সাইড থা মাঁ । সিডনি জেলডন

এর পাশাপাশি এক অল্প বয়সী অভিনেত্রীর কথা বলা উচিত। আমি ছোট পিয়ানোর পাশে এসে বসেছি। বলা হল, আমি এখন পিয়ানো বাজাব।

আমি পিয়ানো বাজাতে শুরু করলাম। কে যেন বলল- সিডনি, বাধা দিচ্ছি বলে দুঃখিত।
কাল সকালে, ডাকব, কেমন?

আমি উঠে দাঁড়লাম-জেনেথ, আমি মোটোলে যাব কি?

আমি মোটোলে পৌঁছে গেলাম, পাঁচ মিনিট সেখানে ছিলাম। আমি ফিরে এলাম। আবার পিয়ানো বাজাতে শুরু করেছি। কী আশ্চর্য। পিয়ানো কোথায়? অতিথিরা কে কোথায় চলে গেছেন? আমি সকলের মুখের দিকে তাকালাম। উত্তর নেই!

মনের ভেতর একটা অদ্ভুত আতঙ্ক।

.

১৯.

আমি একজন প্রযোজক, আমার অফিসে সবসময় কর্ম ব্যস্ততা। ব্যাপারটা ভাবতে কেমন অবাক লাগছে।

সকাল থেকে ঘড়ির কাটা ধরে কাজ শুরু হয়। কতরকম কাজ করতে হয়। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্কে গড়িয়ে রাত হয়ে যায়।

ভালো লাগে, আবার এত উত্তেজনা ভালো লাগে কি? কত অ্যাপয়েন্ট, সাংবাদিকদের সঙ্গে সম্মেলন, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাথে আলোচনা।

ডোরের সাথে কথা বলছি। একটার পর একটা ছবির অভিযান শুরু হচ্ছে। লাঞ্চ করার সময় পাচ্ছি না। দেখা হল জিসা নামে এক কিশোরী বাদামী চুলের কন্যার সাথে। জিসা আমার সাথে সহজেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। তাকে নিয়ে লাঞ্চ খেতে গেলাম। হলিউডের বাজারে তখন জিসা সকলের হট ফেবারিট। সে আমার সাথে পরিচিত হয়ে খুবই আনন্দিত। তার মাধ্যমে জর্জিয়ার সাথে আলাপ হল। জর্জিয়ার দিকে তাকিয়ে আমি বললাম- তুমি কি অভিনেত্রী হতে চাও? এর মধ্যে কোনো অভিনয় করেছ?

জর্জিয়া বলল দু একটা ছবিতে।

আমি আরও ভালোভাবে তাকে দেখলাম। হ্যাঁ, তার চরিত্রের মধ্যে একটা চুম্বক আকর্ষণ আছে। রাজকীয় অনুভব আছে তার চেহারার মধ্যে, বুদ্ধিদীপ্ত দুটি বাদামী চোখের তারায় আনন্দের উদ্ভাস। প্রতিশ্রুতি জ্বলজ্বল করেছে। কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণতা।

আমি বললাম তুমি আমার অফিসে এসো, দুজনে একসঙ্গে লাঞ্চ খাব।

জর্জিয়া কোনো কথা বলল না।

পরের দিন অফিস যাবার সময় ডেভিসকে দেখতে পেলাম। আমার প্রিয় বন্ধু।

-জেরি, আমি একজনকে বিয়ে করতে চলেছি।

-সে কে?

-না-না, এখনই বলব না।

পনেরো মিনিট বাদে জিসা আর জর্জিয়া আমার অফিসে এসেছে।

আমি বললাম -বসো।

আমরা নানা বিষয় নিয়ে গল্প করলাম।

আমি জর্জিয়াকে বললাম তুমি কি আমার সাথে ডিনার খাবে? তোমার ফোন নম্বর কত?

জর্জিয়া বলল না, আমি খুব ব্যস্ত থাকব।

জিসা জর্জিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল-বোকামি করো না। সিডনি একজন প্রযোজক।

জর্জিয়া বলল না, আমি অভিনয় করতে চাইছি না।

জিসা জর্জিয়ার ফোন নাম্বারটা আমাকে দিল। জর্জিয়া খুব ভেঙে পড়েছে।

আমি বললাম-কেন, তুমি কি ডিনার খাবে না?

জর্জিয়া উঠে বলল আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে বলে ভালো লাগছে মিঃ সেলডন।

আমি অনুভব করলাম, ঘরের পরিবেশের মধ্যে কেমন শৈত্যতা বিরাজ করছে।

ওরা দুজন চলে গেল- ব্যাপারটা কী?

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। জর্জিয়াকে টেলিভিশনে দেখা গেছে। মোশন পিকচারে, ব্রডওয়েতে, স্টেলার ভূমিকাতে সে অসাধারণ অভিনয় করেছে। সর্বত্র তার প্রশংসা প্রকাশিত হয়েছে।

পরের দিন সকালে জর্জিয়াকে ফোন করলাম। ডিনারে আমন্ত্রণ জানালাম।

জর্জিয়া বলল -আমি খুবই ব্যস্ত।

আমি পরপর তিন-চার দিন ফোন করে একই উত্তর পেলাম।

পঞ্চম দিনে আমি বললাম -জর্জিয়া, শুক্রবার রাতে আমি একটা ডিনার পার্টি দিচ্ছি। বিখ্যাত প্রযোজক এবং পরিচালকরা সেখানে আসবেন। আমার মনে হয়, তুমি সেখানে এলে ভালোই হবে। অন্তত তোমার কেরিয়ারের কথা চিন্তা করে এসো।

অনেকক্ষণ বাদে সে বলল- চেষ্টা করব।

তার মানে? সে আমার সাথে একা সময় কাটাতে চাইছে না।

সত্যি সত্যি আমি একটা মস্ত বড়ো পার্টির আয়োজন করেছিলাম।

শেষ পর্যন্ত ওই পার্টিটা জমে উঠল। বেশ কয়েকজন পরিচালক এবং প্রযোজক এসেছিলেন। তারা ইতিমধ্যেই জর্জিয়ার অভিনয় দেখেছেন।

সন্ধ্যাটা শেষ হয়ে গেল।

আমি জর্জিয়াকে বললাম কেমন লাগল?

-ধন্যবাদ।

-আমি কি তোমাকে বাড়িতে পাঁছে দেব?

-না, আমার গাড়ি আছে, সন্কেটার জন্য ভালো লাগল।

-এক মুহূর্ত অপেক্ষা করো। তুমি কি একা একা আমার সঙ্গে ডিনার খাবে?

জর্জিয়া বলল ঠিক আছে, তার কথার মধ্যে উৎসাহ ঝরে পড়ছে।

আমি পরের দিন সকালে বললাম আজকে রাতে যাবে?

এই প্রথম সে বলল-হ্যাঁ, যাব।

-আমি তোমাকে ৭-৩০ মি. এ তুলে নেব।

এভাবেই শুরু হয়েছিল।

আমরা চাসেনস ডিনার খেলাম। একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে কথা বলছি, তার কথার মধ্যে শুধুই অভিনয় থাকবে। কিন্তু সে খুব সহজ সরলভাবে কথা বলছে।

সে বলেছিল অনেক মেয়ের সাথে তুমি ঘুরে বেড়াও, তুমি কি আমাকে তাদের তালিকা ভুক্ত করতে চাইছ?

আমি বলেছিলাম না, জর্জিয়া। তুমি একবার সুযোগ দিয়ে দেখো।

সে বলেছিল ঠিক আছে, আমি সুযোগ দিলাম।

জর্জিয়ার সাথে প্রতি সন্ধ্যায় দেখা হচ্ছে। যতই তাকে দেখছি, ততই ভালোবেসে ফেলছি। তার মধ্যে একটা সুন্দর স্বভাব আছে। আমরা অনেক বিষয় নিয়ে হাসাহাসি করি। আমরা একে অপরের প্রতি আরও অনুগত হয়ে উঠলাম।

তিনমাস কেটে গেছে। আমি তাকে জড়িয়ে ধরে বললাম- এসো, এবার আমরা বিয়ের আসরে যাব।

পরের দিন আমরা ভেগাসে চলে গেলাম। আমি, মা এবং মারতিকে হলিউডে আসতে বলেছিলাম। জর্জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে। তারা একে অন্যকে ভালোভাবে নিল। মা জর্জিয়াকে একশোটা প্রশ্ন করেছিল। তারপর মা বলেছিল মেয়েটা সত্যিই ভালো।

আমি ভেবেছিলাম, ইওরোপে যাব মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে। বেভারি হিলসে একটা ছোট বাড়ি কিনেছি।

দি আদার সাইড থা মাঁ । সিডনি সেনডন

বাবা আর তার নতুন বউ অ্যান তখন লস এঞ্জেলসে থাকছে। আমি বাবাকে জর্জিয়ার কথা বললাম।

বাবা আনন্দে হাততালি দিয়ে বলেছিল দারুণ। কবে যাব? বিয়েতে তোকে কী দেব?

বাবা তখন একটা ব্যবসা শুরু করেছে। আমার বাড়ির চারপাশে অ্যালুমিনিয়ামের পাঁচিল তুলে দিল। খুবই প্রয়োজন ছিল।

আমি কেনেথ ম্যাককেল্লাকে বললাম-তিনমাসের ছুটি নেব।

জর্জিয়া আর আমি ভাসতে ভাসতে ইওরোপ চলেছি। এটা স্বপ্নের মধুচন্দ্রিমা। লন্ডন, প্যারিস, রোম এবং ভেনিস যাব। এত সুখী আর কখনও হইনি।

শেষ পর্যন্ত ফিরে আসার সময় হল। লস এঞ্জেলসে ফিরে এলাম। বাবা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

আমরা বাড়িতে ফিরে এলাম। বাবা বলল-এ জিনিসটা তোদের ভালো লাগবে।

-হা, অ্যালুমিনিয়ামের পাঁচিলটা শেষ হয়েছে।

বাবা আরও বলল-এটাই আমার উপহার।

জর্জিয়া তখন বেশ কয়েকটা টেলিভিশনে অভিনয় করছে।

দি আদার সাইড অফ ম্যাঁ । সিডনি সিলভার

এক রাতে জর্জিয়া একটা স্বপ্ন দেখল। সেই স্বপ্নটা খুব একটা ভালো ছিল না।

তার ঘুম ভেঙে গেছে।

১৯৫২র বসন্তকাল। এম জি এম-এ ফিরে এসেছি। ড্রিম ওয়াইফ নামে একটা ছোটো গল্পের চিত্ররূপ দিতে হবে। অ্যালফ্রেড লেভিটের লেখা।

যৌনতার লড়াই। অবিবাহিত একজন অন্যের প্রতি অনুরক্ত। ঘটনাটা হাসির দিকে গড়িয়ে চলেছে।

আমি এক তরুণ চিত্রনাট্য লেখককে খুঁজে পেলাম। হার্বাট বেকার। চিত্রনাট্যটা ভালোই হয়েছে।

প্রকল্পটা শেষ হল। সন্ধ্যাবেলা আমি কাজ করছি। টেলিফোনে কার কণ্ঠস্বর। হার্বাট বেকার।

আমি বললাম-কী খবর? এক ঘন্টা কেটে গেছে। বেকার আসছেন না কেন?

আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম।

সকাল চারটে বেজে গেছে। ড্রিম ওয়াইফাস্ট-এর চিত্রনাট্য শেষ হল। এবার কাস্টিং নিয়ে ভাবতে হবে।

কাকে নেওয়া যেতে পারে? আমি ক্যারি থান্ট এবং ডেবোয়রা কেরকে চেয়েছিলাম।

ক্যারির সাথে কথা হল। ক্যারি চিত্রনাট্যটাকে ভালো বলে ঘোষণা করেছে।

পরবর্তী দিনে একটা খারাপ খবর এল। ক্যারি অন্যান্য ছবি নিয়ে ব্যস্ত।

আমি ক্যারির সাথে লাঞ্চার ব্যবস্থা করলাম। বললাম -ক্যারি। পরিচালকরা বলছেন, আপনি নাকি ফাঁকা নেই।

ক্যারি বললেন -কে এটা পরিচালনা করবেন?

কে?

-আপনি।

-আমি? আমি তো কখনও কোনো ছবি পরিচালনা করিনি।

-আমি চাইছি, আপনি এটার পরিচালক হোন।

ওই বছরটা আমি ভুলতে পারব না। একজন মানুষ কত উঁচুতে উঠতে পারে!

আমি ডোরের সাথে দেখা করে বললাম -ক্যারি চাইছেন, আমি যেন ড্রিম ওয়াইফ-এর পরিচালনা করি।

ডোরে বললেন –হ্যাঁ, আজ থেকে আপনি একজন পরিচালক হলেন।

ব্যাপারটা অলৌকিক। কয়েক বছর আগে আমি এইসব মানুষদের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতাম। তারপর চিত্রনাট্য লেখা শুরু করি। এবার প্রযোজনা। সব শেষে পরিচালনা। আর কী বাকি থাকল।

আমার মন আনন্দে নাচছে। আমি অন্য সব পরিচালকদের কথা চিন্তা করলাম। যাঁদের সাথে ক্যারি কাজ করেছেন। আলফ্রেড হিচকক, জর্জ কুকার, লিও ম্যাককারি, হাওয়ার্ড হগস, আমি কি তাদের দলভুক্ত হব?

ডোরে বললেন –এক মুহূর্ত সিডনি। আপনি এই ছবির লেখক, পরিচালক এবং প্রযোজক। সমস্ত প্রশংসা কিন্তু আপনারই প্রাপ্য।

ব্যাপারটা আমার মনে থাকবে।

–আমার নাম কি প্রযোজক হিসেবে দেব?

–হ্যাঁ, দিতে পারেন।

এই কথাটাই আমার পেশাকে প্রায় ধ্বংস করেছিল।

কে কোন ভূমিকাতে অভিনয় করবেন? এখানে মধ্যপ্রাচ্যের এক রূপবতী রাজকুমারীর কথা আছে। আমি বেটা নামে এক অভিনেত্রীর কথা শুনেছিলাম। বেটা তখন লন্ডনে থাকেন। সাউথ প্যাসিফিকে অভিনয় করেছেন।

পরের দিন সকালবেলা আমাদের জাহাজ এগিয়ে চলল লন্ডনের দিকে। একটা অলৌকিক সমুদ্রযাত্রা। আমি ইওরোপে চলেছি দ্বিতীয় মধুচন্দ্রিমা যাপন করব বলে। যে মেয়েটিকে। ভালোবাসতাম, সে হয়েছে আমার জীবন সঙ্গিনী।

ট্রেন ধরে লন্ডনে পৌঁছে গেলাম। সেখানে কদিন থেকে এলাম প্যারিসে। হোটেল ল্যাংকাস্টারে উঠেছিলাম।

ইউনাইটেড আর্টিস্টদের প্যারিস অফিসে ফোন করলাম। ম্যানেজার বানসের সঙ্গে কথা বললাম। এখানে অবশ্য আর কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। জর্জিয়া আর আমি নানা জায়গা বেড়িয়ে এলাম। ম্যাক্সিমে ডিনার সারলাম।

পরের দিন সকালবেলা। জর্জিয়া তখনও ঘুমোচ্ছ। আমি বললাম- চলো, দশটার সময় ফিল্ম দেখতে যাব। তুমি কি তৈরি হবে না?

-আমার ভালো লাগছে না। তুমি একা যাও না। রাতে কোথাও ডিনার খেয়ে থিয়েটার দেখব।

-ঠিক আছে। আমি তাড়াতাড়ি আসছি।

ইউনাইটেড আর্টিস্ট একটা লিভিন পাঠিয়েছে। আমাকে তারা হেডকোয়ার্টারে নিয়ে গেল। মিঃ বানসের সঙ্গে দেখা হল। মাথার চুলের রং রূপোলী। রোগা চেহারার ভদ্রলোক।

তিনি বললেন আমরা সোজা থিয়েটারে চলে যাই।

আমরা মস্ত বড়ো থিয়েটারে প্রবেশ করলাম। এখানে বিভিন্ন সিনেমা প্রদর্শন করা হয়।

ছবিটা শুরু হল। ফরাসি দেশীয় ওয়েস্টার্ন ছবি। খুবই বাজে উপস্থাপনা। আমি বুঝতে পারলাম স্যামস স্পিগাল এতে মোটেই আগ্রহী হবেন না।

আমি দরজার দিকে তাকালাম। মিঃ বানস এবং এক অপরিচিত ভদ্রলোক কথা বলছেন।

ওই ভদ্রলোক বলছেন- জানুকের সাথে কথা হয়েছে। এটা কখনও হবে না। হ্যারি ওয়ার্নারও আগ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তা সত্ত্বেও হয়নি।

কীসের কথা বলা হচ্ছে।

আমি বললাম আমি কি আপনার নাম জানতে পারি?

উনি বললেন আমার নাম জেট হ্যারিস।

আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। তিনজনের কথাবার্তা শুরু হল।

আমরা হোটেলে পৌঁছে গেলাম। জর্জিয়াকে ফোন করলাম। জর্জিয়া নেমে এসেছে। জেটকে দেখে সে খুবই অবাক হয়ে গেছে।

জেট আমার কাজের প্রশংসা করলেন। জেট হ্যারিস একটা ছবির দায়িত্ব আমার ওপর দিতে চাইছেন।

আবার কথাবার্তা শুরু হল।

আমরা ইশান নদীর ধারে একটা রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করতে গেলাম। ওয়েটার জিজ্ঞাসা করল- কী ধরনের ওয়াইন খাবেন?

কেউ কিছু বলার আগে জেট বললেন -বিয়ার হলেই ভালো হয়?

ওয়েটার বলল স্যার, এখানে বিয়ার দেওয়া হয় না। শুধু ওয়াইন দেওয়া হয়।

জেট আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন -চলুন, আমরা এখান থেকে চলে যাব।

আমি বললাম- জেট?

জেট বললেন -বিয়ার না হলে আমি খেতে পারি না।

বিরক্ত হয়ে আমরা সবাই হোটেল থেকে বাইরে এলাম।

জর্জিয়া আর আমি যথেষ্ট বিভ্রান্ত। ট্যাক্সি ধরে হোটেলে ফিরে এলাম। সেখানেই ডিনার খেলাম।

ল্যাসি জেটকে বললেন, এই ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত। আমি জানি কোথায় গেলে
বিয়ার পাওয়া যাবে। কাল রাতে সেখানে যাব।

পরের দিন জেট আর আমি নতুন ছবির কাজ শুরু করলাম। সেদিন বিকেলে বুশ আমাকে তুলে নিয়ে গেল।

ল্যাসি জেটকে বলেছিলেন এই জায়গাটা আপনার ভালোই লাগবে। সেখানে বিয়ার খাওয়া হল।

পরের দিন জেট আমাদের স্যুইটে এসেছিলেন। আরও কিছু আলোচনা করার জন্য।

সকালে জর্জিয়া আর আমি ব্রেকফাস্টের জন্য বেরোতে যাচ্ছি।

হোটেল ম্যানেজার বললেন মিঃ সেলডন, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব। আপনার অতিথি আমার পরিচারিকাদের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে।

-আমি ওনাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করব।

সত্যি এই ব্যাপারটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না।

একদিন ব্ল্যাকফরেস্ট ঘুরে এলাম। সেখানে একটা সুন্দর ঝরনা আছে। দক্ষিণ পশ্চিম জার্মানিতে। রাইন এবং নেকটার নদীর মধ্যবর্তী জায়গাতে। দুপাশে পাইন অরণ্য, আছে উপত্যকা এবং ছোটো ছোটো লেক। জেট জায়গাটা ভালোবাসতে পারেননি।

আমরা অনেক কিছু দেখলাম ।

একদিন জর্জিয়াকে বললাম, মিউনিখে চলে যাব ।

জর্জিয়া বলল-হ্যাঁ, সেটাই ভালো হবে ।

জেট আমাদের ঘরে এসেছেন ।

আমি বললাম-জেট, জর্জিয়া আর আমি মিউনিখে যাচ্ছি । এখন আর আপনার সঙ্গে কাজ করতে পারব না ।

উনি বললেন ঠিক আছে, আমি দেখছি অন্য কী করা যায় ।

কয়েক ঘন্টা বাদে জর্জিয়া আর আমি ট্রেনে উঠে বসেছি । আমাদের গন্তব্য মিউনিখ ।

আমরা হোটেল এলাম । ল্যাসিকে ফোন করতে হবে । তখনই আবার হার্নিয়াটা কষ্ট দিল । অসম্ভব যন্ত্রণায় ছটফট করছি ।

জর্জিয়া বলল আমি কি একজন ডাক্তারকে ডাকব?

আমি বললাম না, আমাকে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকতে হবে । দু-একদিন বাদে আবার ঠিক হয়ে যাবে ।

শেষ অদি সে আমাকে বিছানায় তুলে শুইয়ে দিল। বলল-ল্যাসির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

এক ঘণ্টা বাদে ল্যাসি এসে গেলেন।

আমি বললাম এবার বোধহয় পরিকল্পনাটা সফল হবে না।

ল্যাসি বললেন -পল হর্নকে ডেকে আনব। তিনি একজন ফিজিওথেরাপিস্ট। তিনি অনেকের হার্নিয়া সারিয়ে দিয়েছেন।

পরের দুদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেটে গেল। তৃতীয় দিন ল্যাসির অফিসে যোগাযোগ করলাম। সেখানে পল হর্নের সঙ্গে দেখা হল। বছর চল্লিশ বয়স। লম্বা চেহারার মানুষ। আবার একটা নতুন ছবির কাজ শুরু হল।

পরের দিন সকালে আমার শুশ্রূষা শুরু হল। আমাকে অনেকক্ষণ টেবিলের ওপর শুয়ে থাকতে হয়। ঘণ্টা দুয়েক। সারাদিন ধরে এই পদ্ধতি কেবলই চলেছে।

পল হর্ন আমার অসুখটা অনেকটা সারাবার চেষ্টা করছেন।

তিন সপ্তাহ কেটে গেছে। এবার পরিশোবা শেষ হবে।

পল জিজ্ঞাসা করলেন- এখন কেমন বোধ করছেন?

আমি বললাম খুবই ভালো লাগছে।

উনি বললেন আপনি হয়তো সেরে গেছেন।

ওনার কথাটা সত্যি, এরপর আর কখনও আমাকে এই কষ্ট ভোগ করতে হয়নি। হর্ন।
একজন ডাক্তার নন, কিন্তু আমার অসুখটা সারিয়ে দিয়েছেন। এবার আমাকে হলিউডে
ফিরতে হবে।

এম জি এম-এ কাজ শুরু হল। ডোরে বললেন আমরা ইজিপসিয়ান থিয়েটারে ড্রিম
ওয়াইফটা দেখাব।

একটা মস্ত বড় প্রযোজনা। অনেক মানুষের ভিড় জমেছে। ছবিটা শুরু হল। জর্জিয়া
অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল -অসম্ভব ভালো উপস্থাপনা।

ছবিটা শেষ হল, সবাই হাততালি দিচ্ছে।

পরের দিন বিভিন্ন খবরের কাগজে সমালোচনা বেরোল। বেশির ভাগই প্রশংসায়
পঞ্চমুখ।

আমি বুঝতে পারলাম, এবার বোধহয় স্বপ্নটা সত্যি সত্যি সফল হল।

.

২০.

বেভারলি ডাইভের অফিসে এলাম। আমার এজেন্টের সঙ্গে দেখা হল। একটা ফোনের জন্য অপেক্ষা, ফোনটা তখনও পর্যন্ত আসেনি।

সিনেমার ক্ষেত্রে চিত্রনাট্য হল সব থেকে বড়ো অস্ত্র। সেক্ষেত্রে আমি জয়যুক্ত হয়েছি। কিন্তু অনেকগুলো স্বপ্ন এখনও সফল হয়নি।

আমার মনে হতাশার আবরণ, জর্জিয়া মাঝে মধ্যে টেলিভিশনের পর্দায় মুখ দেখাচ্ছে। এতে খরচ পোষানো যাচ্ছে না।

নতুন কিছু কাজ করতেই হবে, এম জি এম-এর অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। নতুন কাজের সন্ধানে কোথায় যাব।

অবশ্য অভিনেতা অথবা পরিচালকদের থেকে লেখকদের অবস্থাটা ভালো। লেখকের হাতে অনেকগুলো সম্ভাবনা থাকে।

এই দুঃখের দিনে জর্জিয়া বারবার সহানুভূতি জানিয়েছে। বলেছে তোমার মধ্যে অনেক সম্ভাবনা আছে। তুমি এক মহান লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

আমি কিছু লিখতে পারছি না। আমার মাথাটা একেবারে খালি হয়ে গেছে। আবেগের দিক থেকে আমি একটা মৃত মানুষে পরিণত হয়েছি।

১৯৫৩ সালের ৩০ জুলাই- হলিউড রিপোর্টার এবং হলিউড ভ্যারাইটিতে বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। ড্রিম ওয়াইফকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় দেখানোর ব্যবস্থা করা হল। এই মুভি সম্পর্কে তেমন কোনো বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি।

তার মানে এই মুভিটা কি মরে যাবে? আমি অবাক হয়ে গেছি।

আবার সমালোচনা- ভালো-মন্দ মেশানো।

একদিন সকালে ফোনটা বাজল, আমার এজেন্ট ফোন করেছে। বলা হল, প্যারামাউন্টে আগামীকাল সকালে যেতে হবে। প্রোডাকশনের প্রধান ডন হার্ডম্যানের সঙ্গে কথা বলতে হবে। •

ডন লেখক হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন। গোটা বারো সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছেন।

তার সাথে দেখা হল। পঞ্চাশ বছরের ভদ্রলোক, আন্তরিক আতিথেয়তা আছে। আমাকে দেখে উনি খুবই খুশী হলেন।

মার্টিন এবং লুইস সম্পর্কে জানতে চাওয়া হল। উনি একটা নতুন ছবি তৈরি করতে চলেছেন। আমাকে চিত্রনাট্যটা লিখতে হবে।

আমি যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলাম। হতাশা আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল। এখন সেই হতাশা অনেকখানি কেটে গেল।

গল্পটা এক তরুণ মানুষকে নিয়ে, যে বারো বছরের ছেলের ছদ্মবেশ ধরতে ভালোবাসে। পরবর্তীকালে সে একটা ডাকাতির কাজে জড়িয়ে পড়েছিল। দি মেজর অ্যান্ড দি মাইনর নামে যে ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল, এটা তারই রিমেক।

চিত্রনাট্য লেখা শেষ হল। আমি ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে বসলাম।

ডিন এবং জেরিকে বলেছিলাম-শেষটা কেমন হয়েছে একবার দেখবেন তো?

জেরি বেশ কয়েকটা প্রশ্ন করেছিলেন।

অবশেষে ছবিটা আত্মপ্রকাশ করল। বক্স অফিসে ভালোই হিট হয়েছে। আমার হারানো পেশাটা আবার আমি ফিরে পেয়েছি। বেল আমি এয়ারে একটা সুন্দর বাড়ি কিনলাম। সেখানে সাঁতারের পুল আছে, নয়ন জুড়ানো বাগান আছে। পৃথিবীর সব কিছু আবার সঠিক হয়ে গেছে।

আমি ভাবলাম-জর্জিয়াকে নিয়ে ইউরোপে যেতে হবে।

১৯৫৫ সালের ১৪ই অক্টোবর-আমাদের মেয়ে ম্যারির জন্ম হয়। আমার গাফিলতির জন্য ঠিক সময়ে জর্জিয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করা সম্ভব হয়নি।

আমি এই খবরে খুবই আনন্দিত হয়ে উঠলাম। একটার পর একটা কাজ আসছে, তারই মধ্যে বাড়িতে সময় দিতে হচ্ছে। সান্তা মোনিকা বুলেভার্ডের হাসপাতালে আমার মেয়ের জন্ম হল।

হাসিখুশিতে ভরা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ছোট শিশু। ম্যারির জন্মের পর জর্জিয়া আর আমি গোসিকোকে খবরটা দিয়েছিলাম। সে বোধহয় এই মেয়েটির গডফাদার হবে। সে রাজী হল। আমাদের আনন্দ আকাশ ছোঁয়া।

ম্যারিকে হাসপাতাল থেকে তিনদিন বাদে বাড়িতে নিয়ে আসা হল। আমাদের পরিচারিকা লাউরা তাকে জর্জিয়ার কোলে তুলে দিল।

জর্জিয়া বলল এখন থেকে আমি এর দেখাশোনা করব।

সুখের দিন আবার শুরু হয়েছে।

রবার্ট স্মিথ নামে বন্ড শ্রবণ

২১.

সোমবার সকালবেলা আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোন করল মিঃ রবার্ট স্মিথ নামে কেউ একজন আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।

আমি তার নাম শুনিনি।

তার বয়স বছর তিরিশ, ছোট চেহারা, দেখেই মনে হয়, কোনো অজ্ঞাত ভয়ে ভীত।

তিনি আমার সামনে কিছু প্রস্তাব দিলেন। এই প্রস্তাবটা অবশ্য আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। বলা হয়েছিল আমাকে বাস্টার কিয়াটনের সঙ্গে কাজ করতে হবে। ওই ভদ্রলোককে ফিল্ম জগতের রাজা বলা হয়। তাকে চ্যাপলিনের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

প্রতিটি ছবিতে অসাধারণ অভিনয় করেন। ভাগ্য কি আবার পরিবর্তিত হতে চলেছে?

আমি হার্ডম্যানের সঙ্গে দেখা করলাম। কাজটা আমাকে পেতেই হবে। নতুন কাজ, কাজটা নিয়ে আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম।

বাস্টার কিয়াটনের সঙ্গে পরিচয় হল। নির্বাক যুগে তিনি কতগুলো বিস্ময়কর শট দিয়েছিলেন। এখন আবার সবাক ছবিতে জমিয়ে অভিনয় করছেন।

শ্যুটিং শুরু হল, ছোটো ছোটো কাজগুলো দারুণ হয়েছে।

এর অন্তরালে যে রহস্য লুকিয়ে আছে, সেগুলো আমি জানতাম।

অবশেষে একটা সমস্যা এসে দেখা দিল। এই সমস্যার সমাধান কী করে হবে? বলা হল, এপ্রিলের ২৭ তারিখ থেকে এই ছবিটা প্রদর্শিত হবে। কিন্তু ভালো চেন পাওয়া যাচ্ছে না। শেষ অব্দি এই সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেল।

এপ্রিল মাস এসেছে। জর্জিয়া এবং ম্যারিকে নিয়ে ইওরোপে যাব।

দি বাস্টার কিয়াটন স্টোরি সমালোচকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মনটা তখন খুশিতে উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

শুরু হল আমার যাত্রা। পরিবারের মধ্যে আনন্দের উতরোল। বুঝতে পারলাম, কাজ থাকলেও কিছুটা সময় আলাদা করে রাখা উচিত। তা না হলে জীবনটা বড়ো একঘেয়ে হয়ে যায়।

.

২২.

গাড়ির কোনো দরকার নেই। আমি বাতাসের বুকে ভর দিয়ে উড়তে পারি। জর্জিয়া দরজার দিকে আমার জন্য তাকিয়ে থাকে।

সে বলল-কোনো ভালল খবর আছে?

আমি বললাম দেশি আরনেজ অ্যাডভেঞ্চার অফ এ মডেল নামে বই তৈরি করতে চলেছেন। টেলিভিশনে দেখানো হবে। কয়েক বছর ধরে। দু-একদিনের মধ্যে জানাব, আমি এখানে কাজ পাচ্ছি কিনা।

দুদিন বাদে দেশির কাছ থেকে একটা ফোন এল সিবিয়ে শেষ সময়ে শটটা দিয়েছে।

-আজ রাতে এসো উৎসব করি -আমি জার্মিয়াকে বলেছিলাম।

লাউরা সবকিছু শুনছে। সে বলল, আমি আমার চাঁদা দিলাম, সে আমার হাতে কুড়ি ডলার তুলে দিল।

উৎসব শুরু হল। জার্মিয়া আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, তোমার জন্য আমি গর্ব অনুভব করি।

দেশি পরের দিন সকালে আমাকে ডেকেছিলেন। দেশির সঙ্গে আলোচনা হল। কিন্তু তখন দেশির হাতে অনেকগুলো ছবির কাজ। তখুনি কোনো কিছু করা সম্ভব হবে না। একথা শুনে আমি খানিকটা দমে গিয়েছিলাম।

এবার ডরোথি আর হার্বাটের পালা। তারা নতুন করে একটা ছবি রিমেক করতে চাইছে। অ্যানি গেট ইয়োর গান ছবিটি।

অ্যালবার্ট হগের সঙ্গে দেখা হল। ভারী সুন্দর গান লিখতে পারেন। ব্রডওয়ে নাটকের জন্য বেশ কয়েকটা গান লিখেছেন। সংগীতে তাঁর সহজাত আকর্ষণ আছে।

আমরা নতুন সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনায় বসে গেলাম।

আবার একটা ছবির কাজ হাতে এসেছে। এখানে এমন একজন অভিনেত্রী চাই, যে হবে একাধারে সুন্দরী এবং রহস্যবতী। অভিনয়ের পাশাপাশি গানেও সুখ্যাতি থাকবে তার। এমন মিশ্রণ খুঁজে পাওয়া যায় কি?

আমরা অভিনেত্রীদের তালিকায় চোখ বোলালাম। শেষ পর্যন্ত বিলিলিকে পছন্দ হল। দীর্ঘ দিন ধরে সে ইংরেজ নাট্যশালা কাঁপিয়ে বেরিয়েছে। ভারী সুন্দর তার গানের গলা। সে নাচতেও পারে।

ফ্রায়ার বলেছিল-হ্যাঁ, একে পেলে আর কোনো সমস্যা হবে না।

পাঁচদিন বাদে ফ্রায়ারের অফিসে এসে উপস্থিত হয়েছি।

ফ্রায়ার বলল -বিলিলি অভিনয় করতে রাজী হয়েছে। এখন একজন কোরিওগ্রাফার চাই।

বিলিলির কথানুসারে তার এক বয়ফ্রেন্ড এগিয়ে এল। সে এই শো-টা পরিচালনা করবে।

আমরা এটা কী করে করতে দেব? আবার নামের তালিকা দেখা হল।

ডরোথি বুয়েন ভারডনের নাম প্রস্তাব করল। ঘরের ভেতর বুঝি আলো জ্বলে উঠল। হ্যাঁ, তার মধ্যে সৌন্দর্য এবং বুদ্ধিমত্তার একটা অপূর্ব সংমিশ্রণ আছে। তার মাথার চুলের রং লাল। সে অভিনয় করলে খুবই ভালো হবে। কিন্তু সেও চাইছে, তার বয়ফ্রেন্ড যেন পরিচালনা করে। তার বয়ফ্রেন্ড বা ফসে, এক বিখ্যাত ক্যারিওগ্রাফার। তার কোরিওগ্রাফিতে দুটো ছবি হিট হয়েছে, দি প্লাজমা গেম এবং ড্যাম ইয়াং কিস। সে এখনও পর্যন্ত কোনো ছবি পরিচালনা করেনি।

সকলেই তাকে একটা সুযোগ দিতে চাইছে। বছর তিরিশের ওই ভদ্রলোকের বয়স, এক সময় খুব ভালো নাচতে পারত। এখন সে হল পরিচালক। আমরা ব্রডওয়ে রিহর্সাল রুমে সকলের সাথে সভা করলাম। বব ফসেও সেখানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। রিহর্সালটা এগিয়ে চলেছে। সকলেই অসামান্য অভিনয় করেছে।

নাতালি এবং মারতি নিউইয়র্কে এসেছিল। রিচার্ড তার বউ জুয়ানকে নিয়ে উড়ে আসে। জর্জিয়া এবং আমি দর্শক আসনে পাশাপাশি বসেছিলাম।

৪৬ নম্বর স্ট্রিট থিয়েটার, নিউইয়র্ক, ১৯৫৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি যাত্রা শুরু হল। সমালোচকরা আর বাক্যবাণে আমাকে বিদ্ধ করতে পারেনি। তখন তারা এই সিনেমার ভূয়সী প্রশংসা করেছে। তার মানে জীবনের এলিভেটরটা আবার সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে গেছে। হলিউডই আমার আত্মার আত্মীয়, আমার শোকস্তুক মুহূর্তের সান্ত্বনা, একথা আমি বুঝতে পারলাম।

ব্রডওয়েতে যে কোনো ছবিকে জনপ্রিয় করা যায়। কিন্তু তাতে লাভ কী? আসল খেলা বোধ হয় হলিউডেই হয়ে থাকে।

মস হার্ট নামে এক প্রথম শ্রেণীর পরিচালকের সঙ্গে আলাপ হল। ব্রডওয়েতে তার পরিচালনায় অনেকগুলো ছবি প্রদর্শিত হয়েছে।

আমার এজেন্ট অড্রেউড। তিনি এক খর্বাকৃতি মহিলা। থিয়েটার সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান আছে। তিনিও নতুন নতুন ছবির স্বত্ব পাবার জন্য চেষ্টা করছেন।

হলিউডের প্রথম সারির পরিচালক উইলিয়াম ওয়াইলারের সঙ্গে দেখা হল। তিনি বেশ কয়েকটা সফল বইয়ের পরিচালনা করেছেন। আমাকে কাজেলা গারেন বলে মনে হল। দিন কেটে গেল। কথায় কথায় বন্ধুদের সাথে আলোচনা করছি। কিন্তু শুভ দিনটি তখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছোয়নি।

একদিন উইলিয়াম ওয়াইলার আমাকে বললেন –সিডনি, একটা মস্ত বড়ো সমস্যা হয়েছে। অড্রে হেপবার্ন এবং শালি ম্যাকলাইন, দুজনেই চিত্রনাট্যটা পড়ে ফেলেছে। তারা দুজনেই নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করতে চায়।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম–তাহলে কী হবে?

ভালোভাবেই মহড়া এগিয়ে চলেছে, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। তারপর সমালোচনা প্রকাশিত হল। বেশির ভাগ সমালোচক আমার প্রশংসা করেছে। আমি আমার আকাশ ছোঁয়া উৎসাহ দমন করার চেষ্টা করলাম।

ম্যানহাটনে ছবিটা প্রদর্শিত হল। সমালোচকরা এবার প্রশংসার বন্যা বইয়ে দিয়েছেন।

২৩.

একদিন আমাদের বাড়ির পাশে আগুন লাগল। হু-হু করে আগুন এগিয়ে চলেছে। ফায়ার ব্রিগেডের একজন এসে আমাদের বললেন- এক্ষুণি বাড়ি ছেড়ে চলে যান। যে কোনো মুহূর্তে এই বাড়িতে আগুন লাগতে পারে।

জর্জিয়া কীসব চিন্তা করছে। কোন কোন জিনিস সঙ্গে নেবে তাই ভাবছে। আমি পাঁচ বছরের ম্যারিকে কোলে তুলে নিলাম। আর কী নেব বুঝতে পারছি না। বাড়িতে আমার কত স্মৃতি চিহ্ন আছে। আমার সমস্ত বইয়ের প্রথম সংস্করণের কপি, জীবনে যে সমস্ত স্মারক আর পদক পেয়েছি, তাদের সমারোহ, গবেষণার কাগজপত্র, জামাকাপড়, আমার গচ্ছিত পোশাক আরও কত কী?

ভেতরে ছুটে গেলাম। কয়েকটা কলম আর হলুদ কাগজ তুলে নিলাম। আর কিছু নেবার নেই, বাড়ি থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলাম। আমরা তখন আক্ষরিক অর্থে পথে নেমে এসেছি।

আমাদের সৌভাগ্য, শেষ পর্যন্ত ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা আগুনটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিল। আমাদের বাড়িতে তার আঁচ লাগেনি।

টেলিফোনে একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

সমালোচকরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছে। আমি রোমান ক্যানডেলের চিত্রনাট্যটা পড়েছি।
অসাধারণ হয়েছে।

ডন হাটম্যান

ধন্যবাদ ডন। আপনার কথা শুনে ভালো লাগল।

-আমার হাতে একটা পরিকল্পনা আছে, আপনি কি যোগ দেবেন? অল ইন এ নাইটস
ওয়ার্ক নামে একটা সিনেমা তৈরি হবে। ডিয়ান মারটিন এবং শালি ম্যাকলাইন অভিনয়
করতে রাজী হয়েছেন। হ্যাঁল ওয়ালস এই ছবিটার প্রযোজনা করবেন। একটা সুন্দর
চিত্রনাট্য দরকার। আগেই চিত্রনাট্য লেখা আছে, কিন্তু এখন আবার নতুন করে লিখতে
হবে।

-ডিয়ানের সঙ্গে কাজ করতে আমার ভালোই লাগবে।

-ঠিক আছে, কখন আপনি শুরু করতে পারবেন।

-এখনই পারছি না। পনেরো মিনিট সময় দিতে হবে।

উনি হেসে উঠলেন ঠিক আছে। আপনার এজেন্টকে ডেকে নিচ্ছি।

আবার প্যারামাউন্টে ফিরে এসেছি। প্যারামাউন্টের সঙ্গে আমার অনেক সুন্দর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এখানকার সব মুখগুলো আমার খুবই পরিচিত, প্রযোজক থেকে শুরু করে পরিচালক, লেখক এবং সম্পাদকেরা। মনে হল, আমি বুঝি আবার বাড়ির টানে ফিরে এসেছি।

হ্যাল ওয়ালেসের সাথে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হল। এর আগে তার সাথে বেশ কয়েকবার আমার দেখা হয়েছে। কিন্তু কখনও তার সাথে বাণিজ্যিকভাবে কাজ করিনি। তিনি বেশ কয়েকটা বিখ্যাত ছবির জন্ম দিয়েছেন তার মধ্যে, দ্য রেন মেকার ইত্যাদি। ভদ্রলোক খর্বাকৃতি, চেহারাটা খুব সুন্দর, মুখের ওপর গম্ভীরতার ভাব আছে। সত্তর বছর বয়স হয়ে গেছে। এখনও একই রকম অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছেন।

আমি তার অফিসে পৌঁছে গেলাম।

উনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন- সেলডন, এই ছবিটা আপনার হাতেই ভালো খুলবে।

-আমিও এই চিত্রনাট্য লেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি।

আমরা অনেকক্ষণ ধরে ছবিটার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করলাম। এ বিষয়ে ওনার অগাধ জ্ঞান।

শেষ পর্যন্ত উনি বললেন- রোমান ক্যানডেলটা পড়েছি, অসাধারণ লেখা।

অনেক দেরী হয়ে গেছে হ্যাঁল, মনে মনে মন্তব্য করলাম।

এবার কাজ করতে হবে।

এডমন্ড বেলুইন, এবং মাউরিস। এই চিত্রনাট্যটি আগে লিখেছেন। লেখাটা চমৎকার হয়েছে কিন্তু ডিয়ান এবং শার্লির মুখে আরও ভালো শব্দ বসাতে হবে। তারা দুজনেই খুব বিখ্যাত অভিনেতা এবং অভিনেত্রী।

আমার লেখার কাজ শুরু হল।

.

একদিন সন্ধ্যাবেলা। আমি স্টুডিও থেকে বাড়ি ফিরে এসেছি। জর্জিয়া তার হাতে ফুলের তোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছিল।

আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল- শুভ ফাদারস ডে।

আমি তার দিকে অবাক হয়ে তাকালাম। আমতা আমতা করে বললাম আজ তো ফাদারস ডে নয়, তারপরেই আমি তার ধাঁধাটা বুঝতে পারলাম। আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম।

কী চাইছ তুমি? ছেলে না মেয়ে? সে জানতে চাইল।

দুটো হলেই ভালো হয়।

কথাটা বলা খুব সহজ, তাই তো?

আমি তাকে আরও শক্ত করে আলিঙ্গন করছি- এতে কিছুই হবে না, ডার্লিং। আগত শিশুটা যেন ম্যারির মতো সুন্দর হয়।

ম্যারির তখন পাঁচ বছর বয়স। ভাই অথবা বোন পেলে তার কেমন লাগবে?

আমি বললাম তুমি ম্যারিকে এই শুভ সংবাদটা দিয়েছ?

-হ্যাঁ, আমি তাকে বলেছি।

-সে কী বলেছে?

-সে খুবই খুশী হয়েছে। কিছুক্ষণ আগে আমি দেখে এলাম সে আমাদের ঘর থেকে তার ঘরে যেতে গেলে কটা পা ফেলতে হয় সেটা মাপছে। আবার তার ঘর থেকে নার্সারিতে যেতে গেলে কটা পা ফেলতে হয়, তা মেপে দেখছে।

আমি হেসে বলেছিলাম-ম্যারি এখন পাঁচ বছরের বড়ড়া দিদি, কথাটা যেন মনে থাকে।

আমরা এই সন্তানকে কী নামে ডাকব, আমি জানতে চাইছিলাম।

যদি মেয়ে হয়, তা হলে ওর নাম দেওয়া হবে আলেকজান্দ্রা।

বাঃ, সুন্দর নাম। কিন্তু যদি ছেলে হয়, তাহলে ওর নাম হবে আলেকজান্ডার। তার মানে মানবজাতির পরিত্রাতা।

জর্জিয়া হেসে বলল- তোমার নামটাও সুন্দর হয়েছে।

সমস্ত রাত আমরা জেগে ছিলাম। অনাগত শিশুটি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। সে এবং ম্যারি পাশাপাশি কীভাবে বড়ো হয়ে উঠবে, তার পরিকল্পনা করছিলাম।

অল ইন এ নাইটস ওয়ার্ক-এর কাজ শুরু হয়েছে। হু-হু করে কাজটা এগিয়ে চলেছে। মাঝে মধ্যে আমি হ্যাঁল ওয়ালেসের সাথে আলোচনা করি। হ্যাঁল এ বিষয়ে যে মন্তব্য করে তা সাবধানে শোনার চেষ্টা করি। সেটের ব্যাপারেও আলাপ আলোচনা হয়েছে। জোসেফ অ্যান্ড্রি নামে এক পরিচালককে চুক্তিবদ্ধ করা হয়েছে।

ক্লিফ রবার্টসন এবং চার্লি র্যাগ-এর মতো দুজন বিখ্যাত অভিনেতা এই বইতে অভিনয় করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। যদিও ডিয়েনের সাথে আগে আমি কাজ করেছি। কিন্তু শার্লি ম্যাকলইনের সাথে কখনও মুখোমুখি দেখা হয়নি। তার সম্পর্কে অনেক খবর আমি জানতাম। তিনি খুবই প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী। ব্যক্তিগত জীবনে অনেক মুখরোচক সংবাদ আছে। আমি কারও অন্তরঙ্গ জীবন সম্পর্কে মোটেই আগ্রহী নই। আমি শুধু তাঁর অভিনয় ক্ষমতা দেখতে চাই।

একদিন তার সঙ্গে আমার পরিচয় হল। উনি এগিয়ে এসে আমার হাতে হাত রাখলেন। সেই মুহূর্তেই ডিয়েন ঘরে ঢুকে বললেন- এ কী আমাকে কেউ দেখতেই পাচ্ছেন না।

ডিয়েনের স্বভাবটা একেবারেই পাল্টায়নি। আগের মতো খোশমেজাজে জীবন কাটাতে ভালোবাসেন। মানুষের পেছনে লাগছেন আগের মতোই। এখন তিনি মস্ত বড়ো নক্ষত্র হয়েছেন, কিন্তু ছেলেমানুষী কৌতুক হারাননি।

মারটিন এবং লুইস কোম্পানি ভেঙে গেছে। জেরি পঁচিশটার মতো ছবি তৈরি করেছে। সব সময় এই কাজে ব্যস্ত থাকে। এর পাশাপাশি জেরি সমাজসেবামূলক অনেকগুলো কাজ করে। এখন সে পথশিশুদের জন্য অর্থ সংগ্রহের খেলায় মেতে উঠেছে। ডিয়েন এক মনে ছবি করে চলেছেন। ছবি করার ব্যাপারে তার কোনো ক্লান্তি নেই। এর পাশাপাশি তিনি একটা নতুন টেলিভিশন শো তৈরি করেছেন। শো-টা অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

টেলিভিশনের সাথে ডিয়েনের জীবন কাহিনী বেশ মিলে যায়। ডিয়েন কোনো ব্যাপারে অনুশীলন করতে চাননা। তার পক্ষে টেলিভিশনে শো করাটাই ভালো। একটা শো শেষ হলে দর্শকদের গুডবাই জানিয়ে পরবর্তী শোয়ের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

জর্জিয়া এবং আমি ডিনার পার্টির আয়োজন করলাম। মাঝে মাঝেই বন্ধুবান্ধবদের সেই পার্টিতে ডেকে পাঠাই। সেই পার্টিতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বাবার বন্ধুরা একবার সেই পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে, এডি লাসকর নামে এক বিখ্যাত মানুষ ছিলেন। তিনি হলেন বিজ্ঞাপন সংস্থা লর্ড এবং টমাসের একমাত্র উত্তরাধিকারী। তার স্ত্রী জ্যানে গ্রিয়ার। ভারী সুন্দরী এক ভদ্রমহিলা। সফল অভিনেত্রী। মাঝে মাঝেই তারা আমাদের নিমন্ত্রণ করতেন। তাদের সাহচর্য আমাদের ভালোই লাগত।

একরাতে এডি বললেন- আসুন, আমরা প্রতি সপ্তাহে পরস্পর মিলিত হই।

না, আমি কী তা পারব? এত খরচা করতে?

শেষ পর্যন্ত আমি বলেছিলাম- এডি, প্রতি সপ্তাহে দরকার নেই। সময় ও সুযোগ হলে আমরা দেখা করব, কেমন?

আমি দেখলাম, তার মুখের রেখা পাল্টে যাচ্ছে।

আর এক দম্পতির সাহচর্য, আমাদের খুবই ভালো লাগত। তাঁরা হলেন আর্থার হর্নব্লো এবং তার স্ত্রী ললনোর। আর্থার হর্নব্লো এক সফল প্রযোজক।

আর্থার একদিন আমাকে বলেছিলেন আমার হাতে এমন একটা পরিকল্পনা আছে, যা আপনার ভালো লাগবে।

উনি অত্যন্ত সফল। আমার একটা চাকরির দরকার আছে। কিন্তু আমি বন্ধুকে এভাবে বিকিয়ে দিতে চাই না।

আমি বলেছিলাম- দেখা যাক, সময় হলে আমরা নিশ্চয়ই কাজ শুরু করব, আর্থার।

এইভাবে আমি এক বন্ধুকে হারালাম।

.

অল ইন এ নাইটস ওয়ার্ক-এর কাজ শেষ হয়ে গেছে। জর্জিয়া তার দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দেবার জন্য তৈরি হয়েছে। এবার আমি আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। আগের মতো আর শেষ মুহূর্তে হুড়োহুড়ি করতে হবে না। আমি জানি, কোথায় ভালো হাসপাতাল পাওয়া যায়। আমরা বেশ কিছুক্ষণ আগে সেখানে পৌঁছে গেলাম। আমাদের জন্য একটা আলাদা ঘর দেওয়া হল। সেখানে আর কোনো কাজ নেই। বসে বসে শুধু ওই শিশুটির জন্য অপেক্ষা করা ছেলে অথবা মেয়ে, তাই নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা।

তাতে অবশ্য কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না।

আমাদের চিকিৎসক ডঃ ব্লেক ওয়াটসন। তিনি ইতিমধ্যে হাসপাতালে এসে গেছেন।

মধ্যরাত, একটা বেজেছে, আলেকজান্ডার জন্ম হল। আমি ডেলিভারি রুমের বাইরে বসেছিলাম।

ডঃ ওয়াটসন এবং দুজন নার্সকে দেখতে পেলাম। তারা অত্যন্ত দ্রুত ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

ডঃ ওয়াটসনের হাতে শিশুটি কন্ডলে জড়ানো।

ডাক্তার.....

আমি কিছু বলার চেষ্টা করেছিলাম। উনি অতি দ্রুত আমাকে ছাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। মনের ভেতর ভয়ের বাতাবরণ। কিছুটা সময় কেটে গেছে। জর্জিয়াকে

ভইল চেয়ারে বসে থাকতে দেখা গেল। ডেলিভারি রুম থেকে বাইরে চলে এসেছে।
তাকে তার ঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার শরীরটা বিবর্ণ, মুখে বিষণ্ণতার আভাস।

জর্জিয়া জানতে চাইল- সবকিছু ঠিক আছে?

কয়েক মিনিট পরে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

আমি দেখলাম জর্জিয়ার ভইল চেয়ারটা করিডর দিয়ে দূরে চলে গেল। আমি ডঃ
ওয়াটসনকে খুঁজলাম। খুঁজতে খুঁজতে আমি নবজাতক শিশুদের ইনটেনসিভ কেয়ারে
পৌঁছে গেলাম। জানলা দিয়ে তাকে দেখতে পেলাম। তিনি এবং আরও দুজন ডাক্তার
কোনো বিষয় নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা করছেন। আমার মনে হল, হয়তো আলেকজান্দ্রাকে
নিয়ে এই আলোচনা চলেছে। আমার হৃৎস্পন্দনের গতি তখন আরও দ্রুত হয়ে উঠেছে।
আমি ঘরে ঢুকে পড়তে চেয়েছিলাম। কিন্তু নিজেকে আটকে রাখলাম।

ডঃ ওয়াটসন আমাকে দেখতে পেলেন। তিনি অন্য দুজন ডাক্তারকে কিছু একটা
বললেন। তারা সকলে আমার দিকে তাকালেন। আমার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

ডঃ ওয়াটসন করিডর দিয়ে এগিয়ে এলেন।

কী হল? আমি প্রশ্ন করলাম। কিছু কি সমস্যা?

আমি কথা বলতে পারছি না।

আমার ভয় হচ্ছে, মিঃ সেলডন। আপনাকে একটা খারাপ খবর শুনতে হবে।

মেয়েটি মারা গেছে?

-না।

-তবে?

ভদ্রলোক শব্দ খুঁজে পাচ্ছেন না। শেষ পর্যন্ত বললেন, আপনার শিশুটি এক মারাত্মক ত্রুটি নিয়ে জন্মেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম কী বলতে চাইছেন? সহজ সাধারণ ইংরাজি ভাষায় আমাকে বলবেন কি?

-এটা হল জন্মগত ত্রুটি। গর্ভাবস্থার প্রথম সময়ে এই শিশুটির মেরুদণ্ড ঠিকমতো কাজ করেনি। যখন শিশুটির জন্ম হয়, তার মেরুদণ্ডের ওপর একটা পাতলা আস্তরণ পড়ে। স্পাইনাল কর্ডটা ঠিক মতো তৈরি না হওয়াতে সে কখনওই ভালোভাবে বাঁচতে পারবে না। এটা হল....

ঈশ্বরের অনুগ্রহ, এটা ঠিক করে দিন। আমি চিৎকার করেছিলাম।

এটা খুব সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

-তা হলে বিশেষজ্ঞকে ডেকে আনুন। আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? এক্ষুণি যান, এখনই। আমার আবেদন ফেলবেন না।

আক্ষরিক অর্থে তখন আমি চিৎকার করে কাঁদছি। নিজের রাগ অথবা আবেগকে আর প্রশমিত করতে পারছি না।

উনি আমার দিকে এক মুহূর্ত তাকালেন। তারপর দ্রুত বাইরে চলে গেলেন।

এই খবরটা কীভাবে আমি জর্জিয়াকে দৈব। এই সময় হল আমার জীবনের সবথেকে কঠিন সংকটময় সময়।

আমি জর্জিয়ার ঘরে গেলাম। জর্জিয়া আমার দিকে তাকাল এবং বলল- কিছু সমস্যা?

-না, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি জর্জিয়াকে আশ্বস্ত করে বলেছিলাম। আলেকজান্দ্রার জন্ম হয়েছে একটা শারীরিক ত্রুটিকে সঙ্গী করে। ডাক্তাররা বলছেন, তারা এই ত্রুটিটা সারিয়ে তুলতে পারবেন, ভবিষ্যতে কোনো সমস্যা থাকবে না।

ভোর চারটে, দুজন ডাক্তার এসে গেছেন। ডঃ ওয়াটসন তাদের নিয়ে গেলেন নবজাতকদের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। আমি বাইরে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। ওঁদের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। তাদের মুখে হাসি আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। জর্জিয়ার কাছে ফিরে গেলাম, কোনো কথা না বলে, শুধু অপেক্ষার প্রহর।

আধঘণ্টা বাদে ডঃ ওয়াটসন ঘরে এলেন। তিনি জর্জিয়ার দিকে তাকালেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বললেন- দুজন বিশেষজ্ঞ এসেছেন। তারা আপনার

বেবিকে পরীক্ষা করেছেন। ওঁরা বলছেন, এই শিশুটি বোধহয় বাঁচবে না। যদিও বাঁচে, তাহলে সারাজীবন পঙ্গু হয়ে তাকে বেঁচে থাকতে হবে। তার মাথায় বুদ্ধির সঞ্চারণ ঘটবে না।

ডাক্তারের প্রতিটি শব্দ আমাকে চাবুকের মতো আঘাত করছে।

ডাক্তার আরও বললেন তার ব্লাডারেও নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। এটা এমন একটা ক্রটি যা সহজে শোধরানো সম্ভব নয়।

আমি বললাম মেয়েটি কী বাঁচবে না?

বাঁচবে। কিন্তু...

-তাহলে ওকে আমরা বাড়িতে নিয়ে যাব। চব্বিশ ঘন্টার জন্য নার্স রেখে দেব। সবরকমের ব্যবস্থা করব।

মিঃ সেলডন, কখনও তাকে বাড়িতে নিয়ে যাবেন না। তাকে একটা কেয়ার সেন্টারে রাখতে হবে। তার মতো যে সমস্ত শিশুদের হয়েছে, তারা সকলেই ওই কেয়ার সেন্টারে থাকে। পোমনায় এমনই একটা কেন্দ্র আছে। সেখানে ওকে পাঠানো উচিত।

জর্জিয়া এবং আমি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

জর্জিয়া প্রশ্ন করল-আমরা ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি?

না, দেখা না করলেই ভালো হয়।

জর্জিয়া বোধহয় ডুবতে বসেছে। শেষ পর্যন্ত ও বলল- আপনি কী বলছেন?

-ওর মৃত্যু হবে। আমি দুঃখিত। ওর জন্য প্রার্থনা করুন।

মা-বাবা কি তার শিশুর মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করতে পারে?

আমি পাগলের মতো একটার পর একটা মেডিকেল জার্নাল হাতড়ে চলেছি। রোগটা সম্পর্কে কোথায় কোন্ প্রতিবেদন আছে, তার সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছি।

ম্যারি আলেকজান্ডার কথা জানতে চাইল।

আমরা তাকে বললাম আলেকজান্ডার অসুস্থ, কদিন বাদেই বাড়িতে ফিরে আসবে।

রাতে আমার ঘুম হচ্ছে না, আলেকজান্ডার মুখছবিটা মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে সে যেন যন্ত্রণার মধ্যে প্রহর কাটাচ্ছে। একটা অন্ধকার ঘরে বন্দিণী অবস্থায় বসে আছে। তাকে ভালোবাসার কেউ নেই। মাঝরাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি দেখলাম, জর্জিয়া নার্সারির সামনে বসে নীরবে কেঁদে চলেছে। হ্যাঁ, আশা আছে কি? আবার ম্যাগাজিন গুলো খুঁটিয়ে পড়তে শুরু করলাম। বিজ্ঞান এখন অনেক উন্নত হয়েছে। আলেকজান্ডারকে বিশেষ পরিষেবা দিতে হবে। এই পরিষেবা আমরা অবশ্যই দেব। আমরা কোনো ব্যাপারেই পিছিয়ে আসব না। ডঃ ওয়াটসন ঠিক কথা বলেননি। এখনও চিকিৎসাশাস্ত্রে অলৌকিক ঘটনা ঘটে যায়।

আমি একটা প্রবন্ধ পড়লাম। এখানে জীবনদায়ী ওষুধ সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রবন্ধটা জর্জিয়াকে দেখালাম। জর্জিয়া দেখো, এই ওষুধগুলো গতকাল অদি বাজারে ছিল না। এখন এসে গেছে। আরও অনেক হতভাগ্য মানুষ জীবনের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে।

জর্জিয়া উৎসাহের সঙ্গে প্রবন্ধগুলো পড়ল। তারপর বলল- হ্যাঁ, নতুন এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আমাদের কাছে বন্ধু হিসেবে দেখা দিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, ওই ছোট শিশুটিকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব।

-হ্যাঁ, ওকে বেঁচে থাকতেই হবে। ওর মধ্যে আমাদের জিন আছে। ও হয়ে উঠবে এক পরিত্রাতা। কিছুদিন হয়তো ওকে কষ্ট স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এই দুঃখের অবসান ঘটে যাবে। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম মেয়েটিকে এখনই বাড়িতে নিয়ে আসতে হবে।

জর্জিয়ার দুটি চোখে আনন্দের শিহরণ- আমারও তাই চিন্তা।

সকাল হলেই আমি ডঃ ওয়াটসনকে ফোন করব।

সকালবেলা আমি ওয়াটসনের অফিসে পৌঁছে গিয়ে বললাম- ডঃ ওয়াটসন,

একদিগরপাশে সুদৃঢ়ছি। জর্জিয়া এবং এ জীবন তখন আলেকজান্দ্রার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। জর্জিয়া আর আমি...

-হ্যাঁ, আপনাকে আগেই ডাকা উচিত ছিল মিঃ সেলডন, গতকাল মধ্যরাতে আলেকজান্দ্রার মৃত্যু হয়েছে।

সমস্ত পৃথিবী বুঝি অন্ধকারে মুখ ঢেকেছে, মা বাবার কাছে এ এক শোকাচ্ছন্ন অনুভূতি। এমন একটা শোক যা জীবনে কোনোদিন প্রশমিত হবে না। আমরা আলেকজান্দ্রার সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকলাম। ম্যারি আমাদের মধ্যে বড়ো হতে থাকল। আমাদের ভালোবাসা তাকে সুখী জীবনের অভিসারী করুক, এটাই একমাত্র প্রার্থনা।

আলেকজান্দ্রা কোনোদিন সূর্যাস্ত দেখতে পাবে না। কোনোদিন পুষ্পিত উদ্যানে পা ফেলতে পারবে না। সে কোনোদিন পাখিদের উড়ে যাওয়া দেখবে না। কবোঞ্চ নিদাঘ বাতাস তাকে পরিতৃপ্ত করবে না। আইসক্রিম খেতে পারবে না। সিনেমায় যাবে না। খেলায় অংশ নেবে না। সুন্দর সুন্দর পোশাক পরবে না। গাড়িতে চড়ে বেড়াতে যাবে না। সে জানবে না, ভালোবাসায় কী আবেগ আসে। পরিবার কাকে বলে। না-না, কখনও-কখনও, তার এইসব অভিজ্ঞতা হবে না।

সময় এগিয়ে গেল। অনেকে বলে থাকে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শোক প্রশমিত হয়। কিন্তু আমাদের শোক আরও বেড়ে উঠল। আমাদের জীবন তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। একটা মাত্র সানা আমাদের ম্যারি আছে। জর্জিয়া এবং আমি ম্যারিকে আরও বেশি ভালোবাসতে শুরু করলাম। চারপাশে সুদৃঢ় নিরাপত্তার কঠিন বলয়।

একদিন আমি জর্জিয়াকে বললাম একটা বেবিকে দত্তক নিলে কেমন হয়?

না-না, এখন সময় হয়নি।

আরও কিছুদিন কেটে গেছে। ও এসে আমাকে বলল- হ্যাঁ, একটা ছেলে বা মেয়েকে দত্তক নিতে হবে। ম্যারির ভাই বা বোন থাকা দরকার।

আমরা ডঃ ওয়াটসনের কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ চাইলাম। উনি একজনের সঙ্গে কথা বললেন, এক ভদ্রমহিলা একটি শিশুর জন্ম দিতে চলেছে। কিন্তু তার বিয়েটা সুখের হয়নি। বয়ফ্রেন্ড অন্য কোথাও চলে গেছে। ভদ্রমহিলা চাইছেন, এই শিশুটিকে যেন কেউ দত্তক নেয়।

এই শিশুটির মা খুবই বুদ্ধিবতী এবং রূপসী। খুব ভালো পরিবার থেকে এসেছেন। ডঃ ওয়াটসন বললেন, আমার মনে হয়, এই শিশুটিকে আপনারা দত্তক নিতে পারেন।

জর্জিয়া এবং আমাদের ছ-বছরের মেয়েটি আর আমি একটা পারিবারিক বৈঠকে বসলাম।

আমরা ম্যারিকে বললাম তুমি যা বলবে তাই হবে। তুমি কি একটা ছোট ভাই বা বোনকে বাড়িতে আনতে চাইছ?

কিছুক্ষণ পরে সে বলেছিল- ও মারা যাবে না তো?

জর্জিয়া আর আমি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বললাম না, ও মারা যাবে না।

ম্যারি বলল- তাহলে ঠিক আছে।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, এবার টাকাপয়সায় হিসাব নিকাশ করতে হবে।

তিন সপ্তাহ কেটে গেছে। ডঃ ওয়াটসন ফোন করে বললেন- আপনাদের একটা সুন্দর ফুটফুটে কন্যা সন্তান হয়েছে।

আমরা ওর নাম রেখেছিলাম এলিজাবেথ। নামটার সাথে শরীরটাও ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ। অসাধারণ রূপবতী, স্বাস্থ্যাজ্জ্বল, চোখের তারার রঙ বাদামী, হাসি দিয়ে অনেককে হত্যা করতে পারে। জর্জিয়া তাকে পেয়ে সত্যিই খুশি হয়েছিল। আমরা এলিজাবেথকে বাড়িতে নিয়ে গেলাম, জীবন আবার নতুন ছন্দে এগিয়ে চলল। জর্জিয়া এবং আমি তখন অনেক স্বপ্ন দেখছি। আলেকজান্ডার জন্য যেসব স্বপ্ন জমানো ছিল এলিজাবেথের মধ্যে। আমাদের রক্ত মাংস নেই, কিন্তু মনে হল সে বুঝি সত্যি সত্যি আমাদের নিজস্ব কন্যা। আমাদের জীবনের উত্তরাধিকারিণী। আমরা তাকে সবথেকে ভালো স্কুলে পাঠাব, সে তার নিজস্ব জীবনধারা নিজেই বেছে নেবে। আমরা দেখতাম ম্যারি কত খুশিয়াল হয়ে উঠেছে। আমরা এলিজাবেথকে পোশাক কিনে দিলাম, যেটা আলেকজান্ডার জন্য কিনবো বলে ভেবেছিলাম। তাকে ইজেল এবং রঙীন তুলি দেওয়া হল। হ্যাঁ, সে কি শিল্পী হবে? পরে তাকে পিয়ানো শেখানো হয়েছিল।

সময় এগিয়ে চলেছে, এলিজাবেথ তার বড় দিদিকে খুবই ভালোবাসে। যখন ম্যারি তার কাছে আসে, এলিজাবেথ হি হি করে হেসে ওঠে। ব্যাপারটা দেখে আমরা খুশিয়াল হয়ে উঠি। জর্জিয়া এবং আমি ঠিক কাজই করেছি, তারা দুজন একসঙ্গে বড়ো হবে, একে অন্যকে ভালোবাসবে।

ছমাস কেটে গেছে, এলিজাবেথের বয়স এখন ঠিক ছ-মাস, ডঃ ওয়াটসন ফোন করলেন।

আমি বললাম- ডাক্তার আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, এত সুন্দর বেবি আমি কখনও দেখিনি। আমাদের ঋণের কোনো শেষ নেই।

কিছুক্ষণ নীরবতা।

-মিঃ স্লেডন, এইমাত্র আমি ওই মেয়েটির মায়ের কাছ থেকে ফোন পেয়েছি। তিনি মেয়েটিকে নিজের কাছে চাইছেন।

আমার রক্ত জমে গেছে- আপনি কী বলছেন? আমরা তো আইনগতভাবেই এলিজাবেথকে দত্তক নিয়েছি।

দুর্ভাগ্য এই বিষয়ে দেশের আইন খুবই কড়া। যে কেনো সময়ে এই জাতীয় মা তার মন পাল্টাতে পারেন। অবশ্য ছ মাসের মধ্যে। ওই শিশুটির মা এবং বাবা ঠিক করেছেন যে তারা বিয়ে করবেন। মেয়েটিকে আবার নিজের কাছে এনে রাখবেন।

আমি কাঁপতে কাঁপতে খবরটা জর্জিয়াকে দিলাম। জর্জিয়ার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। ও বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাবে।

সে কোনো রকমে বলল-না-না, ওরা কিছুতেই মেয়েটিকে আমার কাছ থেকে নিতে পারবে না।

শেষ পর্যন্ত ওরা পেরেছিল, এলিজাবেথকে পরের দিন দিয়ে দেওয়া হল, জর্জিয়া এবং আমি কী হচ্ছে তা বুঝতেই পারিনি।

ম্যারি কাঁদতে কাঁদতে বলল- কী সুন্দর আমার বোন সে কোথায় চলে গেল।

কয়েক মাস কেটে গেল অব্যক্ত যন্ত্রণার মধ্যে। কোনো রকমে আমরা সেই যন্ত্রণালব্ধ প্রহরগুলোকে কাটিয়ে দিলাম। আমরা মাঝে মধ্যে চার্চে যেতাম, সেখানে গিয়ে শান্তি পাবার চেষ্টা করতাম। আমি জানি না এইভাবে জর্জিয়া এবং আমি শান্তি পেয়েছিলাম কিনা।

একটা বছর কেটে গেল, আমরা শোক অনেকটা ভুলে গেছি। জীবনে একটা শূন্যতা আছে, বটে, কিন্তু জীবন তার স্বাভাবিক ছন্দে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

.

২৪.

সুরকার স্যামি কোহন একবার একটা সুন্দর মন্তব্য করেছিলেন। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল সুর অথবা কথা কোনটা আগে আসে।

— তিনি তাৎক্ষণিক জবাব দিয়েছিলেন। কোনোটাই না, প্রথমে আসে টেলিফোনের কল। এবার জো পাস্টারনকের কাছ থেকে টেলিফোন কল এল।

সিডনি এম জি এম জাম্বো ছবিটা কিনেছে। আপনি কি চিত্রনাট্য লিখবেন?

আমি রাজী হলাম।

১৯৩৫ সালে ব্রডওয়েতে জাম্বো ছবিটার প্রদর্শন শুরু হল। এটা প্রযোজনা করেছিলেন বিলি রোজ। তখন তিনি ছিলেন এক নামকরা প্রোডিউসার। তিনি বিরাট মাপে শ্যুটিংটা করেন। শো-টা শুরু হল, সমালোচনা অসাধারণ। তবে একটা ভুল থেকে গিয়েছিল, খরচ। এত বেশি হয়ে গেছে যে লাভের মুখ দেখাটা মুশকিল। পাঁচ মাস চলার পর ছবিটা বন্ধ হয়ে যায়।

এম জি এমের সাথে দশ বছরের সম্পর্ক বজায় আছে আমার। মাঝে মধ্যে কেমন অবাক লাগে। এখনও অনেক কিছু শিখছি আমি।

জো পাস্টারনকের চরিত্রটা একেবারে পরিবর্তিত হয়নি। এখনও আগের মতোই ছটফটে এবং উৎসাহী।

আরেকটা ভালো খবর পাওয়া গেল, ইস্টার প্যারাডে আমি যে চাকের সঙ্গে কাজ করেছিলাম, সে আবার আমার জীবনে এসে প্রবেশ করেছে।

জো-এর কাছ থেকে একটা প্রস্তাব এল, ডরিস ডে, মার্থারে আই এবং জিমি ডুরান্টকে রাজী করানো হয়েছে, আরেকটা নতুন ছবির শুটিং শুরু হবে। এই ছবিটা চাক পরিচালনা করবে।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম- পুরুষের ভূমিকায় কে অভিনয় করবে?

পাস্টারনক জবাব দিলেন রিচার্ড বার্টন, আমি তার সাথে কথাটা শেষ করতে চাই।

এটা একটা নতুন আনন্দ, বিখ্যাত একজন অভিনেতার মুখে আমার সংলাপ থাকবে, ব্যাপারটা ভাবতে ভালো লাগছে।

পাওলিনের সাথে দেখা হল, পাওলিন এখনও সেখানে কাজ করছে। আমরা একে অন্যকে অভিনন্দিত করলাম। ছবিটা নিয়ে অনেকক্ষণ কথা হল।

কয়েকদিন ধরে আমি ছবিটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছিলাম। তারপর চিত্রনাট্য লেখার কাজটা শেষ হল। ক্যামেলটে ছবি আত্মপ্রকাশ করছে, রিচার্ড বার্টন প্রধান চরিত্রে, মস হার্টও এসেছেন পরিচালনার জগতে।

এই ছবিটাও অসাধারণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

দিনগুলো দ্রুততার সঙ্গে কেটে চলেছে। একটার পর একটা নতুন ছবির জন্য আবেদন করা হচ্ছে। অনেক সময় আমি ছবির চিত্রনাট্য লিখতে পারছি না। ফিরিয়ে দিতে খারাপ লাগছে।

এবার দি প্যাটি ডিউক শো-এর কথা। জন রস এই ছবির ম্যানেজার। অনেক কষ্ট করে ছবিটা তোলার চেষ্টা করছেন। এই ছবিতে আমার একটা সুন্দর ভূমিকা ছিল। ভাবতে ভালোই লাগে।

এরই মধ্যে দুঃখজনক কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। যারা একসময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তাদের অনেকেই অন্তরালে থেকে গেছে।

কেউ কেউ অতিরিক্ত অভিমানী হয়ে উঠেছে। কোথাও হয়তো বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটে গেছে।
ব্যাপারটা এখনও আমাকে ভাবায় বই কী!

২৫.

জন রস প্যাডির জন্য একটা নতুন ছবি তৈরি করবে। অবশ্য সেটা টেলিভিশন
সিরিয়াল। আমাকে এখানে কাজ করতে হল।

একদিন রস আমার অফিসে এসেছেন, তার চোখে টলটল করছে অশ্রু রেখা। আমি
জানতে চাইলাম, কী হয়েছে?

লাইফ ম্যাগাজিন রিহাসাল দেখতে আসছে।

-তাতে কী হয়েছে।

-না, লাইফ ম্যাগাজিনের কাছে আমার দরিদ্র অবস্থার কথা প্রকাশিত হবে। ওরা এসে
দেখবে যে আমার কোনো সেক্রেটারী নেই!

দ্য প্যাটি ডিউক শো-কে নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিল। এর প্রযোজক এবং পরিচালক ছিলেন বিল অ্যাসার, তিনি এমন একটা মানুষ যিনি নানা প্রকল্পে একসঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। সবকিছু ঠিক মতো হয় না।

এই ব্যাপারটাও আমাকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। শেষপর্যন্ত বিভিন্ন সুখী মানুষদের মধ্যে একটা সংযোগসূত্র রক্ষা করার চেষ্টা করলাম। ব্যাপারটা সাময়িক, আমি জানি, তবু কাজটা এগিয়ে চলল।

প্রতি মুহূর্তে আমাকে সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। আমার লেখা চিত্রনাট্য দর্শকেরা কেমনভাবে গ্রহণ করছে সেদিকে তাকিয়ে থাকি। দেখতে দেখতে ম্যারির বয়স হল আট বছর, ইতিমধ্যেই সে যথেষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে উঠেছে। আমাকে গল্প বলার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। একটার পর একটা দৃশ্য উপস্থাপন করে। সিনেমার প্রতি তার এই আকর্ষণ দেখে আমি অবাক হয়ে যাই।

একদিন সন্ধ্যাবেলা, আমি নতুন পাতাগুলো নিয়ে বসে আছি, প্যাটি ডিউক শো সম্পর্কে সুন্দর সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। হলিউড থেকে একটা আমন্ত্রণ এল স্ক্রিন জেমস একটা টেলিভিশন সিরিজ করতে চলেছেন। আপনি আসবেন কি? এটা হল কলম্বিয়া পিকচার্সের এক সংগঠন।

আমার মন তখন আনন্দে ভরপুর। আগে টেলিভিশন সম্পর্কে খুব একটা আগ্রহী ছিলাম না, কিন্তু কলম্বিয়ার এই আমন্ত্রণ আমি ফেরাব কেমন করে?

স্ক্রিন জেমসের সঙ্গে কথাটা ভালোই হল, জেরি হাইমসের সঙ্গে দেখা হল, উনি হলেন উচ্চপদস্থ আধিকারিক, আরও অনেক বিশ্ববিখ্যাত মানুষদের সংস্পর্শে এলাম।

আমার জীবনের একটা নতুন অধ্যায় শুরু হল।

এভাবেই লেখার কাজ এগিয়ে চলেছে। লিখতে লিখতে মাঝে মধ্যে কবিতার শব্দগুলো মনে চলে আসে। কখনও আমি লিখি তারা কেউ কাউকে স্পর্শ করেনি কখনও, জেনি একা একা ঘুমিয়ে পড়েছে, টনিও তার পাশে নিদ্রামগ্ন। জেনি আর কোনোদিন টনির বেডরুমে যাবে না। টনি জেনিকে ভালোবাসা দেবে না। এভাবেই লেখা এগিয়ে চলেছে। কিছুটা কবিতা, কিছুটা উপন্যাসের ঢঙে। প্রশ্ন উত্তরের পালা। হ্যাঁ, এভাবেই আমি একটা নতুন কিছু করতে চাইছি।

সে হল বারবারা ইডেন, তার সৌন্দর্যের মধ্যে একটা বুনো মাদকতা আছে। আর আছে চাপা যৌনতার তীব্র আকর্ষণ। দর্শকরা সহজেই তাকে গ্রহণ করল।

পরবর্তীকালে সে মাইকেল আনসারা নামে এক অভিনেতাকে বিয়ে করেছিল।

এবার অ্যান্থনি নেলসনের কথা বলা যাক। অ্যান্থনিও এই ব্যাপারে এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। দ্যা এজ অফ নাইট ছবিতে আমি অ্যান্থনিকে সাহায্য করেছিলাম।

এল ১৯৬৫- টেলিভিশনের জগতে বিপ্লব ঘটে গেল। সাদা কালো পরিবর্তিত হল রঙিনে। আমার ভাবতে ভালো লাগছে, প্যাটি ডিউক এবার রঙিন সিরিয়াল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

এভাবেই দিন এগিয়ে চলেছে। জানি না, আগামীকাল কী হবে।

.

২৬.

হেডেন বুরকির সঙ্গে কথা হল। হেডেন বুরকি এক মনোজ্ঞত্ববিদের চরিত্রে অবতীর্ণ হবেন। জেনারেল পিটারসনের চরিত্রটা করবেন বারট্রান্ড ম্যাকলেন। এভাবেই জেনির কাস্টিং শুরু হল।

আমি ভেবেছিলাম, এখানে অ্যানিমেশনের কিছুটা ভূমিকা থাকা দরকার। জেনি যখন এক মহাকাশ যাত্রীকে চিহ্নিত করেছে, পরবর্তীকালে সেই অংশটাও রাখা হয়েছিল।

ডিক ওয়েস নামে এক সংগীত লেখকের সাথে পরিচয় হয়। অসাধারণ শব্দসম্ভারে সে গান সাজিয়েছে।

এরই মধ্যে মাঝে মধ্যে কিছু কিছু দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে যায়। ব্যক্তিত্বের সংঘাত, ইগোর লড়াই আরও কত কী। তারই মধ্যে আবেগসঞ্চারিত অশ্রু এসে গ্রাস করে। কিন্তু সবসময় এসব হতাশাকে দূরে রাখতে ভালোবাসি।

শেষ পর্যন্ত জেনি দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হল। সমালোচকরা দ্বিধাবিভক্ত। অনেকে বললেন, এর মধ্যে একটা গোপন সম্ভাবনা আছে। কেউ কেউ আবার সেই সম্ভাবনাটাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে চাইলেন।

এখন এসব প্রশংসা অথবা নিন্দা আমাকে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করতে পারে না। আমি কেমন নিস্পৃহ নির্মোহ দৃষ্টিতে এদের দিকে তাকিয়ে থাকি। তবু, সংগোপনে বলে রাখি, একটু কষ্ট অথবা আনন্দ হয় বৈকি।

এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা এলেন অভিনয় করতে-কুইনি স্মিথ। এককালে তিনি ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন। তার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি। তাকে আমি একটা ভালো চরিত্র দিয়েছিলাম। তিনি চিকাগো শহরে পোশাক বিক্রি করেন। তার সাথে অনেক ঝগড়া তর্ক করতে হয়েছিল। অন্য চরিত্র পাবার জন্য তিনি তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আমি দর্শকদের মন ভালোভাবে বুঝতে পারি, আমি জানি, দর্শকরা কোন চরিত্রে কাকে গ্রহণ করবে।

ল্যারির সাথে প্রায়ই দেখা হচ্ছে, ডিনারের আসরে। ল্যারি এখন আমাদের পরিবারের একজন হয়ে উঠেছে।

জেনি তাকে শনিবার রাতে দেখানো হল। এটাই তো শুরু হল। ধীরে ধীরে দর্শক সংখ্যা বাড়ছে, বুঝতে পারছি, ঠিক মতো প্রদর্শিত হলে এটাও দর্শক হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নিতে পারবে।

পুব আকাশে ঝড়ের ইশারা। নিউইয়র্ক চলে গেলাম, ঝড়কে প্রশমিত করব কী করে? একের সাথে অন্যের লড়াই বেঁধে গেছে। ক্যালিফোর্নিয়াতে ফিরে এলাম। জর্জিয়া এবং আমার জন্য থাউজেন্ড ওকস-এ একটা সুন্দর বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। পাটি রোজেসের অবদান আছে এই বাড়ি ভাড়ার অন্তরালে। আমি তাদের ওপর দায়িত্ব দিলাম। মাঝে মধ্যে হয়তো আমরা যাব।

নাসা সহযোগিতা করেছিল। জেনি নাসার সহযোগিতায় তৈরি হল। আমরা এডওয়ার্ডস এয়ারপোর্ট বেস-এ গেলাম, কেনেডি স্পেস সেন্টারে গেলাম। ফ্লোরিডাতে অবস্থিত। আমরা। বেশ কয়েকজন মহাকাশচারীর সঙ্গে কথা বললাম। এত সহযোগিতা না পেলে ছবিটা এত বাস্তব হয়ে উঠতে পারত না।

নতুন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে দিন কেটে চলেছে। তারই মধ্যে মাঝে মধ্যে ছুটি নেবার চেষ্টা করছি। হা, পরিবারের জন্য কিছুটা সময় আমাকে দিতেই হবে।

.

২৭.

দ্বিতীয় পর্বের কাজ শুরু হয়েছে। জেনি এখন রঙে রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে। সকলেই অনবদ্য অভিনয় করেছেন। স্ক্রিপ্টটাও ভালো, অন্তত সকলে তাই বলছে।

তার মানে? আর একটা মাস্টার পিস হবে কি?

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত আমি ৩৮টি স্ক্রিপ্ট লিখেছিলাম আমার নিজের নামে। হলিউডে এটা একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা। সবাইকে লড়াই করতে হয়, আমার লড়াই করার দিনগুলো হারিয়ে গেছে। প্রত্যেকটা ছবিতে আমার নাম থাকছে। এমন কী যখন জেনি আত্মপ্রকাশ করল। তখন বলা হল সিডনি সেলডনের একটা উপস্থাপনা। এর সৃজনশীলতার অন্তরালে আছেন সিডনি সেলডন, প্রযোজনা করেছেন সিডনি সেলডন, চিত্রনাট্য লিখেছিলেন সিডনি সেলডন, কপিরাইট আছে সিডনি সেলডনের হাতে।

এভাবে বারবার আমার নাম প্রদর্শিত হচ্ছে। এছাড়া আমি কয়েকটা ছদ্মনাম নিতে বাধ্য হয়েছি। যাতে দর্শকদের মধ্যে একঘেয়ে না লাগে।

প্রথম বছরটা ভালোয় ভালোয় কেটে গেল। দু-একটা অভাবিত ঘটনা অবশ্য ঘটেছিল। সেগুলোকে আমি সামলে নিয়েছি।

খ্যাতির পাশাপাশি অর্থও আসছে যথেষ্ট। ইঙ্গিত পথে কি আমি পৌঁছাতে পেরেছি?

১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর, লস এঞ্জেলসের সিনাই হাসপাতাল থেকে একটা ফোন এল। আমার বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। ডাক্তার বললেন যে, বাবা হয় তো বাঁচবে না। আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলাম সেখানে। বাবার সমস্ত শরীরটা বিবর্ণ। হ্যাঁ, সেই যৌবন-উন্মাদনা কোথায় হারিয়ে গেছে।

বাবা আমাকে আরও কাছে ডাকল। আমি ঝুঁকে পড়লাম।

বাবা বলল- রিচার্ডকে আমার গাড়িটা দিয়েছি। এটা হয়তো বিক্রি করতে পারতাম।

এটাই হল আমার প্রতি বাবার শেষ কথা।

জেনির চতুর্থ পর্বের শুটিং শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই জেনি অসামান্য হিট করেছে। দর্শকরা ভালো মনে এটাকে গ্রহণ করেছে।

এখন আমি একটার পর একটা চিত্রনাট্য লিখেই চলেছি। আমি লিখলাম, দ্য বিগেস্ট স্টার ইন হলিউড, এই ছবিতে অনেক বিশিষ্ট অভিনেতা অভিনেত্রীরা সই করেছিলেন। এই ছবিটাও অসাধারণ হয়েছিল। তারপর লিখলাম ডিন অফ? এটা আমার সফলতাকে আর একটু এগিয়ে দিল।

দেখতে দেখতে পাঁচ বছর কেটে গেছে। জেনি এক জনপ্রিয় টিভি সিরিয়াল। আর একটা পর্ব লেখা শেষ করতে হবে। ১৩৯টা এপিসোড হয়ে গেছে। ষষ্ঠ বছরেও জেনির জনপ্রিয়তা অব্যাহত।

১৯৭১- সকলে বারবার জেনির জন্য আবেদন করেছে।

আজ জেনি প্রদর্শিত হবার পর চল্লিশ বছর কেটে গেছে। আজও পৃথিবীর বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে বারেবারে এই সিরিয়ালটা দেখানো হয়। এখনও এটা হাজার-লক্ষ

দর্শকদের মনে হাসির উদ্বেক করে। কলোম্বিয়া এটাকে রঙিন ছবিতে পরিণত করার চিন্তা করছে।

জেনির প্রযোজনাটা আমার। আমি ভাবলাম, আরও কয়েকটা ছবি প্রযোজনা করলে কেমন হয়। নতুন প্রেক্ষাপটে গল্প লিখতে হবে। যেসব বিষয় নিয়ে কেউ কখনও চিন্তা করেনি, সেসব বিষয়ে ভাবতে হবে।

ভাবতে ভাবতে অনেক কথাই মনে পড়ে গেল। গল্পের কথা চিন্তা করেছি। বিখ্যাত লেখকদের লেখা অক্লান্তভাবে পড়ে চলেছি। টি এস এলিয়টের কবিতা পড়লাম, তার কবিতাতে এমন কিছু জিনিস আছে, যাকে উপন্যাসে পরিণত করা যেতে পারে।

১৯৫৩- ফ্রান্সের সাথে প্রথম দেখা হল। ফ্রান্স এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মানুষ। ফ্রান্স সিনাত্রা, নিজস্ব নিয়মনীতি মেনে চলতে ভালোবাসেন। আমার মনে হয় এক সঙ্গে তিনজন ফ্রান্স সিনাত্রা এই পৃথিবীর বুকে বেঁচে আছেন। কে আসল তা আপনি বুঝতে পারবেন না।

সিনাত্রা জুলিয়েট প্রোজিকে বিয়ে করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। জুলিয়েট এক উদ্ভিন্নযৌবনা নর্তকী। অভিনয় জগতে যথেষ্ট নাম করেছেন। তারা জুনিয়ার রিপোর্টারদের কাছে এই খবরটা বললেন। সঙ্গে সঙ্গে সিনাত্রা তাকে ছেড়ে চলে গেলেন।

এক অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। কিন্তু যখনই আমি তার কাছে গিয়েছি, আমার মনে হয়েছে, তার মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রতিভার দ্যুতি আছে। তাঁর ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা অনেকগুলি বইতে অসামান্য অভিনয় করেছেন। তিনি আভা গারডানারকে বিয়ে করেন এবং ডিভোর্স করেন। তখনও পর্যন্ত আভার প্রতি তার চোরাগোপ্তা ভালোবাসা বজায় ছিল।

ফ্রাঙ্কের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে অনেক অন্তরঙ্গ মুহূর্ত কাটিয়েছি। ফ্রাঙ্কের জন্মদিনের পার্টিতে গেছি। আভা তখন আফ্রিকাতে ছিলেন। মোকাম্বো ছবির শুটিং ছিল।

কথায় কথায় ফ্রাঙ্ক আভার কথা বলেছিলেন। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ফ্রাঙ্ক আবার, টেলিফোনের অপেক্ষায় তৃষিত চিত্তে বসে আছেন।

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সন্কেবেলা একদল মানুষ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তারা ঈগল দলভুক্ত। আমরা হৈ-হৈ করতাম। এই দলের মধ্যে অনেকেই স্ত্রীদের নিয়ে আসতেন, এই দলভুক্ত অনেকেই পরবর্তীকালে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ করে বিনোদনের জগতে।

এইভাবে আমরা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নিত্য নতুন পথের সন্ধান করতাম।

আমি চিন্তা করলাম হলিউডে আরও বেশি সময় দিতে হবে। ফিউচার অফ কমেডি নামে একটি প্যানেল তৈরি হল। ২০০০ সালের ১৭ই জুলাই তারিখে। রাইটারস বিল থিয়েটারে প্রথম অধিবেশন বসল।

সকলে আমাদের দারুণভাবে সংবর্ধিত করেছিল। আমি অনেকের সাথে পরিচিত হলাম।

১৯৭০- আর একটা টেলিভিশন শো তৈরি করেছি- ন্যানসি নামে। এটা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের ফ্যাশান দুরন্ত তরুণী কন্যার কাহিনী। যে একটা ছুটিতে র্যানচে বেড়াতে গেছে। এক তরুণের প্রেমে পড়েছে। তারা বিয়ে করেছে। গল্পটা তরতর করে এগিয়ে চলেছে। দু-ধরনের জীবন শৈলীর মধ্যে যে তফাত তা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

বেশ কয়েকজন নতুন অভিনেতা অভিনেত্রীর সন্ধান পেলাম। আমি বুঝতে পারলাম, ভবিষ্যতে তারা সিনেমা জগতের আলো হয়ে উঠবেন।

এই ছবির মধ্যে এক রোমান্টিক আবেশ ছিল। চরিত্র চিত্রণ চমৎকার হয়েছে। সতেরোটি এপিসোড পরপর দেখানো হল। তারপরেই কোনো এক অজ্ঞাত কারণে নেটওয়ার্ক পরবর্তী এপিসোড দেখাতে রাজী হয়নি। যখন এপিসোডটা বন্ধ হয়ে যায়, তখন রেটিং-এ ন্যানসির স্থান ছিল সতেরো। এটা ভাবতেও আমার ভালো লাগছে। হয়তো হোয়াইট হাউসের কোনো অজানা হস্তক্ষেপ আছে। আমি এখনও পর্যন্ত জানি না।

২৮.

কয়েক বছর কেটে গেছে। ঠিক করলাম, এবার অভিজাত শ্রেণীর গল্পকথা শোনাতে হবে। হাট টু হাট নামে একটা চিত্রনাট্য লিখলাম। ১৯৭৯ সালে সেটা বেতারে সম্প্রচারিত হল। দুজন এটার প্রযোজনা করেছিলেন। রজারস ওয়াগনারকে পাওয়া গেল। স্টেফনি পাওয়ারসও এলেন সই করতে।

অন্যান্য প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে। তারই মাঝে নিত্য নতুন চিন্তাধারা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে দেয়।

এবার উপন্যাসের কাজ শুরু হয়েছে। সকাল থেকে উপন্যাস বলতে থাকি। সম্পাদকরা সেগুলো লিখে নেন। বিকেলবেলা আমি চলে যাই প্রযোজকের দরবারে। অন্যান্য প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করি।

উপন্যাস এইভাবে শেষ হল, এটা নিয়ে কী করব কিছুই জানি না। আমার সাথে এই ধরনের কোনো এজেন্টের আলাপ হয়নি।

-আমি আমার এক প্রিয় বন্ধুকে ডেকে পাঠালাম। সে হল বিখ্যাত ঔপন্যাসিক আলভিন ওয়ালেস।

আমি একটা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছি। এটা কোথায় পাঠাব?

সে বলল- আমি আগে এটা পড়ে দেখব।

সে এটা নিয়ে চলে গেল। কবে ফোন করবে সে আশায় বসে আছি। ছদিন বাদে সে ফোনে বলল- সিডনি, কখনও এই উপন্যাসটা কারও কাছে পাঠিও না।

সে আবার বলল- এটাকে আমার এজেন্টের কাছে পাঠিয়ে দাও। আমি তাকে সবকিছু বলে রাখব।

এই উপন্যাসটি হল দ্য নেকেড ফেস। এটা অসামান্য জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। পাঁচটা সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ষষ্ঠ সংস্করণটা প্রকাশের পথে। আমার এজেন্ট বলেছিল উইলিয়াম ময়রা আপনার উপন্যাসটা প্রকাশ করতে চাইছে। তারা আপনাকে একহাজার ডলার অ্যাডভান্স হিসেবে দেবে।

আমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ। শেষ পর্যন্ত একটা বই আমার নামে প্রকাশিত হবে।

এর জন্য আমি হয়তো উইলিয়াম মরোকে হাজার ডলার দান করতাম।

কয়েকটা সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছিল। আমি সেই পরিবর্তনগুলো করে দিলাম।

১৯৭০ সালে- দ্য নেকেড ফেস বাজারে এল। সকাল থেকে নানা চিন্তায় মনটা আচ্ছন্ন। জানি না এটার অবস্থা কী হবে। একটা কপিও কি বিক্রি হবে না? আমি বেভারলি হিলসের একটা বইয়ের দোকানে গেলাম। একটা কপি কিনলাম। আজ পর্যন্ত আমি এই ধারাটা বজায় রেখেছি। যখনই আমার উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ বাজারে আসে, প্রথম কপিটা অবশ্যই আমি কিনব।

অনেকে বলে থাকেন, একজন লেখককে বিভিন্ন দেশে ঘুরতে হয়। সব জায়গায় খবর নিতে হয়। লেখকরা মাঝে মধ্যেই টেলিভিশনের পর্দায় অবতীর্ণ হবেন। বই নিয়ে যে আলোচনা সভা সেখানে যোগ দেবেন। লেখা সংক্রান্ত লাপ্ধের আসরে যাবেন। এই ব্যাপারটা আমার খুব একটা ভালো লাগে না। তবে এই ব্যাপারটা আমি আমার এক এজেন্টের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলাম। তার পাশাপাশি চেষ্টা করেছিলাম জনসংযোগ বজায় রাখতে।

আমার এজেন্ট হিলাল আমাকে বলেছিলেন- সিডনি, লেখকের আসল জোর লুকিয়ে থাকে তার কলমের মধ্যে। কলমের জোর না থাকলে এসব বাহ্যিক লড়াই করে কিছুই হয় না।

-আপনি কী বলতে চাইছেন?

হলিউডের বাইরে আপনার নাম কেউ জানে না। আপনি এখন এটা ভুলে যান। লেখার মাধ্যমেই আপনি সকলের সাথে পরিচিত হবেন।

এবার অন্য দু-একটা বই লেখা শুরু করলাম। তারই পাশাপাশি অনেকগুলো চিত্রনাট্য একসঙ্গে লিখছি।

পাশাছোনাতে গেলাম, ক্যালিফোর্নিয়াতে। হানটিং হোটেলে একটা সাহিত্যবাসর বসেছিল। বিভিন্ন লেখকেরা নিজের সম্পর্কে বলছিলেন। আমাকেও ডায়ার্সে দাঁড়িয়ে আমার কথা বলতে হল।

লাঞ্চ সেসনে পারস্পরিক আলাপ আলোচনা হল। লাঞ্চ হয়ে গেছে। সকলেই বই নিয়ে কথা বলছেন। আমিও আমার বই নিয়ে কথা বললাম। কিন্তু কেউ কি আমার বইটা পড়েছেন? আমার মুখ লাল হয়ে গেছে। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। মনে প্রশ্ন জেগেছে, তা হলে ঔপন্যাসিক সিডনি সেলডনকে কেউ গ্রহণ করতে পারছেন না?

কিছুক্ষণ বাদে একটা শব্দ ভেসে এল।

মিঃ সেলডন?

আমি মুখ তুলে তাকালাম। আমার সামনে এক মধ্যবয়সিনী দাঁড়িয়ে আছেন।

উনি বললেন- আপনার বাইটার কী নাম?

ভয়ে ভয়ে আমি বললাম- দ্য নেকেড ফেস।

উনি হাসলেন এবং বললেন- ঠিক আছে, আমি একটা কপি কিনব।

এটা দয়া এবং করুণা। সেদিন আমি মাত্র একটা কপি বিক্রি করতে পেরেছিলাম।

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে। আমি নিউইয়র্কে ফিরে এসেছি। ল্যারি হিউজেসের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি হলেন উইলিয়াম মরোর প্রেসিডেন্ট।

ল্যারি বললেন- নেকেড ফেসের সতেরো হাজার কপি বিক্রি হয়েছে। এখনই দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপতে হবে।

আমি অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে ছিলাম।

মিঃ হিউজেস, আমার একটা টেলিভিশন শো হবে। এই শো-টা অন্তত দু কোটি মানুষ প্রতি সপ্তাহে দেখে থাকেন। কাজেই আমার সতেরো হাজার বই বিক্রি হয়েছে বলে আমি মোটেই আনন্দিত বা শিহরিত হচ্ছি না।

এই বইটার সমালোচনা প্রকাশিত হল। আমি অবাক হয়ে গেছি। বেশির ভাগ সমালোচক আমাকে সমর্থন করেছেন।

নিউইয়র্ক টাইমসের সমালোচক পরিষ্কার লিখেছেন- দ্য নেকেড ফেস এই বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ রহস্য উপন্যাস।

সে বছর আমাকে এডগার অ্যালান পো পুরস্কারে অন্যতম মনোনয়ন দেওয়া হল।

আমি হলিউডে ফিরে এসেছি। ন্যানসি নিয়ে কাজকর্ম এগিয়ে চলেছে। দ্য নেকেড ফেস আর্থিক দিক থেকে সফল হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কী, এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি খুব একটা চিন্তা করিনি। পরের খেয়াল খুশিতে উপন্যাস লিখেছিলাম। ভেবেছিলাম আমার সৃজনশীলতার মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আনব। যখন আমি চিত্রনাট্য লিখি, অথবা থিয়েটারের জন্য সংলাপ তৈরি করি, তখন সকলের সমবেত প্রয়াস থাকে। যদি তুমি একা একা লেখো, তোমাকে চরিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীদের কথা ভাবতে হয়, পরিচালক, প্রযোজক, সংগীত শিল্পী সকলের কথা চিন্তা করতে হয়।

যখন কেউ উপন্যাস লেখেন, তখন তাকে একাকীত্বের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। কেউ পাশে বসে না, কেউ বলে না, এই সংলাপটা একটু পাল্টালে ভালো হত।

-এতটুকু সেট দেবার দরকার কী?

...এখানে একটু গান দিলে ভালো হয়।

ঔপন্যাসিক নিজেই তার চরিত্র সৃষ্টি করেন, ব্যথা আবেগ অনুভূতি বাসনা কামনা তিনিই হলেন এই সৃজনশীলতার শিল্পী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, প্রযোজক এবং পরিচালক। তিনি সারা পৃথিবীকে তৈরি করতে পারেন। তিনি এগিয়ে যেতে পারেন, যে কোনো কল্পিত চরিত্র আনতে পারেন। তার কল্পনা শক্তির ওপর কেউ বাধা নিষেধ আরোপ করে না।

আমি চিন্তা করলাম, আর একটা উপন্যাস লিখতে হবে। জানি না সেই উপন্যাসটা। কতখানি সফল হবে। একটা উত্তেজক অনুভূতি। ইতিমধ্যে আমার কাছে একটা দুঃসংবাদ এসেছে। আর. কে. ও অর্কিস ফর ভার্জিনিয়া চিত্রনাট্যটা কিনতে চাইছে না। আমি এই গল্পটাই বলব, সকলের কাছে। একটা সুন্দর উপন্যাসের জন্ম হবে কি? আমি নামটা পাল্টে দিলাম। নাম দিলাম দ্য আদার সাইড অফ মিডনাইট। এই বইটা প্রকাশিত হল। আমার জীবনটাই পাল্টে গেল। নিউইয়র্ক টাইমসে বেস্ট সেলার লিস্টের তালিকায় ৫২ সপ্তাহ ধরে এই নামটা ছিল। দ্য আদার সাইড অফ মিডনাইট একটা কিংবদন্তি সৃষ্টি করে। বিশ্বের সর্বত্র বেস্ট সেলারের সম্মান পায়।

তাহলে? আমার আর একটা স্বপ্ন সফল হল বোধহয়।

কিছু কথা বাকি থেকে গেছে

বিভিন্ন ভাবে জীবনটা কেটে গেছে, কখনও মোশন থিয়েটারে, কখনও টেলিভিশনে, কখনও উপন্যাস লেখাতে। যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয়, সৃজনশীলতার কোন্ মাধ্যম আমি সবথেকে বেশি ভালোবাসি। আপনারা শুনলে হয়তো অবাক হবেন। আমি ভালোবাসি উপন্যাস লিখতে। উপন্যাসের মধ্যে আমার আত্মার মুক্তি, আমার কল্পনার বিচ্ছুরণ। আমি একজন চিত্রনাট্যকার। একজন সংলাপ লেখক। আমি একজন ঔপন্যাসিক কীভাবে এই উত্তরণটা হল আমি বলতে পারব না।

এর ফলে আমি অনেক সুযোগ সুবিধা পেয়েছি। একজন ঔপন্যাসিক পৃথিবীর সব দেশে ঘুরে বেড়াতে পারেন। বিভিন্ন কৌতূহলোদ্দীপক মানুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে পারেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানে ভ্রমণ করতে পারেন। এই সব মানুষদের কথা তার লেখাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। আপনার মন আরও আবেগ আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

আমি এক মহিলার কাছ থেকে একটি চিঠি পেলাম। তার ভীষণ হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, তিনি হাসপাতালে বসে আছেন। তিনি চাইছেন না, তার বাবা, মা বা বয়ফ্রেন্ড এসে তার সাথে দেখা করুক। তিনি মরতে চাইছেন। তার বয়স মাত্র একুশ বছর। তিনি তার টেবিলে দ্যা আদার সাইড অফ মিডনাইট-এর একটি কপি রেখেছেন। তিনি সেই কপির দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি বারবার সেই বইটা পড়ছেন। বইটা শেষ করার পর

চরিত্রগুলো তার মনের পর্দায় ভেসে উঠেছে। তিনি নিজের সমস্যার কথা ভুলে গেছেন।
জীবন যুদ্ধে আবার তখন ফিরে এসেছেন এক জয়ী নায়িকা হিসেবে।

এই চিঠিটা আমাকে আশ্বস্ত করে দিয়েছিল।

আর এক মহিলার চিঠি পেলাম, তিনি বলছেন, তার মুমূর্ষ মেয়ের শেষ অনুরোধে তিনি
আমার সব কটি বই তার হাসপাতাল বেডে সাজিয়ে দিয়েছেন। মেয়েটি শান্তিতে মারা
গেছে।

রেজ অফ এঙ্গেলস-এ আমি একটা ছোট ছেলের কথা লিখেছিলাম, সেই ছেলেটি মারা
গিয়েছিল। আমাকে অনেকগুলো মেল করা হল। তার মধ্যে ঘৃণা ঝরে পড়ছে।

পূর্বদেশ থেকে এক মহিলা ফোন করে বলেছিলেন- আমি ঘুমোতে পারছি না, কেন
আপনি বাচ্চাটাকে মেরে ফেললেন।

এমন অনেক চিঠি আবেগের অনুরাগে সম্পৃক্ত। ব্যক্তিগত জীবনবোধে উদ্দীপ্ত।

জেনিফার পার্কার- রেজ অফ এঙ্গেলস-এর সেই নায়িকাকে দেখে অনেক মেয়ে
অ্যাডভোকেট হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। খবরটা আমাকে উৎসাহ দিয়েছে।

আমার উপন্যাস ১৮০টা দেশে বিক্রি হয়েছে। ৫১টা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯৯১
সালে গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে আমাকে পৃথিবীর সব থেকে বেশি অনূদিত
লেখকের সম্মান দেওয়া হয়েছে। আমার বই এখনও পর্যন্ত ৩০ কোটি বিক্রি হয়েছে।

আমি জানি না, এই অসামান্য জনপ্রিয়তার অন্তরালে কী আছে। আমার কেবলই মনে হয়, আমার চরিত্রগুলি বুঝি রক্ত-মাংসের মানুষ। পাঠকদের কাছে একই অনুভূতি হয়। বিদেশি পাঠকরাও আমার বইয়ের সাথে একাত্ম হয়ে উঠতে পারে। কারণ তাদের ভালোবাসা, ঘৃণা, আবেগ, ঈর্ষা সবকিছুকে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করি। আমি একটা আগু বাক্যে বিশ্বাস করি। তা হল, পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ একই রকম অনুভবে অনুরণিত হয়।

যখন আমি ঔপন্যাসিক হয়েছিলাম, একটা বিষয় আমাকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল। আমি দেখেছিলাম যে, একজন ঔপন্যাসিক চিত্রনাট্যকারের থেকে অনেক বেশি সম্মান অর্জন করেন। চিত্রনাট্যকারদের দিকে অনেকে করুণার চোখে দেখে থাকেন, কিন্তু ঔপন্যাসিকের দিকে তেমন চোখে দেখেন না।

একদিন আমি ইস্টার প্যারাড লিখছিলাম, আর্থার ফ্রেডের অফিসে বসে, তার ইনসিওরেন্স এজেন্ট ভেতরে এলেন। আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

ফ্রেড তার ইনসিওরেন্স এজেন্টের দিকে তাকিয়ে বললেন- এই সংবাদপত্রে কী লিখেছে, তা দেখা যাক।

তারা দুজন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমাকে একলা ফেলে। ওই ঘটনা আমাকে খুবই আঘাত করেছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমার হয়তো অর্থ আছে, কিন্তু সম্মানটা একটু কমই আছে, সারা পৃথিবীতে আমি ঘুরেছি, উপন্যাসের জন্য রসদ সংগ্রহ করতে নানা ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে। এথেন্সে গেছি, তখন আমি দি আদার সাইড

অফ মিডনাইট নিয়ে কাজ করছি। জর্জিয়া আমার সঙ্গে ছিল। আমরা একটা পুলিশ স্টেশনে গেলাম। আমরা অনুমতি চেয়েছিলাম।

আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। ডেস্কের পাশে বসে থাকা একজন পুলিশ বললেন কীভাবে সাহায্য করব?

-কেউ কী বলতে পারেন, কীভাবে একটা গাড়িকে উড়িয়ে দেওয়া যায়।

তিরিশ সেকেন্ড কেটে গেছে, আমাদের একটা ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

জর্জিয়া ভয়ার্ত কণ্ঠস্বরে বলল- ওদের বলল, তুমি আসলে কে?

-ভয় পেও না, এ কথা বলার অনেক সময় পাওয়া যাবে।

দরজাটা খুলে গেল। চারজন পুলিশের হাতে উদ্যত বন্দুক।

তারা বললেন আপনারা কেন একটা গাড়ি উড়িয়ে দিতে চাইছেন? কেন?

-আমি সিডনি সেলডন। এই ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করছি।

আমার সৌভাগ্য, তারা আমার নামটা জানতেন। তারা ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে গেছি, মাস্টার অফ দ্য গেম নামে একটা উপন্যাসের রসদ সংগ্রহ করতে। এই উপন্যাসটার মধ্যে হীরক ব্যবসার কথা বলা আছে। সেখানে ডি বিয়ারসের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হল। তাদের একটা হিরের খনিতে যাবার জন্য আবেদন করেছিলাম। তারা আমার আবেদনে সাড়া দিয়েছিল।

আমি হিরের খনিতে গিয়েছিলাম। সে অভিজ্ঞতার কথা কখনও ভুলতে পারব না।

ডি বিয়ারসের একজন আধিকারিক আমাকে বলেছিলেন যে, তাদের একটা হিরের খনি পরিষ্কার দেখা যাবে, তার একদিকে সমুদ্র আছে, অন্যদিকে আছে সশস্ত্র প্রহরীদের পাহারা। আমি সেখানে যাবার জন্যই মন স্থির করেছিলাম। আমি চেয়েছিলাম, আমার একজন চরিত্র যেন ওই হিরের খনিতে গিয়ে হিরে চুরি করে বাইরে চলে আসে।

এবার ইফ টুমরো কামস উপন্যাসটার কথা বলি। এই উপন্যাসটা লেখার সময় আমি মাদ্রিদের প্রাডো মিউজিয়ামের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছিলাম। আমি জানতাম, কাজটা অসম্ভব, কিন্তু এই কাজটা আমাকে করতেই হবে। তা না হলে আমি কী করে দেখাব যে, আমার একটা চরিত্র ওই মিউজিয়াম থেকে দামি হিরে চুরি করছে?

উইন্ডমিলস অফ দ্যা গডস লেখার জন্য আমি রোমানিয়াতে যাই। রোমানিয়ার কথা এই বইতে বারবার উল্লিখিত হয়েছে। তখন চেসকু জীবিত ছিলেন। তিনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। আমেরিকান এমবাসিতে গিয়েছিলাম। আমেরিকান অ্যামবাসাডরের

সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করছিলাম। তিনি বলেছিলেন, ভেতরে আসুন। তিনি আমাকে হলের ভেতরে নিয়ে যান। সেখানে সব সময় প্রহরীদের প্রহরা।

তিনি বলেছিলেন- কী জানতে চাইছেন বলুন?

-এই ঘরটার ওপর কেউ কি গুপ্তচরবৃত্তি করতে পারে?

না, কখনও হওয়া সম্ভব নয়।

তিনরাত। জর্জিয়া এবং আমি একটা নাইট ক্লাবে গেলাম। নাইট ক্লাবে পাশাপাশি বসে আছি। এয়ারকন্ডিশনটা ক্রমশ বড়ো হচ্ছে। আমি উঠে দাঁড়িয়েছি।

নাইট ক্লাবের ম্যানেজার ছুটে এলেন। বললেন- কিছু কী হয়েছে?

হ্যাঁ, এবার আমি আমার সূত্রটা পেয়ে গেছি।

পরের দিন আমি অ্যামবাসাডরের বাড়িতে গেছি, আবার তাকে প্রশ্ন করেছি।

তিনি বললেন- চলুন, আমরা বাগানে বেড়াই।

রোমানিয়াতে অ্যামবাসাডরের বাড়ির ওপরেও তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয়। এই সরল সত্যটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

এবার দ্য স্যান্ডস অফ টাইম-এর কথা বলি। এই বইটা লেখার জন্য আমি স্পেনে গিয়ে ছিলাম। সেখানে বাসকোরা কী ধরনের আন্দোলনে করছে তা জানতে হবে। আমি ড্রাইভারকে বলেছিলাম, সবকিছু আমাদের ঘুরিয়ে দিতে। এখানে কয়েকজন সিস্টারের কথা আছে, আমরা সান সিবাসটিয়ানে চলে যাই। আমাকে ড্রাইভার হোটেলের কাছে নিয়ে গিয়ে বলেছিল- আমি এখন চলে যাব।

আমি বলেছিলাম না, আমাদের অনেকক্ষণ থাকতে হবে। একটা ব্যাপারে গবেষণা করব।

ড্রাইভার বলেছিল- আপনি কেন বুঝতে পারছেন না, এটা হল বাসকোদের প্রধান কেন্দ্র। যখন তারা দেখবে গাড়িতে মাদ্রিদের লাইসেন্স প্লেট লাগানো আছে, তারা বিস্ফোরক দিয়ে গাড়িটা উড়িয়ে দেবে।

আমি বাসকোদের একজনের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তাদের অভাব অভিযোগের কথা শুনতে চেয়েছিলাম, তাদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে অবহেলা করা হচ্ছে, তারা তাদের অধিকৃত ভূমিখণ্ড আবার দখল করতে চাইছে, তাদের নিজস্ব ভাষা আছে, এবং নিজস্ব সভ্যতা।

এটা হল আমার কয়েকটা অভিজ্ঞতা। আমি সকলের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি লিখতে ভালোবাসি, লেখাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমি বিশ্বাস করি, লেখার জন্য সকলের সমবেত প্রয়াস আছে। আমি বিশ্বাস করি, প্রতিভা ভগবানদত্ত একটা ক্ষমতা। কেউ কেউ লিখতে ভালোবাসে, কেউ গান গাইতে ভালোবাসে, কেউ

আবার ছবি আঁকতে ভালোবাসে। যে কোনো ক্ষমতার জন্যই আমরা আরও বেশি পরিশ্রম করব।

লেখার মধ্যেই আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ লুকিয়ে আছে।

একবার আমার বিজনেস ম্যানেজার ৫০০ ডলার মূল্যের টেনিসের সরঞ্জাম দিয়েছিলেন। জন্মদিনের উপহার হিসেবে। প্রতি সপ্তাহে একবার করে আমাকে টেনিস কোর্টে যেতে হবে, এমন একটা লিখিত শর্ত ছিল।

একদিন আমার প্রশিক্ষক বললেন- টাকাটা ফুরিয়ে গেছে, আপনি কি আর টেনিস খেলতে চান?

আমি বললাম- না, আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে আমি বলব, লেখা ছাড়া আর অন্য কোনো খেলাতেই আমার ইচ্ছে নেই।

তারপর থেকে আমি আর কখনও টেনিস কোর্টে যাইনি। এটা কুড়ি বছর আগের ঘটনা।

ক্যারি গ্রান্টের শেষ ম্যুভি ওয়াক ডোন্ট রান প্রকাশিত হল। তারপর চার বছর কেটে গেছে। ক্যারি আমাকে বলল যে, অ্যাকাডেমি তাকে সাম্মানিক অস্কার দেবে। নিউইয়র্কে এই অনুষ্ঠানটা হবে। আমি যেন সেখানে যাই। হ্যাঁ, এই অনুষ্ঠানে আমি গিয়েছিলাম, ক্যারির এই প্রশংসাটা অবশ্যই প্রাপ্য।

অনেক বছর ধরে ক্যারির সাথে দেখা হয়েছে। বব রাসেল এবং বেন রবার্টসের সফলতা আমাকে আনন্দ দিয়েছে।

আমার ভাই রিচার্ড বিবাহ বিচ্ছেদ করেছে। ১৯৭২ সালে সে সবাইকে অবাক করে দিয়ে এক সুন্দরী রূপসী উদ্যোগী মহিলা বেটি রেহিনকে বিয়ে করেছে।

১৯৮০ সালে জর্জিয়া হার্ট অ্যাটাকে মারা গেল। এটা এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। আমার সমস্ত জীবন শূন্যতায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এমন এক শূন্যতা যা কখনও পূরণ হবে না।

কয়েক বছর বাদে আলেকজান্দ্রার সাথে আমার যোগাযোগ হয়। সে আমার জীবনটাকে একেবারে পাণ্টে দেয়। সে হল, এমন একজন মহিলা, যার কথা আমার উপন্যাসের মধ্যে বারবার লিখতে চেয়েছি। এই পৃথিবীতে এমন মহিলার সংখ্যা খুবই কম, যারা একাধারে বুদ্ধিমতী, রূপসী এবং কৌতুকপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাকে প্রথম দেখাতেই আমি তীব্রভাবে ভালোবেসে ছিলাম। লাস ভেগাসে আমরা সন্তর্পণে বিয়ের অনুষ্ঠানটা সেরে ফেলি। সেখানে শুধুমাত্র পরিবারের লোকজনরা উপস্থিত ছিল।

অবাক করা কাণ্ড, আমার বন্ধু মারটি অ্যালেন এবং তার বউ ক্যারন সেখানে উপস্থিত হয়েছে। ক্যারন একটা অসাধারণ গান লিখেছিল। পিয়ানোতে সেটা বাজিয়ে শুনিয়েছিল। বিয়ের রাতের স্মৃতি আমি কখনও ভুলতে পারব না।

বিবাহিত জীবনের ষোলোটা বসন্ত আনন্দে কেটে গেছে।

আমার মেয়ে ম্যারি, এখন এক লেখিকা হয়েছে। সে এ পর্যন্ত দশটা উপন্যাস লিখেছে। আমার নাতনি লিজির কথা বলি, ষোলো বছর বয়সে তারও একটা উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। মনে হচ্ছে, আমার দশ বছরের নাতনি রেবেকাও বোধ হয় লেখিকাই হতে চাইবে।

এই হল আমার গল্পকথা, এখন আর সেই হতাশা এসে আমাকে অবিচ্ছিন্ন করে না। এখন আমি সবকিছু অতিক্রম করার মন্ত্র শিখেছি। মাঝে মধ্যে নাটক লিখি। ব্রডওয়েতেও লেখালেখি করে থাকি। ছোটোদের জন্য লেখার ধারাটা বজায় রেখেছি।

সম্প্রতি আমার অষ্ট-আশীতম জন্মদিন পালিত হল।

ফেলে আসা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে যথেষ্ট উত্তেজক বলে মনে হয়। জীবনের চলার পথে অনেকটা হেঁটে এসে কেবলই বাবার কথা মনে পড়ে।

বাবাই বলেছিল- জীবনটা একটা উপন্যাসের মতো। আমরা কেউ জানি না, শেষতম পাতাতে কী লেখা আছে।

জীবনের চালচিত্রে আছে অলৌকিক সফলতা আর পাহাড়প্রমাণ ব্যর্থতার ছবি। আমার জীবনের গল্প আমি আপনাদের কাছে উপহার দেব কারণ আপনারা, পাঠকরা না থাকলে কে আমাকে মনে রাখত?